ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BHARATE BASTUBAD PRASANGE
by Debiprasad Chattopadhyaya

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৪

প্রকাশক :
অনিল আচার্য
অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ :
কোলো প্রিন্ট
৮০/২ বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বাঁধাই :
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে

এস্. জি. সারদেশাই-কে

(S. G. SARDESAI)

সূচি

কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি

প্রথমেই আমি Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, নামে সংস্থাটির কাছে পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই। প্রথমত, সংস্থাটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি আমাকে National Fellow নির্বাচিত করে দর্শন চর্চার অখণ্ড অবকাশ দেওয়া হয়েছে; এই সুযোগ না-পেলে তুলনায় অল্প সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে বর্তমান বইটি লেখা সম্ভব হোতো না। দ্বিতীয়ত, বছর দেড়েক আগে একই সংস্থার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার গৃহীত হয়েছিলো। কিছুটা বৃহদাকার এই পাণ্ডুলিপিটির নামকরণ করা হয়েছে: *CARVAKA/LOKAYATA : An Anthology of Source-materials and significant studies*। পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাক / লোকায়ত প্রসঙ্গে যেখানে যেটুকু উল্লেখযোগ্য উক্তি পেয়েছি তা সংকলনের চেষ্টা করেছি। ফলে বর্তমান গ্রন্থের মূল উপাদান নতুন করে পডবার ও ভাববার সুযোগ হলো; বর্তমান গ্রন্থ রচনাও তুলনায় সহজসাধ্য হলো।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথার পর্যাপ্ত উল্লেখ ছাড়া নিজের বিবেকের কাছেই আমি অপরাধী হয়ে থাকবো। উপরোক্ত সংকলনের কাজে—এবং বর্তমান গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে—আমি একান্তভাবেই আমার তরুণ শিক্ষক মৃণালকান্তির কাছে ঋণী। পুরো নাম: অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি লিট্, ব্যাকরণতীর্থ। দীর্ঘ দিন ধরেই ভারতীয় দর্শন পঠন-পাঠনের জন্য আমি তাঁর উপর নির্ভরশীল। বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট এবং স্বভাব বিনয়ী বলেই তাঁর কাছে আমার বাস্তব ঋণের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে তিনিই হয়তো অস্বস্তিবোধ করবেন। তবুও তাঁর কাছে আমার অপরিমেয় ঋণের কথা উল্লেখ না-করলেও নিজের কাছেই অপরাধী থাকবো।

কিন্তু সেই সঙ্গেই বলে রাখা দরকার যে, দার্শনিক বিচার এবং মূল্যায়নের দিক থেকে মৃণাল অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত নন। অতএব আমার মতামতের

দায়িত্ব—এবং অবশ্যই ভুলত্রুটি ও নানা অসম্পূর্ণতার দায়িত্বও—আমি নিশ্চয়ই তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবো না। বর্তমান গ্রন্থের সমস্ত ভুলত্রুটির মতোই মতামতের দায়িত্বও একান্তই আমার। তবে তাঁর সাহায্য না-পেলে এই ভুলত্রুটির তালিকা অবশ্যই অনেক দীর্ঘ হতো এবং নিজস্ব মতামতে উপনীত হবার মতো উপাদানও তুলনায় কমতো।

মৃণাল ছাড়াও আমার তরুণ বন্ধু রামকৃষ্ণ—অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম এ, পি এইচ ডি—নানাভাবে এবং অনেক সময় নেহাতই আড্ডাচ্ছলেও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এমনকি, বর্তমান বই-এর পরিকল্পনাটাই অনেকাংশে তাঁরই। রামকৃষ্ণ আমাকে বারবার বলেছেন, "ফুটনোট-কণ্টকিত মোটা মোটা বই লেখবার চেষ্টা তো ঢের করেছেন; কিন্তু ক'জনেই বা তার আদ্যোপান্ত পড়ে দেখবার মতো সময় ও সুযোগ পাবেন? মোদ্দা কথা যা বলতে চান সোজা ভাষায় ছোটো করে বলবার চেষ্টা করুন; আখেরে হয়তো তাই সাধারণের বেশি কাজে লাগবে!" পরামর্শটা খুবই খাঁটি মনে হয়েছে। তাই এই বই।

বিষয়বস্তু প্রসঙ্গেও একটা কথা বলবার আছে। ১৯৫৯ সালে আমার *Lokayata : A Study in Ancient Indian Materialism* প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপক ওয়ালটার রুবেন (Walter Ruben) বইটার একটা দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। খুবই উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন। তখনো তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ হয়নি; যদিও কয়েক বছরের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য হয়। এই অবস্থায় কথায় কথায় একবার তিনি হঠাৎ একটা প্রশ্ন করেন। সেই বইতে বস্তুবাদের উৎস সন্ধানে আমার প্রয়াস তাঁর বিচারে এমনই একাগ্র হয়েছে যে দার্শনিক মত হিসেবে আমি চার্বাক / লোকায়ত মতের মূল্যায়ন তুলনায় উপেক্ষা করেছি। কেন করেছি? তার কারণ কি এই সে-বিচারে মতটা তেমন মর্যাদা দাবি করে না? রুবেন-এর প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আমার মাথায় ঘুরেছে। নানা লেখায় দেখাবার চেষ্টা করেছি, দার্শনিক মত হিসেবে প্রাচীনকালের অনিবার্য অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মতটির স্বকীয় গুরুত্ব কম নয়। বর্তমান বইতে কথাটা ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। স্বভাবতই, যে সব নজির দেখিয়েছি আমার অন্যান্য লেখার মধ্যেও তার কিছু কিছু এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। তাই অল্পবিস্তর পুনরুক্তির অভিযোগ থেকে বর্তমান বই মুক্ত নয়। তবুও বাদ দেবার উপায় মাথায় আসেনি। কিন্তু রুবেন-এর প্রশ্নটা এমনই মৌলিক যে তার একটা ধারাবাহিক উত্তর দেবার চেষ্টা

না করলে প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। আমার অন্যান্য লেখা যাঁরা পড়েছেন, পুনরুক্তির জন্যে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু বর্তমান ধারাবাহিক আলোচনা যতটুকু সার্থক বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা ততোটুকুই আমার পক্ষে গুরুঋণ মান্য করার সন্তোষ।

পরিশেষে, আর একজনের কথা না-লিখে উপায় নেই, যদিও এই সেদিন তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে নামটা লিখতেও হাত কাঁপে। সমর সেন। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৭ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। এই পঞ্চাশ বছর ধরে অসামান্য প্রতিভা ছাড়াও মতাদর্শের প্রতি আপসহীন নিষ্ঠা অন্যত্র চোখে পড়েনি। একদিন কথায় কথায় ওঁকে বলছিলাম, সোজা করে ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে একটা বই লেখার চেষ্টা করছি। প্রকাশকের কথা উঠলো। সমরবাবুই আমাকে "অনুষ্টুপ"-এর কথা বলেন। তার আগে, সত্যি বলতে, "অনুষ্টুপ"-এর কাউকেই চিনতাম না। সমরবাবুর উদ্যোগেই প্রথম যোগাযোগ। ওঁরাও এককথায় বইটা ছাপতে রাজি হলেন। আমিও প্রকাশকের চিন্তা ছেড়ে পাণ্ডুলিপিটায় আরো মন দিতে পারলাম। আশা ছিলো, প্রথম কপিটা সমরবাবুর হাতে দিয়ে আসতে পারবো। কিন্তু মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

লেখকের কৈফিয়ৎ

কুমারিল ছিলেন অষ্টম/নবম শতকের দার্শনিক। তাঁর মতামতের অতি-বড়ো সমালোচকও অস্বীকার করবেন না, অমন ক্ষুরধার বুদ্ধির নজিব ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। রচনা-কৌশলের দিক থেকেও আশ্চর্য। তীক্ষ্ণ বিচারের সঙ্গে তীব্র শ্লেষ মিলিয়ে বিপক্ষকে মিশমার করবার আশ্চর্য দক্ষতা!

তাঁরই একটা মন্তব্য থেকে শুরু করবো। কিন্তু মনে রাখা দরকার তাঁর প্রধান বই 'শ্লোকবার্তিক' শ্লোকে লেখা, তাই সাঁটে লেখাও। হুবহু তর্জমার চেষ্টা করার বদলে কিছুটা ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা দিয়ে শুরু করলে বোঝবার সুবিধা হতে পারে।

দার্শনিক মহলে—কুমারিল বলছেন—একরকম লোক-ঠকানো কায়দা চালু আছে। বলবার কথাটা যতো দুর্বল কায়দাটার চাহিদাটাও ততো বেশি। বলবার কথায় যদি ফাঁকি থাকে তাহলে নেহাত সাদামাটা ভাষায় তা বললে তো সহজে ধরা পড়ে যাবার ভয়। জমকালো ভাষার মারপ্যাঁচ কষলে বরং কিছুটা নিরাপত্তা থাকে: সাধারণ লোক হকচকিয়ে যাবে, ভাববে ব্যাপারটাই বুঝি এমন গভীর যে থই পাওয়া চারটিখানি কথা নয়।

নমুনা হিসেবে কুমারিল বলছেন, যদি বলি মুখের "লালা" তাহলে তো সাধারণ লোক সহজেই বুঝে ফেলবে। কিন্তু তার বদলে যদি বলি "বক্ত্রাসব"? শুনে রীতিমতো মাথা চুলকোতে হবে। সংস্কৃত শব্দের কোনো আটপৌরে তালিকায় তার হদিশ পাওয়া কঠিন। এমনকি, মনিয়ার-উইলিয়ম্স্-এর (Monier-Williams) বিশাল 'সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান'-এ শব্দটা খুঁজে পাইনি, যদিও আপ্তে (V.S. Apte) সবিনয়ে যে-অভিধানকে 'ছাত্রপাঠ্য' আখ্যা দিয়েছেন তাতে চোখে পড়লো। যাই হোক, "বক্ত্রাসব" শুনলে সাধারণ লোক বিশেষ কিছু বুঝবে না। আর বুঝবে না বলেই কল্পনা করবে, ওসব ভয়ানক পণ্ডিতী ব্যাপার। নাক-গলাবার চেষ্টাটা নিরাপদ নয়।

অথচ, "লালা" মানেও যা, "বক্ত্রাসব" মানেও তাই। কেবল, দ্বিতীয়টার ব্যবহারে লোক-ঠকানে পটুতার পরিচয়। কুমারিলের ভাষায়:

"বঞ্চনার্থ উপন্যাসো লালাবক্ত্রাসবাদিবৎ"

—বঞ্চনার উৎসাহে "লালা"-র বদলে "বক্ত্রাসব" ধরনের শব্দ পাড়বার মতো।

কুমারিলের লেখায়, এটা নেহাতই একটা উপমা। কিন্তু কেন এই উপমা? কেননা, দার্শনিক মহলেও এই রকমই একটা কায়দা চালু আছে। বক্তব্যে যদি ফাঁকি থাকে তাহলে সিধে কথায় বললে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কঠিন। সহজ বুদ্ধির জেরাতেই ফেঁসে যাবার ভয়। কিন্তু পাণ্ডিত্যের জমকালো পোষাকে সাজিয়ে একই কথাকে গভীর কোনো তত্ত্ব বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কুমারিলের এই মন্তব্য থেকে শুরু করার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমত, ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ। পাণ্ডিত্যের পিছু ধাওয়া না-করেই বর্তমান বইটা লেখবার চেষ্টা করেছি। তাই উদ্ধৃতি আর পাদটীকা সাধ্যমতো বাদ দিয়েছি। কঠিন পারিভাষিক শব্দও। কিন্তু একেবারে সবকিছু বাদ দিয়ে লেখার দক্ষতা নেই। তবে যতোটা সোজা ভাষায় লেখা যায়, পরিভাষার যতোটা পাশ কাটানো সাধ্যে কুলোয়—তারই চেষ্টা করেছি। হয়তো অতি-সারল্যের অপবাদ জুটবে। তবে তা বিশেষ করে বিদগ্ধ মহল থেকে। সে-মহল থেকে বাহবা পাবার আশায় লিখলে অন্য রকম চেষ্টা করতাম। হয়তো, অন্য বিষয়েও। কেননা, বস্তুবাদী দর্শনটাই বিদগ্ধ মহলে খুব একটা মর্যাদার দাবিদার নয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কথা অবশ্য আলাদা। সমাজতন্ত্রের আদর্শে যাঁদের সংগ্রাম, তাঁদের কথাও আলাদা। কিন্তু এসব কথা তোলার সুযোগ পরে পাবো। আপাতত কুমারিলের কথাটা আর একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা যাক।

কোন্ প্রসঙ্গে কুমারিল "লালা" শব্দের বদলে "বক্ত্রাসব" শব্দ ব্যবহারের লোক-ঠকানে কায়দার কথা বলছেন? ভাববাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাই এখানে অবান্তর হবে না।

আমাদের দেশে ভাববাদের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় 'উপনিষদ্' সাহিত্য—আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। কিন্তু উপনিষদে তা মূলতই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘোষণার মতো, যুক্তিতর্ক বা বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। সে-প্রয়াসের প্রথম পরিচয় খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। নাগার্জুনের রচনায়। তাঁর মতটির প্রচলিত নাম শূন্যবাদ। বলবার কথাটা মূলত এই যে পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ বলে সাধারণে যা মানে তা শূন্য—মিথ্যা বা কাল্পনিক ব্যাপার। এর

পিছনে যা কিনা পারমার্থিক সত্য তা অনির্বাচনীয় ; পার্থিব ভাষার নাগালের বাইরে। নাগার্জুনের পর—আনুমানিক পঞ্চম শতক থেকে—অন্তত শব্দব্যবহারে কিছুটা রদবদল করে বিজ্ঞানবাদ নামে ভাববাদের প্রচার। ভারতীয় দর্শনে "বিজ্ঞান" শব্দটা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত : একেবারে বিশুদ্ধ মানস সংবেদন (sensation) বা বিশুদ্ধ ধারণা (idea)। য়ুরোপীয় দার্শনিক বিশপ বার্কলি (Bishop Berkeley) যে ধরনের কথা বলেন তারই অন্তত খুব কাছাকছি কিছু। নামটা বিজ্ঞানবাদ, কেননা এই অর্থে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান—বা, ওঁরা বলবেন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা—পারমার্থিক সত্য। অতএব, সাধারণ মানুষ যাকে বস্তুজগৎ বা material world বলে ভাবে তা আসলে কাল্পনিক—স্বপ্ন দেখা জগতের মতো, মরীচিকায় জল দেখার মতো। এর পর অষ্টম/নবম শতকের দার্শনিক শঙ্করাচার্যর কথা। তাঁর দেওয়া ভাববাদের সবচেয়ে প্রচলিত নাম মায়াবাদ। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মতোই আসল চোটটা অবশ্যই পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের উপর : ওর সবটাই মায়া, মিথ্যা, অজ্ঞানের ঘোরে দড়িতে সাপ দেখার মতো, তার পিছনে পারমার্থিক সত্য বলতে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম।

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে অবশ্য শূন্যবাদী এবং বিজ্ঞানবাদীরা বৌদ্ধ; মায়াবাদী বেদপন্থী। কিন্তু দার্শনিক সারাংশর ব্যাপারে এই তফাত অনেকাংশেই অবান্তর। মূলত একই কথা : তফাৎটা প্রধানতই পরিভাষার। তাই কুমারিলের ভাববাদ খণ্ডন সরাসরি শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে হলেও তাৎপর্যর দিক থেকে তা মায়াবাদের বিরুদ্ধেও।

শূন্যবাদই বলুন, বিজ্ঞানবাদই বলুন আর মায়াবাদই বলুন—একটা কথায় তিনটি দর্শনই একমত। বস্তুজগৎ বলে সাধারণ মানুষ যা নিয়ে ব্যস্ত তা নেহাতই কাল্পনিক কিছু। অজ্ঞানের ঘোরে মানুষ এজাতীয় জগৎটার কল্পনা করে থাকে। স্বপ্নে দেখা হরেকমারি জিনিসের মতো, দড়িতে সাপ দেখার মতো, মরীচিকায় জল দেখার মতো। পুরো ব্যাপারটাই ভুয়ো, কাল্পনিক, মিথ্যা।

কিন্তু এইভাবে তামাম দুনিয়াকে বেবাক মিথ্যে বা কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিতে গেলে একটা জায়গায় হোঁচট খেতে হয়। অতিবড়ো ভাববাদীর ব্যবহার থেকেই প্রমাণ, তিনিও মনেপ্রাণে কথাটা মানতে পারেন না। ক্ষিদে পেলে তো তিনি খাবারের খোঁজে যান, তেষ্টা পেলে জল পান করতেই বাধ্য হন, লজ্জা নিবারণের খাতিরে জামাকাপড়ই খোঁজেন। কই, তখন তো তাঁরা আর এই সব বাস্তব জিনিসগুলিকে ভুয়ো বা কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিতে

পারেন না। দড়িতে দেখা সাপটাকে না হয় ভ্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু ঘরে যদি সত্যিই সাপ বেরোয়? তখন তো আর পালাবার পথ বা লাঠি-সোঁটা খোঁজা ছাড়া উপায় থাকে না! তাহলে মুখে ভাববাদীরা যাইই বলুন না কেন—এবং সে-কথা প্রমাণের জন্যে যতো যুক্তিতর্কের জাল মেলে ছোট-বড়ো বই লেখার আয়োজন করুন না কেন—বাস্তব প্রয়োগজীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভাববাদের পক্ষে অসম্ভব।

আপত্তিটা নিশ্চয়ই সহজ নয়। ভাববাদের পক্ষ থেকে তার কী উত্তর দেওয়া যায়? নাগার্জুন থেকে শুরু করে ভারতীয় ভাববাদীরা মোটের উপর একই উত্তর দিয়েছিলেন। তার মূল কথা হলো, আসলে মিথ্যে বা ভুয়ো হলেও এই বস্তুজগৎকে এক অর্থে মানতেও হবে। কোন্ অর্থে? শূন্যবাদ ও বিজ্ঞান-বাদের পরিভাষায় "সংবৃতি সত্য" অর্থে, মায়াবাদের পরিভাষায় "ব্যবহারিক সত্য" অর্থে। কিন্তু পরিভাষা যাই হোক-না-কেন, বক্তব্যটা আসলে কী? সরল ভাষায় বক্তব্যটা এই যে, আসলে অবশ্য এ সবই মিথ্যে; তবে প্রয়োগ জীবনের দিক থেকে সাময়িক ও সীমিত অর্থে কোনো একরকম সত্য।

এই হলো ভাববাদীর বক্তব্যর মূল কথা। এবং এই কথাগুলি মনে রেখেই কুমারিলের বিদ্রূপটা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর বক্তব্য হলো, ওই "সংবৃতি সত্য" বলে কথাগুলোই একরকম ধাপ্পাবাজি। কথাগুলোর অর্থ শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়? একমাত্র এই যে "একরকম সত্য যা আসলে সত্যই নয়"। কুমারিল বলছেন, এ-জাতীয় কথা শব্দের মারপ্যাঁচ ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? হয় সোজাসরল ভাষায় বলো "সত্যি" আর না-হয় তো বলো "মিথ্যে"। কিন্তু "একরকম সত্যি যা কিন্তু সত্যি নয়" বা "এক রকমের মিথ্যে যাকে সাময়িকভাবে সত্যি বলে ধরা যায়"—এ-জাতীয় কথা নেহাতই ফাঁপা বাগাড়ম্বর মাত্র। অতএব, ভাববাদীদের ওই "সংবৃতি সত্য" (বা "ব্যবহারিক সত্য") আসলে সহজ সরল ভাষা এড়িয়ে ধোঁকা দেবারই একটা কায়দা—সাদামাটা "লালা" শব্দ ব্যবহার না-করে "বক্ত্রাসব" শব্দ ব্যবহার করার মতো।

বিদ্রূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু হাসি-তামাসাটুকুর কথা ছাড়াও পুরো বক্তব্যটার দিকে ফিরে তাকালে কুমারিলের আসন্ন দার্শনিক বিশ্লেষণের গুরুত্বটা নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়। বিশেষ করে বর্তমান বই-এর পক্ষে—ভারতে বস্তুবাদের আলোচনার দিক থেকে—এই দার্শনিক বিশ্লেষণ বিশেষ প্রাসঙ্গিক। তার মানে নিশ্চয়ই কুমারিলকে বস্তুবাদী বলে ঘোষণা করবার কোনো প্রস্তাব

নয়। তাহলে, সামগ্রিকভাবে তাঁর দার্শনিক মতের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা মনে রেখেও কুমারিলের বিচার-বিশ্লেষণের একটা অন্তত পরোক্ষ তাৎপর্য আমাদের আলোচনার পক্ষেও প্রাসঙ্গিক কেননা তাঁর যুক্তির আসল উদ্দেশ্য হলো ভাববাদ খণ্ডন এবং দর্শনের ইতিহাসে মূল দ্বন্দ্ব বলতে ভাববাদ বনাম বস্তুবাদ। তাই ভাববাদ খণ্ডন মানে অনিবার্যভাবেই বস্তুবাদের স্বীকৃতি না-হলেও অন্তত পরোক্ষভাবে বস্তুবাদের পক্ষে কিছুটা জমি নিশ্চয়ই তৈরি। ভাববাদের মেঘে চিন্তার আকাশ যতোক্ষণ আচ্ছন্ন ততোক্ষণ সাধারণভাবে বস্তুবাদের সম্ভাবনাটাই চোখে পড়ে না। এদিক থেকে বলা যায় ভাববাদের বিরুদ্ধে যে-কোনো আঘাত এক অর্থে বস্তুবাদের সহায়ক হবার কথা।

ভাববাদ খণ্ডনে কুমারিলের যুক্তিটাকে কিন্তু ভাববাদের বিরুদ্ধে যে-কোনো একরকম আঘাতের সঙ্গে তুলনা করাও ভুল হবে। একদিক থেকে বলা যায়, একেবারে মূলে আঘাত। কেননা, দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ খণ্ডনের আরো অনেক রকম নজির অবশ্যই আছে। কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশরই প্রধান অবলম্বন বলতে বিশুদ্ধ বুদ্ধির কাছে আবেদন। কিন্তু তার ন্যায্য মূল্য স্বীকার করেও মনে রাখা দরকার যে এইভাবে খণ্ডনের কিছুটা বিপদও আছে। ভাব-বাদেরই ফাঁদে পড়বার বিপদ। কেননা, ভাববাদের মূল দাবিটাই এই যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিই বা বিশুদ্ধ চেতনাই—বা যে-কোনো ভাষাতেই কথাটা বলা যাক না কেন—পরম সত্য; অতএব চেতনার দাবিটাই চরম দাবি। অতএব তারই কাছে আবেদন-নিবেদন যতো ভাবেই করা যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারই পরম গুরুত্ব অন্তত উহ্য থাকে। ফলে এই পথে এগিয়ে ভাববাদেরই অন্তত প্রচ্ছন্ন প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি শেষ পর্যন্ত সম্ভব কিনা এ-বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে।

কুমারিলের আলোচ্য বিরুদ্ধতা কিন্তু স্পষ্টই অন্য পথে। বিশুদ্ধ বুদ্ধির কাছে আবেদন-নিবেদনের বদলে সরাসরি প্রয়োগজীবনের—বাস্তব কর্মজীবনের—কাঠগড়ায় ভাববাদকে দাঁড় করানো। বস্তুজগৎটাকে ভুয়ো বা কাল্পনিক বা মিথ্যা বলে প্রচার করার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ভাববাদী নিজেই প্রয়োগজীবনের ক্ষেত্রে রীতিমতো হোঁচট খেতে বাধ্য। আর তখন শব্দ-ব্যবহারের গোঁজামিল দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ভারতে ভাববাদীরা এ-হেন গোঁজামিল হিসেবেই শেষ পর্যন্ত "সংবৃতি সত্য" বা "ব্যবহারিক সত্য" বলে কিম্ভূত কিমাকার কথা বলতে বাধ্য হন, মোদ্দা কথায় যার মানে দাঁড়ায় "সত্যি কিন্তু সত্যি নয়।"

তার মানে, বিশুদ্ধ বুদ্ধির কাছে আবেদনের বদলে সরাসরি কর্মজীবনের সাক্ষ্য দাঁড় করানো। এবং এদিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হয়, ভারতীয় দর্শনে একেবারে আপসহীন বস্তুবাদীদের মূলত একই কথা। বাস্তব কর্মজীবনের দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করুন ; দেখবেন আত্মা, পরলোক, পাপপুণ্য প্রভৃতি হাজারো গালভরা কথা একেবারে মিশমার হয়ে যাবে। বলি-দেওয়া ছাগলটা সিধে স্বর্গে গেলে নিজের বাপকে হাড়িকাঠে দাও।

এ-হেন আপসহীন বস্তুবাদীদের নিয়েই বর্তমান বই-এর মূল আলোচনা। তাঁদেরই সবচেয়ে প্রচলিত নাম চার্বাক, যদিও লোকায়ত বা বার্হস্পত্য নামেও পরিচিতি আছে। বর্তমান বইটা শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখবার যাঁদের ধৈর্য থাকবে তাঁরা দেখবেন, এঁদের বক্তব্য আজ অনেকাংশেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেটুকু টিঁকে আছে তা থেকে নানা কথা অনুমানের সুযোগ অসম্ভব নয়। এখানে ছোটো করে সে-বিষয়ে কিছু বলে রাখা যায়।

প্রথমত, বিশুদ্ধ বুদ্ধির কাছে আবেদন-নিবেদনের চেয়ে এঁদের কাছে বড়ো কথা ছিলো বাস্তব কর্মজীবনের সাক্ষ্য। তারই নিরিখে সত্যমিথ্যার চরম বিচার। একালের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পরিভাষায় : *Practice is the criterion of truth.* অবশ্যই এই ভাষা সেকালের চার্বাকদের জানা ছিল কিনা জানা নেই। থাকবার সম্ভাবনা কম। বরং মনে হয়, চার্বাকেরা মার্জিত ভাষা ব্যবহারের বিশেষ তোয়াক্কা করতেন না। তবুও বলবার কথাটা মূলত একই।

অবশ্য আমাদের দেশে প্রায় সারা দার্শনিক সাহিত্য জুড়ে এঁদের বিরুদ্ধে গালাগাল ও অবজ্ঞার যেন অবধি নেই। অনেকটা অবশ্য তারই প্রভাবে—এবং অনেকটা হয়তো সাধারণভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে একালের প্রচার-অভিযানের ফলে—আজকালকার দিনে ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আলোচনায় এই আপসহীন বস্তুবাদটিকে নেহাতই নিকৃষ্ট কোনো একরকম মত বলে অবজ্ঞা করার প্রথা। বর্তমান বইতে কিন্তু দেখাবার চেষ্টা করেছি, দর্শনটি সত্যিই অমন অবজ্ঞার বিষয় নয়। প্রথমত, চার্বাককে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করবার উৎসাহে তার ঘাড়ে এমন অনেক কথা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিলো যা আসলে চার্বাকের প্রকৃত বক্তব্য হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, মতটাকে খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে বহু বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও মতটার এমনই এক সহজাত বা স্বাভাবিক শক্তি ছিলো যে তা খণ্ডন করা তেমন সোজা কথা নয়। তৃতীয়ত—সাধারণত যে-

আলোচনা প্রায় একেবারেই করা হয় না—নানা দার্শনিক মতটার বিরুদ্ধে মুখে রকমারি আস্ফালন করলেও—খতিয়ে দেখলে সন্দেহ হয় যে অন্তত কয়েকটি প্রখ্যাত দর্শনের সঙ্গে নানা বিষয়ে এই মতেরই মৌলিক সাদৃশ্য। আরো বড়ো কথা হলো, ভারতে প্রকৃতিবিজ্ঞান যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয়েছিলো তার তত্ত্বগত ভিত্তি বলতেও অনেকাংশে এই আপসহীন বস্তুবাদই।

কিন্তু যদি এসব কথা সত্যি হয় তাহলে অন্যান্য নানা প্রখ্যাত দার্শনিকেরা চার্বাকের নানা বক্তব্য বস্তুত স্বীকার করেও চার্বাকের বিরুদ্ধে অজস্র কড়া কথা বলেছেন কেন? প্রশ্নটার উত্তর-সন্ধানে দর্শন ছেড়ে রাজনীতির আওতায় যেতে হয়েছে। দেখাবার চেষ্টা করেছি, দেশের আইনকর্তারা চার্বাকের বিরুদ্ধে—এবং চার্বাক-সম্মত নানা মতের বিরুদ্ধে—একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন, কেননা এসব কথা সাধারণের মাথায় ঢুকলে আইনকর্তাদের আদর্শ সমাজের পরিকল্পনায় কঠিন সংকট দেখা দেবার সম্ভাবনা। সাধারণ লোক আইন-কর্তাদের বিধান মাথা পেতে মেনে নেওয়ার বদলে তাঁদের সমাজ-আদর্শের বিরুদ্ধে রকমারি বেয়াড়া প্রশ্ন তুলতে শুরু করবে। অতএব চার্বাক-সম্মত নানা কথা অনেক সময় অল্পবিস্তর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, আবার অনেক সময় বা রকমারি পরিভাষা প্রয়োগের আড়াল দিয়ে ফলত স্বীকার করা সত্ত্বেও অনেকেই আইনকর্তাদের চোখে যেন কিছুটা ধুলো দেবার চেষ্টায় চার্বাকের বিরুদ্ধে বিস্তর কড়া কথা বলেছেন এবং আইনকর্তাদের রুচিসম্মত মতের প্রতি জোর গলাতেই মৌখিক অনুগত্য প্রকাশ করেছেন। মুক্তিপণ চুকিয়ে পার পাবার মতো।

তার ফলে ভারতে দার্শনিক পরিস্থিতিটা শেষ পর্যন্ত কী রকম দাঁড়িয়েছিলো তার কিছুটা আলোচনাও তুলতে হয়েছে। সে-আলোচনা অবশ্যই বিতর্কসাপেক্ষ হতে বাধ্য। পাঠক যদি মোটের ওপর খোলা বা সংস্কারমুক্ত মনে সে-বিতর্কে অগ্রসর হন তাহলেই নিজের চেষ্টাটা সার্থক বলে স্বীকার করে নেবো। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শুধু আর একটি কথা বলার প্রলোভন থেকে যায়।

আইনকর্তাদের মতামতকে নির্লিপ্ত সত্যান্বেষণ বলে কল্পনা করার কারণ নেই। আইন মানেই দেশশাসনের রীতিনীতি, শাসক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার খাতিরেই রকমারি বিধি-নিষেধ। অতএব আইনকর্তারা যদি দর্শনের ব্যাপারেও উৎসাহ প্রকাশ করেন তাহলে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্বীকার করাও অবাস্তব হবে। এই সহজ কথাটা মনে রাখলে চার্বাক প্রসঙ্গে যেটুকু জানা আছে তারই ভিত্তিতে চার্বাকমতের একটা রাজনৈতিক ভূমিকাও

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আইনকর্তাদের প্রধান চোটটা চার্বাকদের বিরুদ্ধে—আত্মা, পরকাল, পাপপুণ্য বলে কর্মফল প্রভৃতি অস্বীকার করার বিরুদ্ধে এবং অবশ্যই চোখে দেখা জগতের বাস্তব ঘটনাগুলোকে অমোঘ সত্য বলে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে। তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে চার্বাকের কথা সাধারণ লোকের চেতনায় গেঁথে দিতে পারলে সমাজ-শাসনটা তুলনায় সহজ হয়। কিন্তু তার তাৎপর্য আরো এই যে রাজনীতির দিক থেকে চার্বাকদের একরকম বৈপ্লবিক ভূমিকা মানতে হবে। নামান্তরে চার্বাক লোকায়ত বলে প্রসিদ্ধ এবং এই নামান্তরের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হলো ইতর জন-গণের মনের মতো কথা। এ থেকে কি কোনোরকম রাজনৈতিক অনুমানের সুযোগ থাকে? যদি থাকে তাহলে সমগ্র ভারতীয় দর্শনে শুধুমাত্র চার্বাকেরই একটা বৈপ্লবিক ভূমিকা স্বীকার্য। আর কোনো দার্শনিক আত্মা, পরকাল, কর্মফল প্রভৃতি আইনকারদের রুচিসম্মত—অতএব শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সঙ্গত—মতামতের বিরুদ্ধে অমনভাবে রুখে দাঁড়াননি।

অবশ্যই আজকের দিনে এই বৈপ্লবিক ভূমিকাটি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের কারণ নেই। চার্বাকের উদ্দেশ্য সেকালে সফল হয়নি। ঐতিহাসিক ভাবে হবার কথাও নয়। দার্শনিক মতামতের রাজনৈতিক ভূমিকা স্বীকার করেও আরো বোঝা দরকার সে-ভূমিকার সার্থকতা নির্ভর করে বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর। চার্বাক হাজার হোক প্রাচীনকালের দর্শন এবং প্রাচীনকালে ইতর জনগণের বা খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তির পক্ষে প্রাসঙ্গিক বাস্তব পরিস্থিতি গড়ে ওঠার কথা কল্পনাতীত। তার মূল শর্ত উৎপাদনের উপায়ে অনেক অনেক উন্নতি। বৈপ্লবিক উন্নতি। য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের যুগ থেকে তার সূত্রপাত এবং অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত তার বিকাশ। তাই অতি-আধুনিককালেই তার প্রকৃত প্রস্তুতি এবং ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তার সাফল্যও। এক নবীন নিঃশ্রেণীক সমাজের ছবি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। কিন্তু তারই সঙ্গে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভী শাসকশ্রেণীর মূর্তিও ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হতে বাধ্য হচ্ছে। পুরো পৃথিবীটাকেই পুড়িয়ে খাক করার চক্রান্ত। সে-চক্রান্ত বলতে ভয়ংকর মারণাস্ত্রের বিভীষিকা তো আছেই। কিন্তু তারই সঙ্গে আছে রকমারি ও উদ্ভট দার্শনিক মতামতের প্রচারে নগদ দক্ষিণার নানা আয়োজন। কেননা, এ-জাতীয় মতামতের প্রভাবে খেটে-খাওয়া মানুষকে

কমবেশি বিভ্রান্ত করার আশা, চিন্তা-চেতনাকে অল্পবিস্তর পঙ্গু করার প্রচ্ছন্ন কৌশল। সাধারণ মানুষের সংগ্রামটা তাই আজো শুধু রাজনীতির আর অর্থনীতির সংগ্রামই নয়; মতাদর্শের সংগ্রামও, কিংবা, যা একই কথা, দর্শনের সংগ্রামও। লেনিন অবশ্য বর্তমান শতকের শুরুতেই দেখিয়েছিলেন, মুনাফা-লোভী সম্প্রদায়ের অতি-আধুনিক প্রতিনিধিরা—সাম্রাজ্যবাদীরা—যে-সব অতি আধুনিক দার্শনিক মতবাদের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক সেই মতবাদগুলির অধিকাংশই কিম্ভূতকিমাকার নতুন নতুন মুখোস পরানো প্রাচীনকালের পচাধ্বসা ভাববাদ ও বিশ্বাসবাদ ছাড়া কিছু নয়। কেবল প্রকাশ-কৌশলে অজস্র কঠিন পরিভাষার ছড়াছড়ি—"লালা" না বলে "বক্ত্রাসব" বলার মতোই। আসল সাপ নয়; আসলে ঢোঁড়া সাপ। তাই বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে বস্তুবাদের পথ ছেড়ে এই সব প্রচ্ছন্ন ভাববাদের পাঁকে পড়বারও কোনো কারণ নেই। বাগাড়ম্বরের বিস্তার যতোই হোক-না-কেন, দর্শনের ক্ষেত্রে মূল বিতর্কটা আজো একই রয়ে গেছে: বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্কই, অন্ধ বিশ্বাস-বনাম-মুক্ত বিচারের বিতর্কই, প্রয়োগজীবন-বনাম-ফাঁপা কথার বিতর্কই।

আজকের এই পরিস্থিতিতে প্রাচীন চার্বাকের দিকে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করেছি। প্রাচীন মতটার টানে পিছু হটবার অবশ্যই কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ইতিহাসকে উড়িয়ে দেবারও উপায় নেই। আপসহীন বস্তুবাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার জন্যে যাঁরা প্রথম দর্শনের সদর দরজায় নির্ভীক করাঘাত করেছিলেন তাঁদের কথা মনে না-রাখলে মানুষের ইতিহাসটাই যে ভুলে যাবার ভয়। চার্বাক যে-বস্তুবাদের ভিত গড়তে চেয়েছিলেন এককালে তার রূপ হয়তো বরফের পাহাড়ে প্রথম ধ্বস ধরার মতো সামান্য কম্পন। কিন্তু দীর্ঘ ইতিহাসের ঢাল বেয়ে এগুতে এগুতে এই বস্তুবাদই আজ যে বিশাল হিমানী সম্প্রপাতের রূপ নিয়েছে তাকে রোখা একালের রকমারি পরিভাষাকারদের অতি বড়ো কৌশলবাজের পক্ষেও কি সত্যিই সম্ভব?

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

চার্বাক। লোকায়ত

১॥ রকমারি সমস্যা

চার্বাক নিয়ে অনেক সমস্যা আছে।

চার্বাক মানে কী? চার্বাক কি কোনো ব্যক্তির নাম, নাকি কোনো সম্প্রদায়ের নাম?

সাবেক কালের ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যায় লেখা একালের নানা বইতে চার্বাক শব্দের প্রধানত দু'রকম মানে দাঁড় করাবার চেষ্টা দেখা যায়।

এক : 'চারু বাক্' থেকে চার্বাক।

দুই : 'চর্ব' (অর্থাৎ চর্বণ) থেকে চার্বাক।

কিন্তু হাঙ্গামা আছে। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনোটাই টেঁকে না।

'চারু+বাক্' থেকে 'চারুবাক্' হবার কথা, চার্বাক নয়। অবশ্য মাঝখানের 'উ'-কারটা লুপ্ত হতে পারে। তাহলেও কিন্তু কথাটা হবে 'চার্বাক্' বা 'চার্বাক্', অর্থাৎ শব্দটির শেষে 'ক'-এ হসন্ত বা 'ক্' হবার কথা। অথচ ভারতীয় দর্শনের সব বইতেই শব্দটি 'অ'-কারান্ত। কোথাওই 'চার্বাক্' লেখা নেই; সর্বত্রই চার্বাক।

তাহলে কি 'চর্ব' থেকে চার্বাক? বলা হয়, 'চর্বণ করে যে'—এই অর্থে চার্বাক। কিন্তু ব্যাকরণ অনুসারে 'চর্বণ করে যে'—এই অর্থে 'চার্বক' শব্দ নিষ্পন্ন হবার কথা, চার্বাক নয়। মাঝখানে একটা 'আ'-কার আসবে কোথা থেকে?

অবশ্য ব্যাকরণের কূটকচাল নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমাদের আলোচনা দর্শন বা মতাদর্শ নিয়ে। সেদিক থেকে কিন্তু বিশেষ করে নজর দেবার মতো একটা ব্যাপার এখানে আছে। ব্যাকরণের বিচারে চার্বাক শব্দের

এই দুরকম মানে দাঁড় করাবার চেষ্টায় গলদ থাকলেও, মতাদর্শ বিচারের দিক থেকে কোনোটাই নিরর্থক নয়। দুরকম চেষ্টার পিছনেই বরং একই উৎসাহ।

কিসের উৎসাহ? ঠেস দেবার বা খোঁচা দেবার উৎসাহ। কিছুটা সাধু ভাষায় যাকে বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। চালু কথায় প্রোপাগাণ্ডা।

চারু থেকে চার্বাক। অর্থাৎ যে-সব কথা—বা যার বা যাদের কথা—বেশ সুন্দর, চারু; মনের মতো কথা, মনকে সহজে টানবার মতো কথা। কিন্তু তারিফ নয়, বিদ্রূপ। আসল বক্তব্যটা এই যে কথাগুলো নেহাতই আপাত-মনোরম বা আপাত-সুন্দর। কী রকম কথা? খাও, দাও, ফুর্তি করো, পরকাল-পরলোক নিয়ে মাথা-ব্যথার কোনো কারণ নেই; কেননা এসব নেহাতই লোক-ঠকানে গাল-গল্প। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাৎপর্যটা খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন: 'মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভোগের দিকে। দর্শনের সিদ্ধান্ত গভীর চিন্তার পর জ্ঞাত সত্য হিসাবে যদি এই সব প্রবৃত্তির সাফাই গাওয়া হয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত বহু নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী! চার্বাকের অদৃষ্টে সেই বাহবা জুটিয়াছিল।……প্রবৃত্তির উপাসনার সহায়ক তাহার উক্তি মধুর—শ্রুতি-সুখকর—সেইজন্য চারু।' কতো অনায়াসে মতটাকে হেয় করবার আয়োজন! চার্বাক শব্দ থেকেই বোঝা যায়, মতটার মধ্যে মহত্তর আদর্শের বালাই নেই; বরং একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। কিংবা, চার্বাকের সম্বন্ধে বেশ কড়া হুঁশিয়ারি। ওসব মন-ভোলানো কথায় কান দিলে ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হবার আশঙ্কা!

চর্ব থেকে চার্বাক। এই ধরনের মানে দাঁড় করানোর পিছনেও একই উৎসাহ। খানা-পিনাটুকুই বুঝি পরম পুরুষার্থ। এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না এবং অপরকে বুঝতে দিতে চায় না বলেই নাম চার্বাক। অতএব সাবধান! এই মত একেবারে সর্বনেশে মত, সরাসরি উচ্ছন্নে পাঠাবার উপদেশ।

তাহলে, ব্যাকরণের বিচারে টিঁকুক আর নাই টিঁকুক, দুরকম মানে দাঁড় করাবার পিছনে একই উৎসাহ। একই বিদ্বেষ। বিদ্বেষটা শুধু একালের লেখাতেই নয়। বহু শতাব্দী ধরে বহু গ্রন্থে এই বিদ্বেষের পরিচয়। রাশিরাশি নজির আছে।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে এতো বিদ্বেষ? নিশ্চয়ই একটা দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে। কিন্তু দার্শনিক মতের কথা ভাবতে গেলে মানুষের কথাও ভাবতে হয়—যে বা

যারা ওই মতের প্রবর্তক বা সমর্থক। দার্শনিক মত হাওয়ায় গজায় না। অর্থাৎ, চার্বাক বলতে একটা দার্শনিক মত বোঝালেও চার্বাক-মতানুসারী মানুষের কথাও ভাবা দরকার।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে : চার্বাক কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম, নাকি কোনো সম্প্রদায়ের নাম—যে-সম্প্রদায়ের সকলেই চার্বাকপন্থী ?

ব্যক্তির নাম মনে করলে অবশ্যই অনেক প্রশ্ন উঠবে। কোথাকার লোক ? কবেকার লোক ? কেননা, দেশটা ছোটো নয়। দেশের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। তাই স্থান-কাল বাদ দিয়ে কারুর পরিচয়ই পর্যাপ্ত হয় না। আবার, চার্বাক যদি ব্যক্তিবিশেষের নাম না হয়ে সম্প্রদায়-নাম বলেই বিবেচিত হয়, তাহলেও রকমারি প্রশ্ন থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যাবে না। কোথাকার সম্প্রদায় ? কবেকার সম্প্রদায় ? তার কি কোনো শাখা-প্রশাখা বা উপসম্প্রদায় ছিলো ?

প্রশ্নগুলো অবশ্যই অবান্তর নয়। এগুলো একেবারে এড়িয়ে যেতে গেলে চার্বাকের আলোচনা অনেকাংশে অবাস্তব হবার আশঙ্কা। কিন্তু শুরুতেই এসবের বিচারে এগুতে গেলে খানিকটা ফেঁসে যাবারও ভয় থাকে। তার কারণ ছোটো করে বলে রাখা ভালো।

প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করা দরকার, প্রশ্নগুলোর নির্ভুল উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের গবেষণা আরো গভীর হলে ভবিষ্যতে এসব সমস্যার কোনো কিনারা হবে কিনা তা নিয়ে এখুনি মাথা ঘামিয়েও লাভ নেই।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে হাল-আমলের বিদ্বানরা সমস্যাগুলোর আলোচনা করেননি। অনেকেই করেছেন। অনেক রকম আলোচনা। এবং বিদ্বান্ হিসেবে তাঁদের অনেকের নাম এমনই শ্রদ্ধেয়, যাঁদের কথা উড়িয়ে দেওয়া বেশ কিছুটা দুঃসাহসের ব্যাপার। কিন্তু মুস্কিল এই যে তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও মিল নেই : একের কথা অপরে অনেক সময় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, অনেক সময় একেবারে বরবাদ করে দিতে চেয়েছেন। তার একটা কারণও আছে। তাঁদের মন্তব্য সব সময় ঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তর মতো নয়, বা সিদ্ধান্ত হিসেবে এগুলো ঠিক বৈজ্ঞানিক মর্যাদার দাবিদার নয়। প্রায়ই বেশ কিছুটা জল্পনা-কল্পনার মতো। যৎসামান্য তথ্য থেকে বড়োসড়ো কথা প্রমাণ করার উৎসাহও চোখে পড়ে। তথ্য নিয়েও হাঙ্গামা আছে। প্রায়ই যে-কথা চার্বাক সংক্রান্ত তথ্য বলে ধরে নেওয়া হয়, সে-কথা হয়ত তথ্যই নয়। তথ্য-বিকৃতি মাত্র।

কখনো বা নেহাতই বিরুদ্ধ প্রচার। যাকে বলে প্রোপাগাণ্ডা। পরে দেখবো, চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার বহর কতখানি, আর তার পিছনে আসল উৎসাহটাও কেন অতি প্রবল। হাঙ্গামা আরো আছে। পুরোনো পুঁথিপত্রে চার্বাক প্রসঙ্গে যে-সব কথা লেখা আছে, তার মধ্যে অনেক সময় অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে মিল খুঁজে পাওয়াও কঠিন।

এইসব নানা কারণে প্রাচীন চার্বাক নিয়ে আধুনিক বিদ্বান্‌দের বিবিধ ও বিচিত্র সিদ্ধান্ত। প্রায়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও। এই কারণে শুধু তাঁদের বিদ্যার নজির থেকেই সিদ্ধান্তর সার্থকতা অনুমান করা নিরাপদ নয়।

সোজা কথায়, অনেক তর্ক আছে। তর্ক আরো বাড়ানো যায়। কিন্তু শুরুতেই সে-সবের আলোচনা তুলতে গেলে সমস্যাগুলো আরো ঘোলাটে হবার ভয়। যেটুকু মোটের উপর সুনিশ্চিত এবং বিশেষ করে আজকের দিনে চার্বাক নিয়ে আলোচনার যেটা আসল তাগিদ তাও রকমারি বিতর্কের আর পুঁথি-বিচারের অলিগলিতে হারিয়ে যাবার ভয়।

কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা করা যাক। চার্বাক মানে কী, চার্বাক কোনো ব্যক্তির নাম না সম্প্রদায়ের নাম—এই সব প্রশ্ন নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও, অন্তত একটি বিষয়ে তর্ক তোলার বড়ো একটা সুযোগ নেই।

কী বিষয়ে?

আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকে প্রসিদ্ধ ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে একটি প্রথা প্রায় অবিচল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রথা অনুসারে, চার্বাক বলতে আমরা একরকম আপসহীন বস্তুবাদী দর্শন বা তার প্রবক্তা বস্তুবাদী দার্শনিক বুঝতে বাধ্য। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকে কেন বলছি এবং তার আগে এই দার্শনিক মতের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় কিনা—এসব কথা তোলবার আগে দার্শনিক পরিভাষা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা সেরে নেওয়া ভালো।

২॥ পরিভাষা প্রসঙ্গে : বস্তুবাদ ও ভাববাদ

প্রচলিত অভিধান অনুসারে, ইংরেজী *materialism* বা মেটিরিয়ালিজম-এর প্রতিশব্দ জড়বাদ। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে জড়বাদ শব্দের প্রচলন নেই, অন্তত উল্লেখযোগ্য দার্শনিকদের রচনায় শব্দটি বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

তাহলে অভিধানকারদের বিচারে জড়বাদ শব্দ কেন ?

ম্যাটার বা *matter* থেকে মেটিরিয়ালিজম। যে মতে ম্যাটারই পরম সত্য বা আদি-কারণ বা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মূল উপাদান তারই নাম মেটিরিয়ালিজম। অভিধানকারেরা ম্যাটার অর্থে জড়—অতএব মেটিরিয়ালিজম অর্থে জড়বাদ—শব্দ গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য 'সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র', 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ', 'বেদান্তসার' প্রভৃতি তুলনায় পরবর্তীকালের রচনায় জড় শব্দ চোখে পড়ে। যা নিছক অচেতন বা ঐকান্তিক অর্থে চেতন-বিরুদ্ধ—তাই-ই জড়। পাথরের টুকরো বা মাটির ঢেলার মতো। অনেক সময়, জড মানে স্থাণু, নিশ্চল, গতিহীন।

কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, আমাদের দার্শনিক সাহিত্যে ম্যাটার-এর প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ জড় নয় ; ভূত। যেমন, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত। মেটিরিয়ালিজম-এর প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ তাই ভূতচৈতন্য-বাদ—অর্থাৎ যে-মতে ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। এই মতের সমর্থকেরা দাবি করেন : মাটি, জল, আগুন ও বাতাস বলে চার রকম ভূতবস্তুই পারমার্থিক সত্য, যদিও অবশ্য অনেকে তার সঙ্গে আকাশ নামের পঞ্চম ভূত স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

এখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতকে সত্য বলে স্বীকার করাটুকুই মেটিরিয়ালিজম-এর পরিচায়ক নয়। অনেকের বিচারে, পঞ্চভূত অবশ্যই বাস্তব ; তাছাড়াও আত্মা ও ঈশ্বর মানবার প্রয়োজন আছে। মেটিরিয়ালিজম-এর দাবি কিন্তু ভূতবস্তুই পরম সত্য, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। অতএব আত্মা প্রভৃতি কোনো স্বতন্ত্র পদার্থের কথা অবান্তর। ভূতচৈতন্য-বাদ আখ্যা থেকেই বোঝা যায়, অন্তত ভারতীয় দর্শনে বিতর্কটা প্রধানতই চৈতন্যর উৎপত্তি নিয়ে। নিছক দেহকে পঞ্চভূতাত্মক বলে স্বীকার করেও অনেকে দেহ-অতিরিক্ত বা দেহ ছাড়াও আত্মার অস্তিত্ব মানেন। তার সবচেয়ে বড়ো নজির হলো : চৈতন্য। চৈতন্য একান্তই আত্ম-ধর্ম, মত-বিশেষে আত্ম-স্বরূপ। চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত থেকেই তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। ভূত-চৈতন্যবাদীর দাবি চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত থেকেই চৈতন্যের ব্যাখ্যা সম্ভব : অতএব আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছুর প্রসঙ্গ অবান্তর।

ভারতীয় দার্শনিকদের প্রথা অনুসরণ করে রাহুল সাংকৃত্যায়ন মেটিরিয়ালিজম অর্থে ভৌতিকবাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রচলিত বাংলা লেখায় শব্দটা

স্বীকৃত হয়নি। তার একটা বড়ো কারণ বোধহয় এই যে, চলতি বাংলায় ভৌতিক শব্দের অর্থ একেবারে আলাদা। যেমন: ভৌতিক রহস্য, ভৌতিক কাণ্ড, ভুতুড়ে ব্যাপার। অথচ, আজকালকার লেখায় জড়বাদ শব্দটিরও তেমন চল হয়নি। তার বদলে মেটিরিয়ালিজম অর্থে সাধারণত বস্তুবাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়। দার্শনিক বিচারে এই প্রতিশব্দ নিখুঁত কিনা—এ নিয়ে অবশ্যই তর্কের অবকাশ থাকে। কিন্তু আপাতত সে-বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সাধারণ পাঠক যদি বস্তুবাদ শব্দেই অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে সাধারণপাঠ্য বইতে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেবল মনে রাখতে হবে, এই প্রসঙ্গে বস্তু শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত—ইংরেজী ম্যাটার-এর প্রতিশব্দ।

বস্তুবাদের আধুনিক প্রবক্তাদের বিচারে, মেটিরিয়ালিজম-এর প্রধান প্রতিপক্ষ আইডিয়ালিজম বা ***idealism***। তাঁরা দাবি করেন, সামগ্রিকভাবে দর্শনের ইতিহাসে মূল বিতর্ক বলতে 'মেটিরিয়ালিজম-বনাম-আইডিয়ালিজম'। আইডিয়ালিজম অনুসারে, চেতনা বা চৈতন্য-স্বরূপ পদার্থই প্রকৃত জগৎ কারণ বা পারমার্থিক সত্য। চলতি কথায়, এই চেতন-পদার্থের জন্য আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি রকমারি শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যোগাচার নামে প্রসিদ্ধ একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবক্তারা চেতন-পদার্থকেই পারমার্থিক সত্য বলে গ্রহণ করলেও প্রচলিত অর্থে আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি মানেন না। তাঁদের মত বিজ্ঞানবাদ নামে খ্যাত, কেননা বিজ্ঞান শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো চিত্ত, চৈতন্য ইত্যাদি। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে 'শুধুমাত্র বিজ্ঞান'—সংস্কৃতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা—পারমার্থিক সত্য।

য়ুরোপীয় দর্শনে বিশপ বার্কলি (Bishop Berkeley: 1685-1753) প্রচারিত আইডিয়ালিজম-এর সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানবাদের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। কিছুটা হয়তো এই কারণে—এবং ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসরণ করে—রাহুল সাংকৃত্যায়ন আইডিয়ালিজম-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বিজ্ঞানবাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা লেখায় সাধারণভাবে প্রতিশব্দটি স্বীকৃত হয়নি। তার কারণ, চলতি বাংলায় বিজ্ঞান শব্দের মানে একেবারে আলাদা। ইংরেজীতে যাকে বলে সায়েন্স, *science*। এই অর্থেই আমরা আজকাল পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা বলে থাকি।

আজকালকার বাংলা লেখায় আইডিয়ালিজম-এর প্রতিশব্দ হিসেবে যে

কথাটির বহুল প্রচলন তা হলো ভাববাদ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, 'ভাব' শব্দেরও নানা অর্থ আছে। অনেক সময় অস্তিত্ববাচক অর্থে—অর্থাৎ 'অভাব' শব্দের বিপরীত অর্থে—ভাব শব্দ ব্যবহৃত। সাবেকী ভারতীয় দর্শনে এই অর্থে ভাব-পদার্থ ও অভাব-পদার্থ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। অবশ্য চিত্ত, চিত্ত-বৃত্তি, চিন্তা, ভাবনা প্রভৃতি অর্থেও ভাব শব্দের প্রচলন আছে। অতএব, আজকালকার প্রথা অনুসারে আইডিয়ালিজম অর্থে ভাববাদ শব্দ ব্যবহারে বাধা নেই। কেবল মনে রাখা দরকার, এই প্রসঙ্গে ভাব শব্দ চেতনা-বাচক। অর্থাৎ, ভাববাদের মূল কথা হলো, কোনো-না-কোনো অর্থে চেতন-পদার্থই বা মানস-ব্যাপারই পারমার্থিক সত্য ; অতএব পরিদৃশ্যমান পদার্থরাশি বা বস্তুজগৎ অপ্রধান বা চৈতন্য-নির্ভর ; তার অন্তত কোনো স্বাধীন বা নিজস্ব সত্তা মানা যায় না।

৩ ॥ চার্বাক ও চরম বস্তুবাদ

তাহলে, আজকালকার প্রথা অনুসরণ করে মেটিরিয়ালিজম ও আইডিয়া-লিজম অর্থে আমরা বস্তুবাদ ও ভাববাদ শব্দ ব্যবহার করবো।

এই কথা মনে রেখে চার্বাকের আলোচনায় ফেরা যাক।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে চার্বাক প্রসঙ্গে অবশ্যই অনেক অনিশ্চয়তা আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকে আমাদের দার্শনিক সাহিত্যে একটি প্রথা প্রায় অবিচল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রথা অনুসারে, চার্বাক বলতে আমরা একরকম আপসহীন বা প্রখর বস্তুবাদী দর্শন – বা তারই প্রবক্তাদের—বুঝতে বাধ্য। অষ্টম শতক থেকে বলছি, কেননা তার আগেকার কোনো উল্লেখযোগ্য দার্শনিক গ্রন্থে চার্বাক শব্দ আমার চোখে পড়েনি, একান্তই কোথাও আছে কিনা সুধীজনেরা তা অনুসন্ধান করবেন। অবশ্য মহাভারতে চার্বাক নামে এক রাক্ষসের কথা আছে। কিন্তু মহাভারতের চার্বাক-কাহিনী আলাদা করে আলোচনা করবো। আপাতত দুটি কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই।

এক : বস্তুবাদী দর্শনটিকে চার্বাক আখ্যা দেবার প্রথা আনুমানিক অষ্টম শতক থেকে গড়ে উঠলেও দার্শনিক মতটির পরিচয় ও প্রচলন ঢের পুরোনো। আগেকার কালে অন্য নামে প্রসিদ্ধি ছিলো। প্রসিদ্ধিটি কেন পালটালো, তাও নিশ্চয়ই ভাববার কথা।

দুই : প্রায় অষ্টম শতক থেকে চার্বাক বলতে যাঁরা প্রখর বস্তুবাদ বুঝতে অভ্যস্ত, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা সত্যিই দিক্‌পাল-বিশেষ। তাই আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে তাঁদের মন্তব্য উড়িয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা না-হোক অন্তত অতি-বড়ো দুঃসাহসের পরিচায়ক হবে।

কথাটা বিশেষ করে বলে রাখার একটা কারণ আছে। সম্প্রতিকালে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদকেরা অবশ্যই স্বীকার করেছেন, গ্রন্থটিতে চার্বাক নামে প্রসিদ্ধ বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থন নেই। তবুও নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে তাঁরা অনুমান করতে চেয়েছেন যে গ্রন্থটির লেখক হয়তো চার্বাকদেরই কোনো-এক অধুনা-অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত উপসম্প্রদায়ের প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তী বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই দেখাতে চেয়েছেন, এ-হেন উপসম্প্রদায়ের কথা বস্তুতপক্ষে কাল্পনিক, পক্ষান্তরে গ্রন্থকারের প্রকৃত প্রবণতা চরম ভাববাদের বা অন্তত সংশয়বাদের প্রতিই। তবুও এ. এল ব্যাশম (A. L. Basham) উক্ত সম্পাদকদের প্রকৃত বক্তব্যটুকু সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে—এবং মনে হয় বইটি না-পড়েই—সরাসরি ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে বস্তু-বাদের সমর্থনে রচিত অধুনালভ্য একমাত্র গ্রন্থ বলতে এই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'। এ-হেন কথা ঘোষণা করতে গেলে কমলশীল, জয়ন্তভট্ট, গুণরত্ন, মাধবাচার্য প্রভৃতি অনেকের মন্তব্যই অগ্রাহ্য করতে হয়। কেননা এঁরা সকলেই চার্বাক বলতে চরম বস্তুবাদ বুঝেছিলেন, অথচ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র শুরুতেই বস্তুবাদের অসারতা উল্লিখিত। অথচ, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এঁদের স্থান এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এঁরা সকলে একবাক্যে যে-কথা বলেছেন তা বাতিল করলে ভারতীয় দর্শনের আলোচনাই অচল হবার আশঙ্কা।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আলোচনা পরে স্বতন্ত্রভাবে করাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থটি সহজপাঠ্য নয়। গ্রন্থকারের প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এখানে অন্যান্য যে-দার্শনিকদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের কিছুটা পরিচয় প্রাসঙ্গিক হবে।

কমলশীল ছিলেন বৌদ্ধ দার্শনিক। তাঁর গুরুর নাম শান্তরক্ষিত। অনেকের মতে শান্তরক্ষিতের জন্ম সেকালের বৃহৎবঙ্গে। আনুমানিক অষ্টম শতকে শান্ত-রক্ষিতকে অনুসরণ করে কমলশীলও তিব্বতে যান এবং তিব্বতেই উভয়ের মৃত্যু

হয়। স্বীয় দার্শনিক মতের সমর্থনে শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় প্রথা অনুসারে পরমত খণ্ডন না-করে স্বীয় মত স্থাপিত হয় না। অতএব শান্তরক্ষিত সেকালে প্রচলিত বিবিধ দার্শনিক মত খণ্ডন করেন। শান্তরক্ষিতের গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কমলশীল একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন ; এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কমলশীলের 'পঞ্জিকা' নামে খ্যাত। ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' এবং কমলশীলের 'পঞ্জিকা' আধুনিক বিদ্বান্‌দের পক্ষে অপরিহার্য : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ ভারতে যে-সব দার্শনিক মতের প্রসিদ্ধি ছিলো সেগুলি সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যের জন্যে আমরা অনেকাংশেই এই দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

প্রসিদ্ধ মতগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই চরম বস্তুবাদ। এবং কমলশীলের 'পঞ্জিকা'য় এই বস্তুবাদ সুস্পষ্টভাবেই চার্বাক নামে উল্লিখিত। শুধু তাই নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি চার্বাকমতের প্রবক্তা হিসাবে পুরন্দর নামে জনৈক দার্শনিকের কথাও উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থান্তরেও পুরন্দর 'চার্বাক-মতে গ্রন্থকর্তা' হিসেবে উল্লিখিত। পুরন্দর নামে এই দার্শনিকটি কমলশীলের কিছুটা পূর্ববর্তী বলেই সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তাঁর কালনির্ণয় করতে চেয়েছেন।

কমলশীলের কথা থেকে শুরু করেছি, কেননা তাঁর আগেকার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোনো দার্শনিকের রচনায় প্রখর বস্তুবাদ অর্থে চার্বাক শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ চোখে পড়ে না। এমনকি তাঁর গুরু শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ'-তেও নয়। কিন্তু কেন ? প্রশ্নটা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। উত্তরের সন্ধান করার আগে অন্যান্য যে-কজন দার্শনিকের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের পরিচয় সংক্ষেপে দেখা যাক।

জয়ন্তভট্ট ছিলেন ন্যায় (বা ন্যায়-বৈশেষিক) সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত প্রতিনিধি। খ্রীষ্টীয় নবম শতক নাগাদ, কাশ্মীরের কোনো এক কারাগারে বসে তিনি রচনা করেন 'ন্যায়মঞ্জরী'। জয়ন্তর কেন কয়েদ হয়েছিলো তা সুনিশ্চিতভাবে জানা নেই। কিংবদন্তী আছে, যুদ্ধের খরচ জোটাবার জন্যে কাশ্মীররাজ মন্দিরের বিগ্রহ গলিয়ে সোনারূপো সংগ্রহের প্রস্তাব করলে জয়ন্ত বাধা দেন ; তাই কয়েদ হয়। এজাতীয় কিংবদন্তীর মূলে যাই থাকুক না কেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জয়ন্তর পাণ্ডিত্য যেমন প্রগাঢ়, যুক্তি ও বিচার যেমন প্রখর তেমনি আশ্চর্য তাঁর লেখার কায়দা বা রচনা-কৌশল। এই রচনা-কৌশলের বন্যায় তিনি যেন

বিপক্ষমতকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যান। বিপক্ষমত বলতে চরম বস্তুবাদও এবং জয়ন্ত তার জন্যে সুস্পষ্টভাবেই চার্বাক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং তার সঙ্গে রকমারি বিশেষণ যোগ করে মতটি নিয়ে হাসি-তামাসাও করেছেন। কোথাও তিনি চার্বাক-কে 'বরাক' বলে উল্লেখ করেছেন। বরাক মানে চলতি কথায় আমরা যাকে বলি হাবাতে বা হাবাগোবা। কোথাও আবার চার্বাক-কে 'ধূর্ত' বলে বর্ণনা করেছেন ; চলতি কথায় আমরা যেমন তুখোড় প্রতারকদের কথা বলে থাকি। কোথাও আবার ঠাট্টা করে বিপক্ষ দার্শনিকের বর্ণনায় 'সুশিক্ষিততর' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন এবং অনেকেই ধরে নেন যে এখানে বিপক্ষ বলতে চার্বাকই।

শুধু চার্বাকদের প্রসঙ্গেই নয় ; অন্যান্য বিপক্ষমতের প্রতিনিধিদের বেলাতেও জয়ন্তর রচনায় এজাতীয় নানা বিদ্রূপ, নানা বিশেষণ। অন্যান্যদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু চার্বাক প্রসঙ্গে তাঁর এজাতীয় বিবিধ বিদ্রূপাত্মক বিশেষণে বিভ্রান্ত হয়ে আধুনিক বিদ্বান্‌দের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র জয়ন্তভট্টর রচনার নজির থেকেই অনুমান করতে চেয়েছেন, ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকদের মধ্যেও দুরকম সম্প্রদায় ছিলো। একটির নাম ধূর্ত চার্বাক, অপরটির নাম সুশিক্ষিত চার্বাক।

এজাতীয় মত আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করেছে বলেই পরে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে হবে। আপাতত মন্তব্য শুধু এই যে জয়ন্তভট্ট চার্বাক প্রসঙ্গে এক জায়গায় 'ধূর্ত' এবং আর এক জায়গায় 'সুশিক্ষিততরাঃ' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন বলেই যদি দুটি স্বতন্ত্র চার্বাক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়, তাহলে 'বরাক' চার্বাক নামের অপর একটি বা তৃতীয় সম্প্রদায়ের কল্পনায় বাধা কী ? কেননা, একই গ্রন্থে একই লেখক বলেছেন, 'চার্বাকাস্তু বরাকাঃ'। যাই হোক, জয়ন্ত ঠাট্টা করে চার্বাকদের প্রসঙ্গে বরাক বা ধূর্ত বা সুশিক্ষিততর প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করলেও এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর লেখায় চার্বাক শব্দ চরম বস্তুবাদেরই নিদর্শক।

গুণরত্নর রচনাতেও তাই-ই। গুণরত্ন ছিলেন আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত জৈন দার্শনিক। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইএর নাম 'তর্করহস্য-দীপিকা'। আসলে এটি একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে হরিভদ্র 'ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়' বলে একটি বই লেখেন ; তারই ব্যাখ্যায় গুণরত্ন রচনা করেন

'তর্করহস্যদীপিকা'। হরিভদ্রর গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, সেকালের ছটি প্রখ্যাত দার্শনিক মতের বিচারমূলক পর্যালোচনাই তার বিষয়বস্তু। উদ্দেশ্য অবশ্য এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে জৈন দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। 'তর্করহস্য-দীপিকা'-তেও গুণরত্ন একই কথা আরো বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ অন্যান্য মত বিশদভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন জৈনদের দার্শনিক মতটিই সবচেয়ে সেরা। এই অন্যান্য মতের মধ্যে চরম বস্তুবাদও। অর্থাৎ জৈন মতের সমর্থনে গুণরত্নও চরম বস্তুবাদের বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এবং তাঁর রচনায় এই বস্তুবাদ চার্বাক নামেই অভিহিত।

বিভিন্ন দার্শনিক মতের পর্যালোচনা হিসেবে অবশ্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাধবাচার্যর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'। চতুর্দশ শতকে তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি ছাড়াও দর্শনে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, রাজনীতি ও দর্শন—উভয় বিষয়ে অমন প্রগাঢ় অনুরাগের সমন্বয় ইতিহাসে দুর্লভ। রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত হন। প্রচলিত মতে, আরো কয়েকটি মঠের মতো এই মঠটি স্বয়ং শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত বলেই সুবিদিত। শঙ্করাচার্য-সমর্থিত দার্শনিক মতটির নাম অদ্বৈত বেদান্ত। মাধবাচার্যও এই মতেরই প্রবল সমর্থক। অদ্বৈত বেদান্তই যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত—সেই কথাটি প্রতিপন্ন করার উৎসাহেই তিনি 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' রচনা করেন। পরিকল্পনাটা এই যে, সেকালে প্রচলিত আরো পনেরো রকম দার্শনিক মত বিচারমূলকভাবে খণ্ডন করে অদ্বৈত বেদান্তর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম যে-মতটি খণ্ডন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন তা প্রখর বস্তুবাদই। এবং মাধবাচার্য চার্বাক নামেই তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম তাই 'চার্বাক-দর্শন'।

তাহলে আনুমানিক অষ্টম শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীল থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতকের বৈদান্তিক মাধবাচার্য পর্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রসিদ্ধ দার্শনিক চার্বাক বলতে এক প্রখর বস্তুবাদী দর্শনই বুঝেছিলেন এবং স্বমত-সমর্থনে এই মতটি খণ্ডন করার তাগিদ বোধ করেছিলেন।

আসলে চার্বাক বলতে যে আমরা এক প্রখর বস্তুবাদী দর্শন বুঝতে বাধ্য—এই কথা পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যে এমনই প্রসিদ্ধ যে তা প্রায় সহজ-

বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এমন কি, দার্শনিক সাহিত্যের বাঁধ পেরিয়ে প্রথাটির প্রভাব নাট্যসাহিত্যেও উপচে পড়ে। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে একটি রূপক নাটক রচনা করেন। তার একটি চরিত্র বস্তুবাদ। চরিত্রটির নাম চার্বাক। প্রসঙ্গত, আনুমানিক একাদশ শতকেই রামানুজ 'ব্রহ্মসূত্র'-র ভাষ্য রচনা করেন। ভাষ্যে বস্তুবাদী দর্শন চার্বাক নামেই অভিহিত।

৪॥ চার্বাক ও লোকায়ত

কিন্তু প্রথাটি অমন প্রসিদ্ধ হলে তার সমর্থনে এতো রকম নজির দেখাবার আয়োজন কেন? কারণ আছে এবং কারণটা খতিয়ে দেখাও দরকার।

আসলে, ভারতীয় চিন্তা-ইতিহাসে বস্তুবাদী দর্শনটির পরিচয় খুবই প্রাচীন। এতো প্রাচীন যে দর্শনটির আদিপর্ব খুঁজতে গেলে বুদ্ধ-পূর্ব কোনো যুগ পর্যন্ত—হয়তো খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত—পিছু হটতে হয়। এই বস্তুবাদী দর্শনের চার্বাক নামকরণটা কিন্তু তুলনায় অর্বাচীন—আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকে নামটি খুব চালু হয়েছিলো। তারই কিছু নিদর্শন হিসেবে কমলশীল থেকে মাধবাচার্য পর্যন্ত কয়েকজন প্রখ্যাত দার্শনিকের কথা উল্লেখ করেছি।

তার মানে এই নয় যে দর্শনটির ইতিহাসও এঁদের সময়সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। আসলে এঁদের আগেও দর্শনটি নিয়ে বিপক্ষের যথেষ্ট মাথাব্যথা ছিলো। কিন্তু তাঁরা নামান্তরে এটির উল্লেখ করতেন। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম লোকায়ত। এবার তারই কিছুটা পরিচয় দেখা যাক।

বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের কথা থেকে শুরু করেছি। তাঁর 'পঞ্জিকা' কোন মূলগ্রন্থ নয়—ব্যাখ্যাগ্রন্থ। শান্তরক্ষিত-রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ'-র ব্যাখ্যা। স্বমত-সমর্থনে শান্তরক্ষিতের পক্ষেও চরম বস্তুবাদ খণ্ডনের প্রয়োজন ছিলো এবং তিনি তার আয়োজনও করেছিলেন। 'তত্ত্বসংগ্রহ'-র পাঠকেরা জানেন, সে আয়োজন যথেষ্ট বিস্তৃত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আছে। তাঁর রচনায় বস্তুবাদী দর্শনটির নাম 'চার্বাক' নয়; তার বদলে শান্তরক্ষিত ব্যবহার করেছেন 'লোকায়ত' শব্দ।

মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর কথা উল্লেখ করেছি। চরম বস্তুবাদী মতটির জন্য তিনি একাধিকবার চার্বাক শব্দই ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' অবশ্যই

প্রচলিত অর্থে ভাষ্যগ্রন্থ নয়। কিন্তু স্বীয় মতের আকর-গ্রন্থ হিসেবে তিনি প্রায়ই 'ন্যায়সূত্র' এবং তারই ব্যাখ্যায় রচিত বাৎস্যায়নের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন। 'ন্যায়সূত্র' এবং 'বাৎস্যায়ন-ভাষ্য'-তেও চরম বস্তুবাদ খণ্ডনের নানা যুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু 'চার্বাক' শব্দ চোখে পড়ে না। অবশ্য 'লোকায়ত' নামও নয়। তার বদলে মতটির সারাংশ হিসাবে প্রধানতই 'ভূতচৈতন্যবাদ' শব্দই ব্যবহৃত— অর্থাৎ যে-মতে ভূত পদার্থ বা ম্যাটার (*matter*) থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। ন্যায়দর্শনের আকর-গ্রন্থে 'লোকায়ত' শব্দের অভাব অবশ্য কিছুটা আশ্চর্য মনে হয়, কেনন 'ন্যায়সূত্র' রচনার অনেককাল আগে থাকতেই ভারতীয় দার্শনিক রচনায় 'লোকায়ত' শব্দর বহুল প্রচলন অবিসংবাদিত।

কিন্তু আপাতত আমাদের আলোচনা চার্বাক শব্দ নিয়ে। এবং দ্রষ্টব্য এই যে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর কাছে চরম বস্তুবাদী দর্শনটির নাম হিসেবে চার্বাক শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হলেও ন্যায়-দর্শনের আকর-গ্রন্থে নামটি একান্তই অবিদিত।

জৈন দার্শনিক গুণরত্নর কথা বলেছি। ভারতীয় দর্শনের ছাত্রদের কাছে তাঁর 'তর্করহস্যদীপিকা'র গুরুত্ব সুবিদিত। এবং গুণরত্নর কাছে আলোচ্য বস্তুবাদী দর্শনটি অবশ্যই চার্বাক নামেই সুবিদিত। কিন্তু তাঁর 'তর্করহস্যদীপিকা' একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র—হরিভদ্র রচিত 'ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়'-এর ব্যাখ্যা। হরিভদ্রও স্বীয় গ্রন্থে বস্তুবাদী দর্শনটি খণ্ডন করার সাধ্যমত প্রয়াস করেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে মতটির নাম চার্বাক নয়; 'লোকায়ত'। অর্থাৎ, হরিভদ্রর লোকায়ত-খণ্ডনই ভাষ্যকার গুণরত্নর রচনায় চার্বাক-খণ্ডন নামে পুনরুল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত।

পরিশেষে মাধবাচার্যর কথা উল্লেখ করেছি। শঙ্করাচার্যর পরম অনুগামী এই দার্শনিকটি গ্রন্থারম্ভেই চার্বাকদর্শন নাম দিয়েই চরম বস্তুবাদ বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। শঙ্করাচার্যর স্বীয় গ্রন্থে একই বস্তুবাদ খণ্ডনের চেষ্টা চোখে পড়ে। কিন্তু চার্বাক নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোনো প্রমাণ নেই; অন্তত তাঁর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ 'বেদান্তভাষ্য'র কোথাও চার্বাক শব্দ চোখে পড়ে না। বস্তুবাদী মতটিকে শঙ্করাচার্য একাধিকবার 'লোকায়ত' নামেই উল্লেখ করেছেন।

৫ ॥ বস্তুবাদী দর্শন ও ইতর জনগণ

তাহলে, এই চরম বস্তুবাদী দর্শনটির নামকরণ নিয়ে একরকম প্রথা-পরিবর্তন চোখে পড়ে। এককালে নাম ছিলো লোকায়ত—মনে হয়, সুদীর্ঘকাল ধরে

এই নামেই দর্শনটির প্রধান পরিচয় ছিলো। কিন্তু আনুমানিক অষ্টম বা নবম শতক থেকে নাম হলো চার্বাক এবং তার পর ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে এই চার্বাক নামই প্রায় স্থায়ী হয়ে গেলো।

এইভাবে নাম বদলের পিছনে অবশ্যই কোন পর্যাপ্ত কারণ থাকবার কথা। ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কারণ সম্বন্ধে হয়তো কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবুও তা খোঁজ করা দরকার। কিন্তু সে আলোচনা তোলবার আগে আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। নাম বদলের ব্যাপারটা সত্যিই কি স্বীকার্য? 'চার্বাক' ও 'লোকায়ত' সত্যিই কি একই দার্শনিক মতের পরিচায়ক?

এই ব্যাপারে যাতে কোনো অনিশ্চয়তার অবকাশ না থাকে সে-বিষয়ে অন্তত মাধবাচার্য সজাগ ছিলেন। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি আমাদের মনে রাখতে বলেছেন, ওই চার্বাকদর্শনেরই অপর এক এবং বেশ জুৎসই নাম হলো লোকায়ত: 'তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তম্ ইতি অন্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম্'।

এখানে 'অন্বর্থম্' কথাটার বাংলা করেছি জুৎসই। কেননা মাধবাচার্যর মন্তব্য এই যে লোকায়ত শব্দটিকে ভেঙে দেখলে বোঝা যাবে চার্বাক মতের এই রকম নামান্তর হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু জুৎসই কেন?

আসলে, চার্বাক মতেরই নামান্তর যে লোকায়ত—এই কথাটি মনে করিয়ে দেবার সময় মাধবাচার্য মতটির বিরুদ্ধে বেশ কিছুটা খোঁচা দেবার বা মতটিকে পাঠকদের কাছে খেলো প্রতিপন্ন করবার একটা কায়দাও করে নিয়েছেন। খোঁচাটা ঠিক কী রকম তার কিছুটা ব্যাখ্যা দরকার।

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে একরকম দার্শনিক ছড়া চালু ছিলো। কার রচনা তা জানা নেই। বিদগ্ধ কোনো গ্রন্থের অংশও নয়। তবুও দীর্ঘদিন ধরে লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। তাই একে বলে লোকগাথা। লোকগাথার পিছনে দীর্ঘকালের রেশ থাকলে অনেক সময় বলা হয় প্রামাণিক লোকগাথা।

চার্বাকদের নামে চালু বেশ কিছু প্রামাণিক লোকগাথার প্রসিদ্ধি আছে। এ-হেন একটি লোকগাথা হলো,

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

অর্থাৎ, সোজা কথায়, যতোদিন বেঁচে আছো ততোদিন সুখভোগ করে নাও। মরণ থেকে কারুরই রেহাই নেই। লাশটা পোড়াবার পর আবার ফেরবার কায়দা কী হতে পারে ?

মাধবাচার্য এই লোকগাথাটি উদ্ধৃত করেছেন। এবং মন্তব্য করেছেন, ইতর জনগণের কাছে এই তো হলো মনের মতো কথা। ফলে পুরুষার্থ বলতে তাদের কাছে শুধু অর্থ আর কাম। স্বভাবতই তারা পরকাল-পরলোক সব কিছু অগ্রাহ্য করে চার্বাকমতই অনুসরণ করে। এই কারণেই চার্বাকমতের আর এক 'জুৎসই' নাম হলো লোকায়ত—অর্থাৎ ইতর জনসাধারণের মত, সাধারণ লোকের মত, যে মতে সাধারণ লোকের স্বাভাবিক রুচি।

মন্তব্যটা অবশ্যই একরকম গালি-গালাজ। তবুও এর থেকে কয়েকটা কথা অনুমান না-করে উপায় নেই।

এক : চার্বাক এবং লোকায়ত—একই দার্শনিক মতের বিকল্প নামমাত্র। সোজা কথায়, চার্বাক-ও যা, লোকায়তও তাই।

দুই : দর্শনটি ঐকান্তিক অর্থেই ইহলোক-সর্বস্ব। এই মতে পরকাল-পরলোক প্রভৃতির কোনো স্থান নেই। মাধবাচার্য—এবং অন্যান্য দার্শনিকেরাও—ব্যাখ্যা করে বলেছেন, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত দিয়ে গড়া এই পৃথিবীই একমাত্র সত্য। সোজা কথায়, চরম বস্তুবাদী দর্শন।

তিন : জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এর জুৎসই নাম লোকায়ত।

এইখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। চার্বাক-এরই নামান্তর যে লোকায়ত একথা শুধু মাধবাচার্যই মনে করিয়ে দেন নি। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের জৈন দার্শনিক গুণরত্নও বলেছেন, "তৎ-নামানি চার্বাক লোকায়ত ইতি-আদীনি"—তার নাম চার্বাক, লোকায়ত ইত্যাদি। এবং মাধবাচার্যর মতোই লোকায়ত নামের ব্যাখ্যায় গুণরত্নও বেশ কিছুটা ঠেস দিয়ে বলেছেন, "লোকা নির্বিচারাঃ সামান্যা লোকাঃ তৎবদ্ আচরন্তি স্ম ইতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইতি অপি।"—অর্থাৎ, সহজ কথায়, বিচার-বিহীন সাধারণ মানুষ এই মত অনুসারে আচরণ করে বলেই লোকায়ত বা লোকায়তিক শব্দের ব্যবহার।

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে দর্শনটির বিরুদ্ধে গালি-গালাজের অবশ্যই অন্ত নেই। তাই মাধবাচার্য এবং গুণরত্নর লেখায় চার্বাকমতের বিরুদ্ধে ওই খোঁচা দেবার আয়োজনটুকু তাঁদের বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু উপরের কথাগুলি

থেকে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের এক চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতি অনুমান করা যায়।

আমাদের দেশে বস্তুবাদী দর্শন এবং জনসাধারণের দর্শন বোঝার বা বোঝাবার জন্যে দুটি স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়নি। দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে একই শব্দ। লোকায়ত। লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শন। লোকায়ত মানে জনগণের দর্শনও।

'লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ'। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই নাম লোকায়ত। ব্যাখ্যা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, 'লোকায়ত মত লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ওই নাম পাইয়াছে।' সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো : 'জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়'। এই প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'-এর নজির দেখিয়েছেন ; গ্রন্থটিতে লোকায়ত শব্দ এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত।

দেশের আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে অবশ্যই দর্শনটিকে ভালো চোখে দেখবার কথা নয়। এ-হেন দর্শনের প্রতি সহজাতভাবে আকৃষ্ট জনসাধারণকেও নয়। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'ইতর জনগণ বা প্রাকৃতজন এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকেই আত্মা বলে মনে করে'। অর্থাৎ, তাঁদের মতে দেহ ছাড়া (বা দেহাতিরিক্ত) আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু মানবার দরকার নেই এবং আত্মায় আস্থাবানেরা যেহেতু চৈতন্য নামের লক্ষণটিকে দেহাতিরিক্ত আত্মার অমোঘ প্রমাণ বলে ঘোষণা করে থাকেন, সেইহেতু লোকায়তিকেরা বলেন এই চৈতন্য আসলে দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম—দেহধর্ম।

এই নিয়ে অবশ্য ভারতীয় দর্শনে বিস্তর তর্ক আছে। মতটির বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের যেন অবধি নেই। কিন্তু অজস্র নজির দেখিয়েও লোকায়তিকদের এই সহজ দাবিটি সত্যিই খণ্ডন করা সম্ভব হয়েছে কিনা, তা নিয়ে আমাদের পক্ষে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে। আপাতত অন্য একটি বিষয় দেখা যাক।

শঙ্করাচার্যর মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়, লোকায়ত বলতে শুধু ইতর জনগণের দর্শনই নয়। বস্তুবাদী দর্শনও। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্কটা প্রধানতই আত্মা নিয়ে। দেহাতিরিক্ত আত্মা অস্বীকার করাটাই চরম বস্তুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুবাদীরা অবশ্য পরলোক-

পরকালও অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার প্রধান যুক্তি এই যে পরলোকগামী আত্মা বলেই যদি কিছু না-থাকে তাহলে পরলোকের কল্পনাও অবান্তর। এই অর্থেই বস্তুবাদ ইহলোক-সর্বস্ব দর্শন।

শঙ্করাচার্যর মন্তব্য অনুসারে আত্মার বর্জন থেকেই বোঝা যায় লোকায়ত শুধু জনসাধারণের দর্শন নয়, বস্তুবাদী দর্শনও। অন্যেরাও বারবার বলেছেন, লোকায়ত মানে চরম বস্তুবাদ। এই কারণে 'সেণ্ট-পিটার্সবার্গ অভিধানে' লোকায়ত-র সরাসরি অর্থ দেওয়া হয়েছে মেটিরিয়ালিজম বা বস্তুবাদ। মনিয়ার-উইলিয়ামস্-এর অভিধানে পুংলিঙ্গে শব্দটির অর্থ বস্তুবাদী দার্শনিক, ক্লীবলিঙ্গে নিরীশ্বর বস্তুবাদী দর্শন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ন, রাধাকৃষ্ণণ, প্রমুখের রচনাতেও লোকায়ত মানে ইহলোক-সর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন। এই অর্থগ্রহণের পক্ষে তুচ্চি (Tucci) প্রাচীন রচনার নজিরও দেখাতে চেয়েছেন। প্রাচীন পালি-সাহিত্যের টীকাকার বুদ্ধঘোষ 'আয়ত' শব্দকে 'আয়তন' বা ভিত্তি অর্থে গ্রহণ করেছেন ; অতএব যে দর্শনের ভিত্তি বলতে লোক বা ইহলোক, তারই নাম লোকায়ত। জৈন দার্শনিকদের মধ্যে কথাটা আরো সরাসরি বলার আয়োজন চোখে পড়ে। 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়'-এ হরিভদ্র বলছেন, 'এতাবানেব লোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'—যতোটুকু নিছক ইন্দ্রিয়-গোচর সেটুকুকেই বলে 'লোক'। ভাষ্যকার মণিভদ্র ব্যাখ্যা করেছেন, লোক অর্থে পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে পদার্থ হিসাবে কোনো রকম অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক কিছুর স্থান নেই।

তাহলে দুটি কথা মানতে হবে। এক : লোকায়ত মানে সাধারণ লোকের সহজাত বা স্বাভাবিক মত-প্রবণতা বা দর্শন। দুই : লোকায়ত মানে ইহলোক-সর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন।

আধুনিক অগ্রণী বিদ্বান্‌দের রচনায় উভয় অর্থই স্বীকৃত। কিন্তু দুই অর্থের সমন্বয়ের প্রয়াস তুলনায় বিরল। বোধহয় রুচিকরও নয়। অন্তত বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তো নয়ই। আজকের দিনে জনগণকে নিছক 'ইতরজন' বা ছোটলোক বলে অবজ্ঞা করার সুযোগ ক্রমশই সীমিত হয়ে আসছে। এবং বস্তুবাদী দর্শনেই তাদের আস্থা দিনের পর দিন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি তাদের এই আকর্ষণের কারণটাও অনেকের কাছেই অপ্রীতিকর। শুধু তাত্ত্বিক কৌতূহল নিবৃত্তির ব্যাপার নয়, সংগ্রামের অস্ত্রও। মতাদর্শগত সংগ্রাম। মান্ধাতার আমল থেকে নানারূপে

সজ্জিত এবং নানা কৌশলে প্রচারিত ভাববাদী দর্শনের ঘোর কাটিয়ে ওঠবার আজ সচেতন আয়োজন। কেননা, আজকের জাগ্রত জনগণের কাছে ওই ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী দর্শনটিও শুধুমাত্র নির্মল তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিণাম নয়। যুগযুগান্তর ধরে এই দর্শনও মতাদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তা বিপক্ষের হাতে। জনগণের উপর যারা শুধু দাসত্বের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছে তাদের হাতে। সোজা কথায়, অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পিছনে লোকবঞ্চনার এক আয়োজনও থেকেছে।

৬ ॥ লোক ঠকানোর প্রতিরোধে

কথাগুলো বড়ো বেশি আধুনিক ও উগ্র বক্তৃতার মতো শোনালো? প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে এসব বক্তৃতা কেন?

কারণ আছে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মহলেও এ জাতীয় কথা উঠেছিলো। অবশ্যই আধুনিক অর্থে নয়, আধুনিক পরিভাষাতেও নয়। তবু উঠেছিলো। একথা অনুমান করার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে।

একটু আগেই দেখেছি, জৈন দার্শনিক হরিভদ্র বলেছেন, যেটুকু নিছক ইন্দ্রিয়গোচর শুধু সেইটুকুই হলো 'লোক' এবং এই 'লোক'ই যাদের কাছে একমাত্র সত্য তারাই লোকায়তিক। সোজা কথায় লোকায়ত মতে প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থই একমাত্র সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থকে সত্য বলে স্বীকার করার কারণ কী? ভাষ্যকার মণিভদ্র এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। 'এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণাঃ যৎকিংচিৎ অনুমানাদিদার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থং মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য ভোগাভোগ-প্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি।' অর্থাৎ, লোকায়তিকদের মতে প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ধর্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষেধক, কেননা অনুমান, আগম (শাস্ত্র) প্রভৃতির নজির দেখিয়ে পরবঞ্চন-প্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্ধ মোহের সঞ্চার করে, এই কারণেই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ স্বীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়।

মণিভদ্রর এই ব্যাখ্যা যদি স্বীকার্য হয় তাহলে মানতে হবে সেকালের

লোকায়তিকেরাও দার্শনিক মতকে একেবারে নির্ভেজাল তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিচায়ক বলে মেনে নেননি। দার্শনিক মতের সঙ্গে রাজনীতির এরকম যোগাযোগ তাঁদের চেতনারও অগোচর ছিলো না। মণিভদ্রর এই মন্তব্য কি আজকের দিনের বস্তুবাদীর রচনাতেও স্থান পেতে পারতো ?

মণিভদ্রর মন্তব্যকে মনগড়া মনে করারও কারণ নেই। চার্বাক বা লোকায়তিকদের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ লোক-গাথা আছে। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে মাধবাচার্য বেশ কয়েকটি এজাতীয় লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলির মূল কথাও মোটের উপর একই। কিছু ধূর্ত মানুষ লোক-ঠকিয়ে উপার্জন করবার উদ্দেশ্যে রকমারি ধর্মকর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান দিয়ে থাকেন এবং এসব যে নেহাতই লোক-ঠকানে ব্যাপার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ থেকেই তা সহজে বোঝা যায়। লোকগাথাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং আধুনিক বস্তুবাদীর রচনাতেও অনায়াসেই এগুলির স্থান হতে পারে। অতএব এখানেও সেগুলির পুনরুদ্ধৃতি অবান্তর হবে না।

> ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
> বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥
> পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
> স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
> মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
> নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েৎ শিখাম্।
> গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
> গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা॥
> স্বর্গাস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
> প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
> যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
> যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
> কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥

ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতাকার্য্যাণি ন ত্বন্যৎ বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর-সমীরিতম্॥

অর্থাৎ—

'স্বর্গ বলে কিছু নেই। অপবর্গ বা মুক্তি বলেও কিছু নেই। পরলোকগামী আত্মা বলেও কিছু নেই। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল॥

'যাদের না-আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ তাদের জীবিকা হিসাবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা॥

'জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না? (অর্থাৎ, স্বর্গে যাবার অমন সোজা সড়ক থাকতেও যজমান কেন নিজের পিতাকে তা থেকে বঞ্চিত করে?)॥

'কেউ মারা যাবার পর শ্রাদ্ধকর্ম যদি তার তৃপ্তির কারণ হয়, তাহলে তো প্রদীপ নিভে যাবার পরেও তেল ঢেলে তার শিখা প্রদীপ্ত করা যেতো॥

'যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে তার পাথেয় (পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কেননা তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তর গমন করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয়-ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো। (অর্থাৎ গ্রামান্তরগামীর পক্ষে তো তাহলে পাথেয় হিসেবে চাল-চিঁড়ে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতো না।)॥

'যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে দান নেহাতই বৃথা, কেননা তাহলে যিনি প্রাসাদের উপর উঠে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে (মাটিতে বসে) দান করলেও তো তাঁর তৃপ্তি হবার কথা॥

'যতোদিন বেঁচে আছো সুখে বাঁচার চেষ্টা করো, ধার করেও ঘি খাবার ব্যবস্থা করো। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?॥

'জীব যদি এই দেহ ছেড়ে পরলোকে যায়, তাহলে বন্ধুবান্ধবদের টানে সে আবার ফিরে আসে না কেন?॥

'ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসেবেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে (শ্রাদ্ধাদি) প্রেতকার্য বিহিত হয়েছে। তাছাড়া এসবের আর কোনো উপযোগিতা নেই ॥

'যাঁরা তিন বেদ রচনা করেছেন তাঁরা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর (নিশাচর)। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্যমাত্র ॥

'আর তাঁরাই বিধান দিয়েছেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করবে ॥

'তেমনি চোরেরাই (নিশাচর) মাংস খাবার মৎলবে (যজ্ঞে পশুবলির) বিধান দিয়েছেন।'

বাংলা তর্জমায় মূল লোকগাথাগুলির তীক্ষ্ণ শ্লেষ বজায় রাখা কঠিন। কিন্তু কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির কথা লোকায়তিকদের বিচারে শোষণের রকমারি ছল। অতএব এজাতীয় দার্শনিক মতাদির সঙ্গে শ্রেণীশোষণ-পরায়ণ রাজনীতিরও যে একটা সম্পর্ক আছে একথা লোকায়তিকেরাও বলতেন, যদিও কথাটা তাঁরা নিজেদের মতো করেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের বিচারে সে-রাজনীতির প্রতিষেধক বস্তুবাদী দর্শন এবং এই বস্তুবাদের প্রধান ভিত্তি প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা—শুধুমাত্র প্রত্যক্ষগোচর জগৎকেই সত্য বলে মানা।

অবশ্য লোকায়তিকদের এই প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা নিয়ে বিপক্ষের দার্শনিকেরা নানা রকম মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যগুলির মধ্যে প্রায়ই লোকায়তিকের প্রকৃত বক্তব্য বিকৃত করার আয়োজন ছিলো—এমন সন্দেহের কারণও আছে।

৭ ॥ চার্বাক নামকরণ প্রসঙ্গে

কিন্তু যে-কথা থেকে শুরু করেছিলাম, তাতেই ফেরা যাক। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে বস্তুবাদী দর্শনটির নজির যতোই প্রাচীন হোক-না-কেন, তার চার্বাক নামকরণ তুলনায় অর্বাচীন। অষ্টম-নবম শতকের আগে দার্শনিক সাহিত্যে এই নামের অন্তত কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। প্রাচীনেরা মতটিকে প্রধানত লোকায়ত নামেই উল্লেখ করতেন।

নামকরণের ব্যাপারে এই রকম প্রসিদ্ধি-পরিবর্তনের কারণ কী?

তুলনায় অখ্যাত জনৈক বিদেশী বিদ্বান্ (Schermerhorn) অনুমান করেছেন, কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতীক চরিত্রের

নাম চার্বাক। নাটকটির জনপ্রিয়তা থেকেই চার্বাক নামের প্রসিদ্ধি। কিন্তু এই অনুমান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কৃষ্ণমিশ্রর ঢের আগে—যেমন, কমলশীলের 'পঞ্জিকা'য় —চার্বাক নামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বরং অনুমান হয়, দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাক নাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হয়েছিলো বলেই নাট্যকারের পক্ষে অমন অনায়াসে বস্তুবাদকে চার্বাক আখ্যা দেবার সুযোগ ঘটেছিলো।

কিন্তু দার্শনিক সাহিত্যেই বা চার্বাক নাম এলো কোথা থেকে?

ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে কিছু তথ্য হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমত, প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাক নাম চোখে না-পড়লেও অন্যত্র তা চোখে পড়ে। মহাভারতের শান্তিপর্বে—রাজধর্মানুশাসন প্রসঙ্গে—চার্বাক নামে এক রাক্ষসের উপাখ্যান আছে। আধুনিক বিদ্বানদের বিচারে মহাভারতের এই অংশের আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতক। মহাভারতের রাক্ষস চার্বাক দুর্যোধন-সখা এবং প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যমতের তীব্র সমালোচক। তবে তাকে সরাসরি প্রখর বস্তুবাদী বলে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু তার তীব্র ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষ—এবং তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড আক্রোশ—দুইয়ের সঙ্গেই চার্বাকদের নামে প্রচলিত প্রামাণ্য লোকগাথাগুলির সঙ্গতি হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে উভয় বৈশিষ্ট্যই বিশেষত বস্তুবাদীদের পক্ষেই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে মহাভারতের রাক্ষসটিকে বস্তুবাদী দার্শনিক বলে ঘোষণা করার সুনিশ্চিত সাক্ষ্য না থাকলেও তাকে বস্তুবাদী বলে গ্রহণ না-করার পক্ষেও অকাট্য প্রমাণ নেই। এই রাক্ষসের নাম থেকে বস্তুবাদের নামকরণ অসম্ভব নয়। তার একটা সুবিধাও অনুমান করা যায়। বস্তুবাদী দর্শনটিকে বিচারমূলক ভাবে খণ্ডন-বর্জনের বদলে সরাসরি এক রাক্ষুসে দর্শন হিসাবে তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। সোজা কথায়, বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা কিছুটা সহজ হয়।

কিন্তু এই সম্ভাবনা স্বীকার করলেও অন্য প্রশ্ন থেকে যায়। নামকরণের ব্যাপারে প্রথা-পরিবর্তনের কোনো পর্যাপ্ত কারণ থাকা উচিত। সেই কারণ কী হতে পারে? কিংবা, যা একই কথা, লোকায়তর বদলে চার্বাক নামে দর্শনটি উল্লেখ করবার কি কোনো সুবিধা অনুমেয়?

শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকেরা লোকায়ত নাম ব্যবহার করার সময় বস্তুবাদী দর্শনটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব অস্পষ্ট রাখেননি: ইতর সাধারণের বা লোকের

দর্শন, তাই নাম লোকায়ত। কিন্তু এই বিদ্বেষকে যথেষ্ট দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধাও ছিলো। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি দার্শনিকেরা যাই বলুন না কেন, প্রাচীনতর গ্রন্থে লোকায়ত শব্দ সর্বত্রই নিন্দাসূচক নয়। এমনকি রচনাবিশেষে নামটির সঙ্গে বেশ কিছুটা মর্যাদার সম্পর্কও চোখে পড়ে। অতএব নামটা পালটে চার্বাক করে নিলে একে একেবারে রাক্ষুসে মত বলেই প্রচার করার সুযোগ ঘটে। বিদ্বেষটা তুলনায় নিষ্কণ্টক হয়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিতর্কপর্ব আনুমানিক অষ্টম বা নবম শতকে প্রায় তুঙ্গে উঠেছিলো। এতএব এই সময় থেকে বস্তুবাদী দর্শনকে একেবারে নির্মূল করার উৎসাহও অসম্ভব নয়। নিছক রাক্ষুসে দর্শন আখ্যা দিতে পারলে কাজটা তুলনায় সহজ হয়, যুক্তিমূলক বিচার-বিশ্লেষণের দায়িত্ব হয়তো কিছুটা কমে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পালি-সাহিত্য বিশারদ রিস্ ডেভিড্স্ (Rhys Davids) অনুমান করেছেন; খুব সম্ভব মহাভারতের চার্বাক রাক্ষসের নাম থেকেই পরবর্তী কালে বস্তুবাদী দর্শনটির চার্বাক নামকরণ করা হয়েছিলো। অবশ্য রিস্ ডেভিড্স্ সেই সঙ্গে আরো দাবি করেছেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দর্শনটির কোনো বাস্তব স্থান নেই : মূলতই তা বিপক্ষবাদীদের—বিশেষত শঙ্করাচার্যের—কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু এই মত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বস্তুবাদী দর্শনটি ঐতিহাসিকভাবে অলীক হলে অতো কাল আগে থেকেই বিপক্ষ-সম্প্রদায়ের দিক্‌পাল দার্শনিকদের পক্ষে তা উচ্ছেদ বা খণ্ডন করবার প্রবল উৎসাহের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। কিন্তু রিস্ ডেভিড্স্-এর প্রথম মন্তব্যটি সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বস্তুবাদী দর্শনটির চার্বাক নামকরণের পক্ষে আর কোনো নজির সহজলভ্য নয়।

৮ ॥ মহাভারতের চার্বাক রাক্ষস

মহাভারতে চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এক রাক্ষসমাত্র। শুধু রাক্ষসই নয়। দুর্বৃত্ত দুর্যোধনের সখাও।

মহাভারতের দুর্যোধন-সখা অবশ্যই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরম শত্রু। অতএব রাজার 'চাটু-পটু' অর্থাৎ ওস্তাদ মোসায়েব কবির রচনায় নিম্নোক্ত উপাখ্যান :

'পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশকালে সহস্র সহস্র পুরবাসী-প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। ...ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ধর্মরাজকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্যোধনের

সখা দুরাত্মা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না-করিয়াই নির্ভীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্বিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, "মহারাজ, এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ জ্ঞাতিসংহার ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কী লাভ হইল? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।" ···তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া···কহিলেন·· "আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব। আপনারা আর আমাকে ধিক্কার করিবেন না।" তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্মরাজ, আমরা আপনাকে ধিক্কার করি নাই, আপনার মঙ্গল হউক।" তপোনুষ্ঠান-সম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা চার্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্মরাজকে কহিলেন, "মহারাজ, যে-ব্যক্তি আপনার প্রতি কটূক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্যোধনের পরম বন্ধু চার্বাক নামে রাক্ষস।" ···অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎ‍র্সনা করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া আপনি দগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগলেন।'

এমন এক দুরাত্মা পাপী রাক্ষসের নামের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনটিকে জুড়ে দিলে সাধারণ পাঠকের মনে দর্শনটির প্রতি আতঙ্ক ও বিদ্বেষ সহজেই সঞ্চারিত হবার কথা। এই কারণেই কি দর্শনটিকে চার্বাক নামে উল্লেখ করার প্রথা গড়ে উঠেছিলো?

মহাভারতের রাক্ষসটির নাম থেকে দর্শনটির নামকরণের পক্ষে অবশ্যই কোনো সুনিশ্চিত যুক্তি বা সাক্ষ্য জানা নেই। কেবল এটুকু জানা আছে যে চার্বাক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড় করাবার দুরকম প্রসিদ্ধ প্রয়াস ব্যাকরণের বিচারে টেঁকানো কঠিন: 'চারু বাক্' থেকে চার্বাক, কিংবা 'চর্ব' বা চর্বণ থেকে চার্বাক—উভয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ব্যাকরণের বাধা আছে। তবে রাক্ষসের নামকরণে ব্যাকরণ অনুগমনের প্রয়োজন কম।

৯ ॥ প্রাচীনতর সাহিত্যে লোকায়ত

কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত রাক্ষসটির নাম থেকে চার্বাক নাম নেওয়া হোক আর না-ই হোক, এ-বিষয়ে অনুমানের সুযোগ আছে যে বস্তুবাদী দর্শনটির পুরোনো নাম হিসাবে লোকায়ত শব্দ বজায় রাখার কিছুটা অসুবিধা ছিলো। দর্শনটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অবশ্যই নতুন নয়। কিন্তু প্রাচীনতর সাহিত্যে লোকায়ত শব্দটি এমন প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত যেখানে এই বিদ্বেষ ও ঘৃণার অবকাশ কম, এমন কি কখনো কিছুটা তারিফের ভাবও বর্তমান। এখানে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তই পর্যাপ্ত হবে।

মহাভারত থেকেই আবার শুরু করা যাক। রাজা দুষ্মন্ত কণ্বর আশ্রমে প্রবেশ করে বিবিধ বিদ্বান্‌কে বিবিধ দর্শনচর্চায় প্রবৃত্ত দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মহাভারত-বর্ণিত এই দার্শনিকদের তালিকায় লোকায়তিকদেরও উল্লেখ লক্ষণীয়:

'ন্যায়তত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞান সম্পন্ন বেদবিদ্‌গণ, নানা বাক্যের সমাহার-সমবায়ের বিশারদগণ, বিশেষ কার্যজ্ঞগণ, মোক্ষধর্মপরায়ণগণ, স্থাপন-আক্ষেপ-সিদ্ধান্ত ও পরমার্থজ্ঞগণ, শব্দ-ছন্দ-নিরুক্ত-জ্ঞান বিশিষ্টগণ, কালজ্ঞান-বিশারদগণ, দ্রব্য-কর্ম-গুণজ্ঞগণ, কার্যকারণবেত্তাগণ, পক্ষী ও বানরের ভাষায় অভিজ্ঞগণ, ব্যাসগ্রন্থ আশ্রয়কারিগণ—এই নানাশাস্ত্রের মুখ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ শুনেছিলেন; লোকায়তিক মুখ্যগণ কর্তৃক বাক্যও চারিদিকে উচ্চারিত হচ্ছিলো—তাও শুনেছিলেন।'

এখানে কয়েকটি শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে অল্পবিস্তর সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে। হয়তো এককালে প্রসিদ্ধ বিদ্যাবিশেষের চর্চা পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শীদের তালিকা থেকে লোকায়তিক মুখ্যগণ বাদ পড়েন নি। অর্থাৎ, মহাভারতের এই তালিকাটির দিক থেকে লোকায়তিকেরা ঘৃণার পাত্র নন।

অবশ্যই মহাভারত একজনের রচনা নয়। অধুনালভ্য মহাভারতের সংস্করণটি নানা কবির হাত ঘুরে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই মহাভারতের সর্বত্র হুবহু একই মতাদর্শের পরিচায়ক হবার কথা নয়। অতএব মহাভারত থেকেই বস্তুবাদ-বিদ্বেষের নজির দেখানোও কঠিন নয়। আবার উদ্ধৃত অংশে থেকে অন্তত লোকায়ত নামের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা বা ঘৃণার ইংগিত খোঁজা নিষ্ফল হবে।

১০ ॥ অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত

কিন্তু মহাভারতের কথা না-হয় আপাতত ছেড়েই দেওয়া যাক।

ভারতীয় দার্শনিক মতামতের শ্রেণী বিভাগ সংক্রান্ত সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্র'-এ। অধ্যাপক জ্যাকবি (Jacobi) বোধহয় প্রথম এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তী বিদ্বান্‌রা মোটের উপর তাঁর মতের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। 'অর্থশাস্ত্র'-র কালনির্ণয় নিয়ে অবশ্য অনেক বিতর্ক আছে, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গ্রন্থটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের রচনা হওয়া সম্ভব।

কৌটিল্যর মতে বিদ্যা বলতে চার রকম : আন্বীক্ষিকী (বা অনুমান-মূলক দর্শন) ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। 'ত্রয়ী' মানে তিন বেদ, 'বার্তা' মানে কৃষি-পশুপালন-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যা, 'দণ্ডনীতি' মানে রাজ্যশাসন বিদ্যা। 'আন্বীক্ষিকী' মানে অনুমান—এখানে অনুমান-মূলক দর্শন। কিন্তু সর্বপ্রথম আন্বীক্ষিকীর কথা কেন? কেননা, চার রকম বিদ্যার মধ্যে কৌটিল্যর মতে এই আন্বীক্ষিকীই শ্রেষ্ঠ—সব বিদ্যার পক্ষেই প্রদীপের মতো।

দ্বিতীয়ত, আন্বীক্ষিকী বলতে তিন, এবং শুধুমাত্র তিনই : সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত। অবশ্য 'যোগ' বলতে এখানে কৌটিল্য ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে আধুনিক বিদ্বান্‌রা নানা সমস্যার অবতারণা করেছেন। কিন্তু ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং কুপ্পু্স্বামী শাস্ত্রী সে-সব সমস্যার নিরসনও করেছেন। আসলে পরবর্তীকালে যে-দার্শনিক মতকে আমরা ন্যায়-বৈশেষিক নামে সনাক্ত করতে অভ্যস্ত, প্রাচীন কালে তাকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করার প্রথা ছিলো। এ-বিষয়ে ফণিভূষণ ও কুপ্পু্স্বামী উভয়েই মূল্যবান্ সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কৌটিল্যর রচনাতেও যোগ শব্দ এই প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত—যোগ বলতে এখানে পতঞ্জলির নামে প্রচারিত যোগ-দর্শন নয়। ফণিভূষণ ও কুপ্পুস্বামী যে-সাক্ষ্য ও যুক্তির সমর্থনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার কথা তুলতে গেলে বর্তমান আলোচনা অনেকটা বিক্ষিপ্ত হবার আশঙ্কা; পরে তার সুযোগ পাবো। বৃদ্ধসম্মতি হিসাবে উভয়ের উল্লেখই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত।

তাহলে কৌটিল্য শুধুমাত্র তিনটি দার্শনিক মতকে আন্বীক্ষিকীর বা অনুমান-ভিত্তিক প্রকৃত দর্শনের মর্যাদা দিয়েছেন : সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে যোগ এবং লোকায়ত।

কৌটিল্যর উক্তি নিয়ে মামুলি ধারণায় অভ্যস্তদের পক্ষে বিচলিত বোধ করার কারণ আছে। কৌটিল্যর মতে চতুর্বিদ্যার মধ্যে আন্বীক্ষিকীই শ্রেষ্ঠ, এবং আন্বীক্ষিকী বলতে শুধুমাত্র সাংখ্য, যোগ (বা ন্যায়-বৈশেষিক) এবং লোকায়ত। এই তালিকায় লোকায়তর স্থান অত্যাশ্চর্য বলে প্রতীত হবার কথা। লোকায়ত মতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বদলে এখানে মতটিকে সুস্পষ্টভাবেই মর্যাদা দেবার আয়োজন।

লোকায়ত নামের মতটির এককালে যে রীতিমতো মর্যাদা ছিলো প্রাচীন পালি সাহিত্য থেকেও তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রিস্ ডেভিড্‌স্ বিস্তর নজির দেখিয়েছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো পালি 'ত্রিপিটক'-এ বিদ্বান্ বা বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের যেন একরকম ছকে বাঁধা বর্ণনা পাওয়া যায়, সে-বর্ণনায় বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি শাস্ত্র লোকায়ত নামে উল্লিখিত। যেমন, 'দীঘনিকায়'-এর 'অম্বট্ঠসুত্ত'-তে অম্বট্ঠ নামে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, 'সোনদত্তসুত্ত'তে সোনদত্ত নামে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ, 'কুটদন্তসুত্ত'-তে কুটদন্ত নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনায় এবং বিজিতর উপাখ্যানে পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বহু বর্ণনায় লোকায়তে পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। ত্রিপিটকে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের ছকে-বাঁধা বর্ণনায় লোকায়তে পারদর্শিতার উল্লেখ থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে লোকায়ত শব্দটি তখনো নিন্দাসূচক নয়, বরং মর্যাদাসূচকই।

তাহলে মহাভারতের অংশবিশেষ, অর্থশাস্ত্র এবং ত্রিপিটকের নজির থেকেও অনুমান হয়, এককালে লোকায়ত নামটি ঘৃণার ছিলো না—অন্তত সর্বত্র নয়। কিন্তু আনুমানিক অষ্টম-নবম শতক থেকে লোকায়তকে শুধু ইতর জনগণের দর্শন বলে গালাগালি করাই যথেষ্ট নয়, বস্তুবাদী দর্শনকে নিছক রাক্ষুসে দর্শন বলে ঘোষণা করলে দর্শনটি সম্বন্ধে আতঙ্ক প্রচার সহজ হয়। এই কারণেই কি মহাভারতের রাক্ষসটির নাম থেকে তাকে চার্বাক দর্শন বলে প্রচার করার কায়দা শুরু হলো ?

১১ ॥ বার্হস্পত্য দর্শন

বস্তুবাদী দর্শনটির নাম প্রসঙ্গে এখানে আর একটি কথাও বলে রাখা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বার্হস্পত্য মত বলেও উল্লিখিত। অর্থাৎ, বৃহস্পতির মত বা বৃহস্পতি-প্রণীত মত। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে বৃহস্পতি ছিলেন দেবগুরু বা দেবতাদের আচার্য। স্বয়ং দেবগুরু প্রণীত মত হলে দর্শনটির মর্যাদা খুবই বেশি হবার কথা। আসলে কিন্তু তা নয়। বার্হস্পত্য মত আখ্যা দেবার পিছনেও বস্তুবাদী দর্শন সম্বন্ধে একটা ভয়-ভীতি প্রচারের আয়োজন ছিলো। পুরাণে তার বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা যখন নেহাতই বেকায়দায় পড়েছিলেন তখন দেবগুরু বৃহস্পতি এক ফন্দি বার করলেন। ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে গিয়ে তিনি এই বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। এবং এই ভ্রান্ত ও ঘৃণ্য মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসুরেরা এমন অধঃপাতে গেলো যেই সেই সুযোগে দেবতাদের পক্ষে তাদের একেবারে গোহারান হারিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো।

তাহলে. দেবগুরু বৃহস্পতির রচনা বলেই মতটা মানবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বরং ঠিক তার উল্টো। বস্তুবাদী মতটির অনুসরণ আসলে অধঃপাতে যাবার যাকে বলে সোজা সড়ক। আপাত-আকর্ষণের আলেয়ায় ভুলে যদি অধঃপাতে যেতে চাও—যদি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাও—তাহলে অবশ্য মতটা মানতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, এরই মোহে পড়ে অসুরদের কী সর্বনাশ হয়েছিলো!

১২ ॥ প্রচার মাধ্যম

অবশ্য এরকম কাহিনী ফেঁদে বস্তুবাদকে খেলো প্রতিপন্ন করবার একটা সমস্যাও আছে। গল্পটা সাধারণের চেতনায় গেঁথে দিতে পারলে না-হয় অন্য কথা। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের জন্যে সামান্য হাতেখড়িটুকুরও ব্যবস্থা নেই। পুরাণে প্রসিদ্ধ হলেও কজনই বা তা পড়ে দেখবে?

সোজা কথায়, এসব কথা জনসাধারণের কাছে পৌছে দিতে গেলে বিশাল

প্রচার-মাধ্যম দরকার। যাকে বলে ম্যাস্ মিডিয়া (*mass media*)। আজ-কাল অবশ্য হরেক রকম প্রচার-মাধ্যম চালু আছে। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু। কিন্তু সাবেককালে অতশতর বালাই ছিলো না। তবু আমাদের দেশে প্রচার-মাধ্যম বলে একেবারে কিছুই ছিলো না—এমন কথা কল্পনা করাও ঠিক হবে না। এর মধ্যে প্রধান বলতে কথকতা। এমন কি গণ্ডগ্রামের নিরক্ষর সাধারণের কাছে কথক ঠাকুরেরা রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে পুরাণগুলির উপদেশও পৌছে দিতে পারতেন বইকি। বঞ্চিত গ্রামবাসীদের কাছে এই কথকতাতেই ছিলো বড়ো রকমের চিত্ত বিনোদনের আয়োজন। পুরাণের পবিত্র কাহিনী শুনলে কিছুটা পুণ্যলাভ ছাড়াও হরির-লুঠের দু'এক টুকরো বাতাসাও হয়তো জুটতো। এবং কথক ঠাকুর তেমন তুখোড় হলে পুরাণের কাহিনীগুলি পরিবেশনের সময় দর্শনের অনেক কঠিন কথাও গ্রামবাসীদের কাছে একেবারে জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন, পারতেন তাদের চেতনায় গভীরভাবে গেঁথে দিতে।

তাই দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের উচ্ছন্নে পাঠাবার ফন্দি করে যে-সর্বনেশে দর্শনটি ফেঁদে ছিলেন তার আতঙ্ক সাধারণ দেশবাসীর কাছে পৌছে দেবার কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না—এমন কথা মনে করাও ঠিক হবে না।

তবুও কিছুটা বিপদের ভয়ও থেকে যায় বইকি! বৃহস্পতির ফিকিরটা বিদগ্ধ সমাজে রীতিমতো বাহবা পেলেও নিরক্ষর দেশবাসীদের পক্ষে কিছুটা ভুল বোঝবারও ভয় থাকে। হাজার হোক বৃহস্পতি খোদ দেবগুরু; তাঁর বুদ্ধিবিদ্যের সীমা-পরিসীমা থাকতে পারে না। তাই প্রখর বস্তুবাদী মতটি বার্হস্পত্য মত বা খোদ বৃহস্পতির রচনা বলে প্রচারিত হলে মতটি সাধারণের কাছে বেশ কিছুটা মর্যাদাও পেতে পারে; দেবগুরুর ফন্দিটা ঠিকমতো মাথায় নাও ঢুকতে পারে! বিশেষত লোকায়ত নামের মধ্যেই যদি মতটার প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো প্রবণতার ইঙ্গিত থাকে তাহলে দেবগুরুর ফন্দি ফিকিরের কথাটাতেই খটকা লাগা অসম্ভব নয়।

তাই সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হিসেবে দেবগুরুর সঙ্গে মতটার সম্পর্কের কথা বাদ দিয়ে মতটাকে সরাসরি রাক্ষুসে মত হিসেবে প্রচার করা ভালো। চার্বাক নামে রাক্ষসের সঙ্গে মতটাকে জুড়ে দিতে পারলে এই সমস্যারও একরকম কিনারা হয়। অতএব, পরবর্তীকালের কিছু বিদগ্ধ—বা অতি-বিদগ্ধ—পুঁথিপত্রে

বার্হস্পত্য নামটার যোগ থাকলেও প্রখর বস্তুবাদী মতটিকে চার্বাক নাম দেওয়াই তুলনায় অনেক নিরাপদ হয় না কি ?

অবশ্যই স্বীকার করা ভালো, চরম বস্তুবাদী মতটি কালক্রমে চার্বাক হিসেবেই কেন অমন প্রসিদ্ধি পেলো—এ বিষয়ে একেবারে সুনিশ্চিত কোনো ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের জানা নেই। তবুও, নাম-পাল্টানোর একটা পর্যাপ্ত কারণ থাকবার কথা। সুনিশ্চিত হিসেবে শুধু এটুকু বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ আমরা চার্বাক নামের প্রথম পরিচয় পাই। তার আগে নয়।

১৩ ॥ বস্তুবাদী গ্রন্থের বিলুপ্তি

প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদ নিয়ে দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বিদ্বান্‌দের মধ্যে অবশ্য বিতর্কের অবধি নেই। কিন্তু—অন্তত আধুনিক কাল পর্যন্ত—একটি বিষয়ে সকলে একমত। লোকায়তই বলুন বা বার্হস্পত্যই বলুন বা চার্বাকই বলুন—এই সম্প্রদায়টির নিজস্ব পুঁথিপত্র পাওয়া যায় না, সম্প্রদায়টির বিরুদ্ধে যতো বিষোক্তিই থাকুক না কেন !

কোনো কালে এজাতীয় কোনো বই সত্যিই লেখা হয়েছিলো কিনা—এ-নিয়েও বিতর্ক আছে। অনেকেই সরাসরি ধরে নেন যে কোনো কালেই চার্বাকদের নিজস্ব রচনা বলে সত্যিই কিছু ছিলো না। ইতরজনের—বা শঙ্করের ভাষায় প্রাকৃতজনের—সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক হলে অবশ্য পুঁথিপত্রের বালাই থাকবার কথাও নয়। পরকাল-পরলোকের ভাঁওতা ছেড়ে খাও-দাও-ফুর্তি-লোটো—এজাতীয় স্থূল কথা প্রচার করার জন্যে এমন কোনো বই লেখার কথাই ওঠে না দার্শনিক গ্রন্থ হিসেবে যার কোনো মর্যাদা পাবার সম্ভাবনা। তাই চার্বাক মতের সমর্থনে চার্বাকদের লেখা কোনো বইপত্তরের বালাই না-থাকাই স্বাভাবিক।

রিস্‌ ডেভিডস্‌ বলতে চান, পুঁথিপত্র তো দূরের কথা—চার্বাক বা লোকায়ত বলে সত্যিই কোনো দার্শনিক মত এদেশে কোনোকালে চালু ছিলো কিনা—সেটাই খুব সন্দেহের কথা : আসলে ওসব শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিকদের কল্পনা-প্রসূত।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটা অমন সহজে উড়িয়ে দিয়ে চার্বাক-সমস্যার সত্যিই কোনো সমাধান হয় না। মতটাই যদি কাল্পনিক হয় তাহলে এই নিয়ে

দেশের অগ্রণী অতো দার্শনিকের অমন মাথা-ব্যথা কেন? তাছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যাঁদের প্রগাঢ় দখল তাঁদের মধ্যে অনেকেই এমন হদিশ পেয়েছেন, যার ফলে মানতেই হবে, অন্তত কোনো এক কালে মতটির প্রচারকেরা সত্যিই কিছু বইপত্র লিখেছিলেন। কেননা, চার্বাকদের লেখা কোনো বইএর হদিশ এখনো পাওয়া না-গেলেও ('তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র কথা একটু পরেই দেখবো), অন্যান্য প্রামাণ্য বই থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মতটির সমর্থনে এককালে সত্যিই কিছু বইপত্র লেখা হয়েছিলো।

এ-বিষয়ে গার্বে (R. Garbe), সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং তুচ্চি (G. Tucci) কিছু অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন।

গার্বে এবং দাসগুপ্ত ব্যাকরণ সাহিত্য থেকে যে-নজির দেখিয়েছেন প্রথমে তাই দেখা যাক।

প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের সব চেয়ে নামকরা বই অবশ্যই পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'। অনেকটা তারই অনুসরণে—অনেকটা আবার নতুন আলোচনা জুড়েও—কাত্যায়ন আর একটি বই লেখেন। 'বার্তিক' বা 'বার্তিক-সূত্র' নামে তার প্রসিদ্ধি। তারপর পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'। এই 'মহাভাষ্য' সাধারণত পাণিনির ভাষ্য বলে ধরে নেওয়া হলেও, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কাত্যায়নের প্রায় পুরো 'বার্তিক-সূত্র'রও ব্যাখ্যা আছে। সন-তারিখের দিক থেকে অবশ্য পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি—কারুর কথাই আমাদের কাছে সুনিশ্চিত নয়। বিদ্বান্‌দের মধ্যে এ-নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। তবুও অন্তত কাজ চালাবার মতো কিছুটা ধারণা দরকার। এদিক থেকে বলা যায় পাণিনির প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন (সাধারণত ধরা হয় খ্রীস্টপূর্ব ৬০০-৪০০-র মধ্যে হবে), কাত্যায়নের 'বার্তিক' মোটের উপর খ্রীস্টপূর্ব ৩০৯ হওয়া সম্ভব, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' তেমনি খ্রীস্টপূর্ব ১৫০-এর পরে লেখা নয়।

এই প্রাথমিক কথাগুলি মনে রেখে ব্যাকরণ সাহিত্যে চার্বাকদের বই সংক্রান্ত কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাই দেখা যাক।

কাত্যায়ন বলেছেন, 'বর্ণক' শব্দের মানে প্রাবরণ বা চাদর। স্ত্রীলিঙ্গে তার রূপ হয় 'বর্ণকা'। কিন্তু কেন? বরং 'বর্ণিকা'-ই তো হবার কথা। উত্তরে পতঞ্জলি বলছেন, তাতে কিছুটা বিভ্রান্তির আশঙ্কা থেকে যায়। কেননা, শুধুমাত্র চাদর (প্রাবরণ) অর্থে 'বর্ণকা' শব্দের উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে 'বর্ণিকা' শব্দটির মানে অন্য। তা হলো, ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা বর্তিকা। তারই নমুনা

হিসেবে মহাভাষ্যকার বলছেন : ‘বর্ণিকা ভাগুরি লোকায়তস্য, বর্তিকা ভাগুরি লোকায়তস্য’। সোজা কথায়, ভাগুরি লোকায়তর বর্ণিকা বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ভাগুরি বলতে এখানে কোনো গ্রন্থর নাম না গ্রন্থকারের নাম ; যাই হোক, একটি কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি—এবং হয়তো বার্তিককার কাত্যায়নও—জানতেন যে লোকায়তর একটি ভাষ্য ছিলো। সম্ভবত তারই নাম ভাগুরি। মূল গ্রন্থ বাদ দিয়ে শুধু ভাষ্যগ্রন্থর কথা ভাবা কঠিন। তাই মহাভাষ্যর সাক্ষ্য থেকে লোকায়তর কোনো মূল গ্রন্থ অনুমানেরও সুযোগ থাকে। তাই ব্যাকরণ-সাহিত্যের নজির থেকেই বোঝা যায় এককালে লোকায়তর গ্রন্থ এবং তার ভাষ্যও ছিলো।

এই প্রসঙ্গেই দাসগুপ্ত আরো একটি নজির দেখাচ্ছেন। বৌদ্ধদের লেখা ‘দিব্যাবদান’ বলে একটি সংস্কৃত বই আছে। বইটির নিখুঁত কালনির্ণয় সম্ভব না-হলেও আমাদের কাছে তা রীতিমতো প্রাচীন—অংশবিশেষ মহারাজ অশোকের কিছুটা পরবর্তী হতে পারে। দাসগুপ্ত দেখাচ্ছেন, এই বইএর এক জায়গায় লেখা আছে : ‘লোকায়তং ভাষ্য : প্রবচনম্’। এর থেকে নিশ্চয়ই অনুমান হয়, সেকালে লোকায়তর ভাষ্যগ্রন্থ ও প্রবচন-গ্রন্থ চালু ছিলো। প্রবচন মানেও একরকম ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

আরো প্রমাণ হিসেবে তুচ্চি বলছেন, চন্দ্রকীর্তির ‘প্রজ্ঞাশাস্ত্র’ এবং আর্যদেবের ‘শাস্ত্রাশাস্ত্র’ বইতে প্রকৃত বার্হস্পত্য-সূত্র উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া, একটি বইএর পাশে কোনো অজ্ঞাত লেখকের একটি প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায়, এই উক্তি অনুসারে পুরন্দর নামের জনৈক দার্শনিক ‘লোকায়ত মতে গ্রন্থকর্তা’ হিসাবে উল্লিখিত। পুরন্দরের কথা আমরা পরে আবার পাবো। আপাতত মন্তব্য শুধু এই যে অন্তত তুচ্চির মতে ‘লোকায়ত মতে গ্রন্থকর্তা’ বলে তাঁর বিশেষণটি কিছুতেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। অতএব লোকায়তর গ্রন্থও নয়।

তাহলে, উপরোক্ত নজিরগুলি থেকে মানতে হয়, এককালে লোকায়ত মতের বই ছিলো। এমন কি তার উপর ভাষ্য ও ব্যাখ্যাগ্রন্থও ছিলো। সেগুলির হলো কী, তা অবশ্য জানা নেই। নেহেরু লিখেছিলেন, বিপক্ষদল বইগুলি ধ্বংস করেছে। মহাভারতে যদি চার্বাককেই পুড়িয়ে মারার কাহিনী থাকে তাহলে চার্বাকদের লেখা বই পোড়ানোর কথা ভাবাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার পক্ষে কোনো প্রমাণও নেই বা কোনো ঐতিহাসিক তথ্যও নেই। অতএব নিরাপদ

উক্তি হিসেবে অনেকে শুধু এটুকুই বলতে চান যে, কোনো এককালে এজাতীয় বই প্রচলিত থাকলেও মানতেই হবে যে, পরবর্তীকালে তা বিলুপ্ত হয়েছে—যে-কোনো কারণেই হোক না কেন।

১৪॥ জয়রাশি ভট্ট

এ-হেন কথা যখন প্রায় সর্ববাদীসম্মত মতে পরিণত, তখন ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় প্রায় এক নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। স্বয়ং সুখলালজীর মতো মহান বিদ্বান ঘোষণা করলেন, লোকায়ত-মতের একটি গ্রন্থ অবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে। বইটির নাম 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'; লেখক জয়রাশি ভট্ট। ১৯৪০ সালে বইটি মুদ্রিতরূপে প্রকাশিতও হলো। সম্পাদকদের বিচারে বইটির রচনাকাল আনুমানিক অষ্টম শতক।

কিন্তু গোড়াতেই বেশ কিছুটা খট্‌কা লাগবার কথা। বইটির নাম থেকেও, লেখকের নাম থেকেও। ভট্ট শব্দটা ব্রাহ্মণদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ দেশের তত্ত্বগত আবহাওয়াটা এমন নয় যে, অন্তত অষ্টম শতকে কোনো ব্রাহ্মণ দার্শনিকের পক্ষে প্রখর বস্তুবাদ ও নাস্তিক্য সমর্থনে বই লেখার সম্ভাবনা সহজ কল্পনার ব্যাপার হতে পারে। বইটার নাম নিয়েও ভাববার কথা আছে। সোজা বাংলায়: সিংহের মতো দর্পে তত্ত্বমাত্রকে—অর্থাৎ সবরকম দার্শনিক মতকে—উপপ্লব বা মিশমার করে দেবার দাবি। যদি সব দর্শনেরই খণ্ডন হয়, তাহলে চার্বাকই বা বাদ থাকে কেন?

মনে রাখা দরকার, বইটির অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু থেকে সম্পাদকরা এটিকে প্রসিদ্ধ চার্বাক বা লোকায়ত মতের পরিচায়ক বলে দাবি করেননি। করা সম্ভবও নয়। শুরুতেই গ্রন্থকার বলছেন, সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে মাটি, জল, আগুন, বাতাস—এগুলিই মূল সত্য। কিন্তু দার্শনিক বিচারের ধোপে তাও টেঁকে না। তার মানে প্রসিদ্ধ চার্বাক মত খণ্ডন থেকেই বইএর শুরু। গ্রন্থশেষে জয়রাশি আস্ফালন করে বলছেন, স্বয়ং দেবগুরু বা বৃহস্পতির মাথাতেও যা আসেনি তা এই পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনের বইতে ব্যাখ্যা করা হলো। বৃহস্পতি-মতের কোনো প্রকৃত সমর্থকের পক্ষে এমন আস্ফালন সহজবোধ্য নয়, কেননা গুরুমারা বিদ্যের স্থান আর যেখানেই থাকুক না কেন, অন্তত ভারতীয়

দার্শনিক ঐতিহ্যে থাকতে পারে না। বরং, প্রতিটি দার্শনিক মতের প্রকৃত প্রবক্তারা পরের যুগে কোনো নতুন কথা বলার সময়ও যেন-তেন-প্রকারেণ কথাটা সম্প্রদায়-প্রবর্তকের প্রকৃত অভিপ্রায় বলেই প্রচার করতে চান। পাষণ্ড-দর্পচ্ছেদনের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেননা ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে প্রচলিত রকমারি গালিগালাজের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের পাষণ্ড আখ্যা দিয়ে সন্তোষ লাভ করলেও, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ উভয়ের পক্ষেই চার্বাককে সমস্বরে পাষণ্ডশিরোমণি হিসাবেই দেখবার কথা।

তাহলে বইটিতে চার্বাক-প্রবণতার পরিচয় শুরুতেও নেই, শেষেও নেই। আরো বড়ো কথা হলো, বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য-বিষয়ের মধ্যেও নয়। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' অবশ্যই সহজপাঠ্য বই নয়: যুক্তিতর্ক-কণ্টকিত রীতিমতো কঠিন বই। তবুও সাধ্যমতো সহজ করে এবং সংক্ষেপে তার সারমর্ম বলে রাখা দরকার।

জয়রাশি কী করে দেখাতে চান যে কোনো রকম দার্শনিক মতই স্বীকার-যোগ্য নয়? সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই: যে-কোনো দার্শনিক মত বা তত্ত্ব হোক না কেন, স্বীকারযোগ্য হতে গেলে তার পক্ষে তো প্রমাণ থাকা দরকার; অথচ বিচার করলে বোঝা যায় যে, কোনো রকম তথ'কথিত প্রমাণেরই প্রামাণ্য —বা প্রমাণ করবার যোগ্যতা—থাকতে পারে না। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতির প্রমাণ হিসেবে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু জয়রাশি দেখাতে চান, সে-প্রসিদ্ধি আসলে অলীক, কেননা নামে প্রমাণ হলেও এগুলি সবই আসলে অসার; কোনোটিকেই প্রমাণ বলা যায় না। আর প্রমাণ বলেই যদি কিছু না থাকে তাহলে কোনো রকম দার্শনিক মত বা তত্ত্ব স্বীকার করার কারণও থাকতে পারে না। অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'—সিংহদর্পে সর্বতত্ত্বের উপপ্লব বা উৎখাত।

তাহলে বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য হলো, প্রমাণমাত্রেরই খণ্ডন। চোটটা অবশ্য সব প্রথম 'প্রত্যক্ষ' বলে প্রমাণের উপর। তার কারণটা বোঝাও কঠিন নয়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায়দর্শনেই প্রমাণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা; এই কারণে ন্যায়দর্শনের নামান্তরে প্রমাণশাস্ত্র হিসাবেও প্রসিদ্ধি আছে। চলতি কথায় আমরা আজকাল যাকে বলি 'লজিক' (logic)। এবং ন্যায় মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণজ্যেষ্ঠ—প্রমাণের মধ্যে প্রথম বা সবচেয়ে সেরা

বা সবচেয়ে মৌলিক। জয়রাশি ভট্ট তাই প্রথমেই দেখাতে চান, প্রত্যক্ষ বলে আসলে কোনো প্রমাণই হতে পারে না।

জয়রাশির বইকে লোকায়ত মতের ব্যাখ্যা বলতে গেলে কিন্তু এইখানেই বেশ হোঁচট খাবার ভয়। কেননা, অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে দাবি করেছেন, লোকায়ত বা চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ—যদিও আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, চার্বাকের আসল কথাটা খুব সম্ভব এই যে প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। অথচ প্রত্যক্ষ-খণ্ডন থেকেই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র আসল আলোচনা শুরু! সুখলালজীর মতো মহাপণ্ডিতের পক্ষে এইটুকু কথা উপেক্ষা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাই তিনি আসলে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে প্রসিদ্ধ চার্বাক বা লোকায়ত মতের বই বলেন নি। তাঁর দাবি শুধু এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী প্রসিদ্ধ চার্বাক ছাড়াও কোনো এককালে সর্বপ্রমাণবিরোধী চার্বাকদেরই তুলনায় এক অপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় হয়তো চালু ছিলো, জয়রাশি ভট্ট তারই সমর্থনে বইটি রচনা করেন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: সর্বপ্রমাণ-বিরোধী তুলনায় অপ্রসিদ্ধ এ-হেন চার্বাকদেরই অখ্যাত উপসম্প্রদায়টির খবর পাওয়া গেলো কোথা থেকে এবং জয়রাশির বইকে তারই ব্যাখ্যা বলে মনে করার কারণ কী? উত্তরে পণ্ডিত সুখলালজীর দাবিটার মূল কথা দাঁড়ায় এই যে, আসলে বইটির বাইরে—ভারতীয় দর্শনের সাধারণ পরিস্থিতিতে—এমন কিছু ইংগিত পাওয়া যায় যা থেকে অনুমান হয় যে, প্রসিদ্ধ চার্বাক-সম্প্রদায়ের বই না-হলেও 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' এ-পর্যন্ত অজানা চার্বাকদেরই কোনো উপসম্প্রদায়ের বই হওয়াই সম্ভব।

ইংগিতটা বেশ ঘোরালো। ঠিকমতো বুঝতে হলে অন্য কিছুটা আলোচনা পাড়তে হবে। প্রথমত মনে রাখতে হবে, প্রমাণ-মাত্রেরই—সব রকম প্রমাণেরই—অসারতা দেখাবার চেষ্টা (অর্থাৎ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মূল বিষয়বস্তু) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এমন কিছু নতুন কথা নয়। জয়রাশির ঢের আগে থাকতেই অনেকে সে-চেষ্টা করেছেন, যদিও তাঁরা কেউই বস্তুবাদের সমর্থক নন; বরং চরম ভাববাদেরই সমর্থক।

এদিক থেকে সর্বপ্রথম যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন নাগার্জুন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দার্শনিক। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধধর্মে-বিশ্বাসীরই দার্শনিক মত এক নয়;

তাঁদেরই মধ্যে নানা দলের নানা মত। নাগার্জুন-প্রবর্তিত সম্প্রদায়টির নাম মধ্যমক; তাঁর দার্শনিক প্রতিপাদ্যকে শূন্যবাদ বলা হয়। এই মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ-সংসার হিসাবে সাধারণত যা ধরে নেওয়া হয় তা সবই আসলে শূন্য—বেবাক কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু জগৎ-সংসারের এ-হেন কল্পনা কেন? বরং আমরা তো চোখে দেখি, অনুমানে জানি, ইত্যাদি। অর্থাৎ, দার্শনিকদের ভাষায় যাকে বলে প্রমাণ। অতএব, স্বমত সমর্থনে নাগার্জুনের পক্ষে দেখানোর দরকার ছিলো, প্রমাণ-মাত্রই অলীক—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ হিসাবে সাধারণত যা স্বীকৃত তা সবই অসার। দার্শনিকদের ভাষায়, প্রমাণের প্রামাণ্য নেই। কথাটা বোঝাবার জন্যে নাগার্জুন নানা জটিল ও কুটিল তর্কের অবতারণা করেন। স্বতন্ত্র বইও লেখেন। এ-বিষয়ে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ বই-এর নাম 'প্রমাণ-বিধ্বংসন'—প্রমাণ-মাত্রেরই ধ্বংস। তাঁর মতের ব্যাখ্যায় চন্দ্রকীর্তি, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক প্রভৃতি বিস্তৃত এবং রীতিমতো কঠিন বই লিখেছিলেন, যদিও এঁদের মধ্যে একটা বিষয়ে কিছু মতভেদ ছিলো: প্রমাণ খণ্ডণের উদ্দেশ্যেই অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের ব্যবহার কি সঙ্গত হবে? একদলের মতে এ-হেন সদিচ্ছা সত্ত্বেও তা চলবে না, অপরমতে এই সীমিত সদিচ্ছায় প্রমাণ ব্যবহৃত হতে পারে। নাগার্জুন ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের পর সর্বপ্রমাণ পরিহারের প্রস্তাব করেন শঙ্করাচার্য। তাঁর দার্শনিক মত মায়াবাদ। অর্থাৎ, জগৎসংসার বলতে আমরা যা-কিছু জানি সবই মায়া বা মিথ্যা। শঙ্কর অবশ্যই প্রবল বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন, যদিও আমাদের দার্শনিক ঐতিহ্যে একটা কথা চালু আছে যে, বৌদ্ধ-বিদ্বেষের যতোই ভাণ করুন না কেন, আসলে তিনি ছিলেন "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ", অর্থাৎ কায়দা করে বৌদ্ধ মতই বৈদিক মত হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এজাতীয় প্রসিদ্ধির মূলে যাই থাকুক, একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনিও নাগার্জুনের মতোই প্রমাণ-মাত্রেরই অসারতা প্রচার করেন। তাঁর প্রধানতম দার্শনিক গ্রন্থ বলতে 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' চলতি কথায় যাকে বলে 'বেদান্ত-ভাষ্য'। কিন্তু 'ব্রহ্মসূত্র'র ব্যাখ্যা শুরু করার আগেই তিনি একটি ভূমিকা জুড়ে দিয়েছেন। ভূমিকার একটা মূল কথা এই যে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি তথাকথিত প্রমাণগুলি আসলে অসার। আমাদেরই অজ্ঞান ছাড়া এগুলির কোনো ভিত্তিই নেই। মোদ্দা কথায় ওই প্রমাণ-বিধ্বংসনই।

কিন্তু শঙ্করের লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, যুক্তিতর্কই তাঁর প্রধান

দার্শনিক হাতিয়ার নয়। তাঁর কাছে এ-হেন হাতিয়ার বলতে শাস্ত্রর দোহাই। 'ব্রহ্মসূত্র'-র ভাষ্যে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে যুক্তিতর্কর অসারতাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ; যদিও বড়ো জোর শাস্ত্রর অনুগামী হিসেবে তার কিছুটা সার্থকতা থাকতে পারে। অতএব, তাঁর মতও নাগার্জুনের মতো প্রমাণ-বিধ্বংসই, যদিও নাগার্জুন বা তাঁর অনুগামী চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতির মতো এই মতের সমর্থনে কূটবিচারের পরিচয় শঙ্করের নিজের লেখায় পাওয়া যায় না।

মায়াবাদের সমর্থনে সে-বিচারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন আনুমানিক দ্বাদশ শতকের দার্শনিক শ্রীহর্ষর 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' নামের বইতে। চলতি কথায়, নামটার মানে হলো, 'খণ্ডন মিষ্টান্ন'—খণ্ডনই মেঠাই এর মতো উপাদেয়। বইটিতে শ্রীহর্ষ দেখাতে চেয়েছেন, প্রমাণ বলে দার্শনিকেরা সাধারণত যা মানেন তার কোনোটাই মানা যায় না। অথচ, প্রমাণ বলে যদি কিছুই সম্ভব না-হয় তাহলে শ্রীহর্ষ কী করে মায়াবাদ সমর্থন করবেন ? এ-জাতীয় আপত্তি মনে রেখে শ্রীহর্ষ প্রথমেই বলে রাখতে চান, সমস্ত রকম প্রমাণ বরবাদ করেও দার্শনিক মত মানার সুযোগ আছে। তারই নিদর্শন হিসাবে তিনি বলছেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি সবরকম প্রমাণ বাতিল করেও নাগার্জুন শূন্যবাদ প্রচার করেছেন, শঙ্করাচার্য মায়াবাদ প্রচার করেছেন, এমনকি বৃহস্পতিও স্বমত—অর্থাৎ চার্বাক বা লোকায়ত মত—প্রচার করেছেন। পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের সুরে শ্রীহর্ষ বলছেন : "প্রমাণে অনাস্থা সত্ত্বেও চার্বাক ও মাধ্যমিক প্রভৃতিদের বাক্‌জাল যেহেতু প্রতীয়মান, সেই হেতু। ···আপনি যে-অপূর্ব প্রমাণ প্রভৃতির সত্তায় অনাস্থা-সংক্রান্ত বাক্‌স্তম্ভ মাত্র বলেছেন তার প্রভাবেই ভগবান্ বৃহস্পতি লোকায়তসূত্রাবলী রচনা করেননি, তথাগত (বুদ্ধ) মাধ্যমিক শাস্ত্রের উপদেশ দেননি, শঙ্করাচার্যও 'বাদরায়ণ-সূত্র'-র (অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের) ভাষ্য রচনা করেননি !" অর্থাৎ, সোজা কথায়, এঁরাও সকলেই প্রমাণ বাদ দিয়েও দর্শনের আলোচনা করেছেন। অতএব শ্রীহর্ষরও সে-অধিকার আছে।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা মূলতই শ্রীহর্ষর এই উক্তি অবলম্বন করেই দাবি করছেন, বইটিকে চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, বইটির প্রধান প্রতিপাদ্য সর্ব-প্রমাণ বর্জন এবং শ্রীহর্ষ স্পষ্টই বলেছেন যে, চার্বাক মতে কোনো প্রমাণই গ্রাহ্য না-হলেও তারই সমর্থনে স্বয়ং বৃহস্পতি লোকায়ত-সূত্র রচনা করেছেন।

কিন্তু অমন সরাসরি কোনো সিদ্ধান্তে আসায় বাধা আছে। শ্রীহর্ষর বক্তব্য যদি অকাট্য বলেই মেনে নেওয়া হয়, তাহলে শুধু চার্বাকদের ঘাড়েই বইটি চাপানো কেন? শ্রীহর্ষ তো একই সঙ্গে শূন্যবাদী ও মায়াবাদীদের কথাও উল্লেখ করেছেন! অতএব বইটি শূন্যবাদ বা মায়াবাদের পক্ষে লেখা বলে মনে করারও সুযোগ থাকে! তাছাড়া চার্বাকেরা যে সব রকম প্রমাণই বর্জন করেছেন, শ্রীহর্ষর এই দাবিটুকুও অতিরঞ্জিত বলে সন্দেহ করার সম্ভাবনা আছে। কেননা, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অন্যান্য দিকপালেরা বারবার বলছেন, চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন; অনুমান প্রভৃতি অন্য কোনো প্রমাণ মানেন না। অর্থাৎ, চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ-বাদী, সর্বপ্রমাণ বিরোধী নয়। সর্বপ্রমাণ-বিরোধী হিসাবে যাঁরা ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ তাঁরা চরম ভাববাদী (শূন্যবাদী ও মায়াবাদী); বস্তুবাদী নন। তাই সন্দেহ হয়, তর্কের —বা হয়তো রচনাভঙ্গির—খাতিরে শ্রীহর্ষ শূন্যবাদী ও মায়াবাদীদের সঙ্গে বার্হস্পত্য মত জুড়ে দিলেও, তাঁর মন্তব্যর সারাংশ এই যে, অন্তত দর্শনের আলোচনায় অনুমান প্রভৃতি প্রমাণই প্রধান অবলম্বন; অথচ অনুমানাদি না-মেনেও বৃহস্পতি যখন লোকায়ত মত প্রচার করেছেন তখন শ্রীহর্ষর পক্ষেও একই পথে মায়াবাদে পৌঁছোনোয় বাধাটা কী?

সুখলালজীর মতো মহাপণ্ডিত যে এসব কথা জানতেন না এমনতরো কল্পনা অবশ্যই ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু তাহলেও তিনি 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে লোকায়তিক গ্রন্থ বলে মনে করেছেন কীভাবে? তাঁর উত্তরটা একটু খতিয়ে বুঝতে হবে।

প্রথমত তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলে রেখেছেন, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' প্রসিদ্ধ চার্বাক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ অবশ্যই নয়, কেননা প্রসিদ্ধ চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ এবং 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-তে প্রত্যক্ষও প্রমাণ নয়। তাহলে চার্বাকমতের বই হলো কী করে? সুখলালজীর উত্তর: প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী প্রসিদ্ধ চার্বাক ছাড়াও তুলনায় অপ্রসিদ্ধ চার্বাকদেরই হয়তো কোনো এক উপসম্প্রদায় ছিলো; এই উপসম্প্রদায়টি সর্বপ্রমাণ-বিরোধী—কোনো প্রমাণই মানতো না, এমনকি প্রত্যক্ষও নয়। হয়তো তারই সমর্থনে জয়রাশি ভট্ট এই বই লেখেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো: চার্বাকদেরই এ-হেন এক অখ্যাত উপসম্প্রদায়ের খবরটা পাওয়া গেলো কোথা থেকে? সুখলালজীর মতে, শ্রীহর্ষরই এক ভাষ্যকারের

কাছ থেকে। মনে রাখতে হবে, শ্রীহর্ষর 'খণ্ডন-খণ্ডন-খাদ্য' খুব কঠিন বই। তার ব্যাখ্যায় অনেকে অনেক টীকাটিপ্পনী লিখেছেন। এঁদের মধ্যে শুধু একজন ছাড়া বাকি সকলেই শ্রীহর্ষর আলোচ্য মন্তব্যের যে-ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনে চার্বাক-প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধির অসঙ্গতি নেই: চার্বাকরা অনুমান মানেন না; অথচ অনুমানই দর্শনের প্রধান ভিত্তি; এদিক থেকে তাই বলা যায় প্রমাণ না-মেনেও দর্শন সম্ভব। কেবলমাত্র শঙ্কর মিশ্র নামে আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের এক ভাষ্যকার শ্রীহর্ষর উক্তিটির প্রথাগত ব্যাখ্যা করে তারই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন "চার্বাকৈকদেশী বা চার্বাকা:"। অর্থাৎ, সোজা কথায়, এমনও হতে পারে যে, কোথাও হয়তো কোনো চার্বাকপন্থী কোনো প্রমাণই মানতেন না—প্রত্যক্ষও নয়। এ-হেন কোনো অখ্যাত চার্বাকপন্থীর কথা ভারতীয় দর্শনের প্রসিদ্ধ লেখকেরা কেউই জানতেন না—শুধুমাত্র পঞ্চদশ শতকের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর এক দার্শনিকের জানা ছিলো—এমনতরো সাক্ষ্যর উপর যাঁরা আস্থা স্থাপন করে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে চার্বাকমতের বই বলে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, সুখলালজীর মতো মহাপণ্ডিত এ-হেন উক্তির উপর অতোখানি গুরুত্ব দিয়ে চার্বাকমত বোঝার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করার বদলে বরং কিছুটা বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করেছেন। বরং তিনি জয়রাশি ভট্টকে সর্ব-প্রমাণ-বিরোধী চরম ভাববাদী—শূন্যবাদী ও মায়াবাদী—দার্শনিকদের সমগোত্রীয় বলে স্বীকার করলে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' বইটির মর্মার্থ বুঝতে আমাদের সাহায্য করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে বইটিতে আর সব রকম মতের খণ্ডন থাকলেও মায়াবাদের খণ্ডন নেই। শ্রীহর্ষর মতো জয়রাশির পক্ষেও সর্ব-প্রমাণ খণ্ডনের ভিত্তিতে মায়াবাদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হয়তো অসম্ভব নয়।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নিয়ে আরো কথার দরকার নেই। এ নিয়ে প্রাথমিক সোরগোল আজ অনেকটা স্তিমিত; বইটিকে বরং সংশয়বাদের নিদর্শক বলে গ্রহণ করার প্রবণতাই বাড়ছে।

১৫॥ চার্বাক মত পুনর্গঠনের উপাদান

কিন্তু এখানে অন্য একটা প্রশ্ন থেকে যায়। চার্বাকদের স্বরচিত গ্রন্থ বলে যদি কিছু না-পাই—কিংবা, এককালে থাকলেও আজ যদি তা বিলুপ্ত হয়ে

গিয়ে থাকে—তাহলে চার্বাক নিয়ে আলোচনার ভিত্তিটা কী হবে? কোন্ উপাদান অবলম্বন করে আমরা একান্তই চার্বাক নিয়ে আলোচনা করতে পারি?

প্রকৃত উপাদান বলতে আমাদের কাছে মূলত তিন রকম।

এক: 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি কিছু প্রাচীন গ্রন্থ।

দুই: প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত—অতএব প্রামাণিক—কিছু লোকগাথা।

তিন: পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাক বা লোকায়তর বর্ণনা। অর্থাৎ, আমাদের দেশে প্রথা ছিলো, কোনো মত খণ্ডন করার আগে মতটা আসলে কী তা ব্যাখ্যা করে নেওয়া। একে বলে পূর্বপক্ষ এবং তা খণ্ডন না-করে স্ব-মত স্থাপন হয় না। এই কারণে বলা হতো, খণ্ডনের আগে পূর্বপক্ষকে যথাসম্ভব দৃঢ়-ভিত্তিতে স্থাপন করে নেওয়া—অর্থাৎ প্রথমে পূর্বপক্ষর সমর্থনে যতো যুক্তি সম্ভব তা সেরে নেওয়া—ভালো। তারপর মতটি মিশমার করতে পারলে আর কেউ তার সমর্থনে মাথা তুলতে পারবে না। অতএব পূর্বপক্ষ-বর্ণন অনেক সময় দীর্ঘবিস্তৃতও করা হতো।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অনেক দিক্‌পাল দার্শনিক চার্বক মত খণ্ডনের জন্যে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। স্বভাবতই তাঁদের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাক দর্শনের বর্ণনা পাওয়া যায়; অনেক সময় সে-বর্ণনা দীর্ঘবিস্তৃত। অবশ্য বর্ণনাগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়; চার্বাক দর্শনকে খেলো করার উৎসাহে প্রায়ই এই পূর্বপক্ষ-বর্ণনার মধ্যেই অল্পবিস্তর অত্যন্ত অসার কথা গুঁজে দেবার নিদর্শন সনাক্ত করা যায়—এমনই অসার যা পড়লে দর্শনটিকে অত্যন্ত তুচ্ছ বিবেচনা করার সম্ভাবনা।

তবুও চার্বাক মত বোঝবার ব্যাপারে এই জাতীয় পূর্বপক্ষ-বর্ণনকেও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচনা করবার সুযোগ আছে। তার একটা বড়ো কারণ এই যে, খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হলেও সমস্ত বিপক্ষ-দার্শনিকের রচনায় চার্বাক মত হুবহু একই রকমের নয়; রচনা-বিশেষে চার্বাক দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য ও এমনকি প্রকৃত শক্তিরও আভাস পাওয়া অসম্ভব নয়।

আরো একটা কথা আছে। পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাক-বর্ণনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো দার্শনিক চার্বাকদের নিজস্ব উক্তির কিছু কিছু নিদর্শন দিয়েছেন। যেমন, আমরা আগেই দেখেছি, 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থে মাধবাচার্য চার্বাকদের

অনেকগুলি প্রামাণিক লোকগাথা সংকলন করেছেন। এইভাবে সংকলিত না-হলে লোকগাথাগুলি হয়ত টি'কে থাকতো না। কিন্তু বিরুদ্ধ দার্শনিকেরা শুধুমাত্র লোকগাথাই উদ্ধৃত করেননি; অনেকের লেখায় চার্বাকদের স্বরচিত 'সূত্র'-জাতীয় উদ্ধৃতিও চোখে পড়ে। অবশ্যই উদ্ধৃত উক্তিগুলি ঠিক কোথা থেকে পেলেন সে-কথা তাঁরা বলবার দরকার বোধ করেননি। শুধু বৃহস্পতি-সূত্র হিসাবেই এগুলি উক্ত।

১৬॥ বৃহস্পতি-সূত্র

এফ্. ডাব্লু. টমাস (F. W. Thomas) 'বৃহস্পতি-সূত্র' নামের একটি পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করেছেন এবং ১৯২১ সালে তার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিদ্বানরা এ-বিষয়ে মোটের উপর একমত যে গ্রন্থটি প্রকৃত চার্বাক মতের পরিচায়ক হতে পারে না, কেননা তুচ্চি (Tucci) যেমন মন্তব্য করেছেন, এই বই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে ভরপুর। গ্রন্থটি থেকে হয়তো বড়ো জোর চার্বাক-সংক্রান্ত সামান্য খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোনো এককালে অবিকৃত 'বৃহস্পতি-সূত্র' বলে চার্বাকমতের কোনো বই সত্যিই প্রচলিত ছিলো কিনা তাও শুধু এই বইটি থেকে অনুমানের চেষ্টা নিষ্ফল। তাই বিভিন্ন দার্শনিকের চার্বাক-বর্ণনায় উদ্ধৃত বৃহস্পতি-সূত্রগুলি বা চার্বাকদের নিজস্ব উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রকৃত উৎস জানবার সুযোগ সত্যিই নেই। কিন্তু তাই বলে উদ্ধৃতিগুলি উড়িয়ে দেবার মতো নয়; অনেক সময় চার্বাকমত পুনর্গঠনে এগুলি বিশেষ মূল্যবান উপাদান হতে পারে।

প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা বলে রাখা যায়। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেছেন। পরিশিষ্টটির শিরোনাম 'বার্হস্পত্যসূত্রম্'। এটি একটি সংকলন: বিভিন্ন গ্রন্থে চার্বাকমত বর্ণনায় চার্বাকদের নিজস্ব উক্তি হিসাবে যে-সব উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তারই সংকলন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায়, 'নিম্নে বৃহস্পতি, চার্বাক, লোকায়ত, পুরন্দর, কম্বলাশ্বতর—এই কয়জন দার্শনিকের অর্থশতাধিক সূত্র এবং যে গ্রন্থ হইতে যেরূপ অবস্থায় সংগৃহীত হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল।'

তাঁর তালিকায় মোট ৫৪টি 'সূত্র' বর্তমান। চার্বাকদের নামে প্রচলিত নানা প্রামাণিক লোকগাথাও তালিকাটির অন্তর্ভুক্ত, যদিও অবশ্য প্রচলিত—ও বিশেষত পারিভাষিক—অর্থে লোকগাথাকেও 'সূত্র' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

মুদ্রাকর প্রমাদের ফলে তালিকাটির মূল্য অবশ্যই কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাছাড়া তালিকাটি সর্বাংশে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য কিনা—এই প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। পালি ত্রিপিটকে অজিত কেশকম্বলী নামে এক দার্শনিকের কথা আছে। আবার শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ'-তে কম্বলাশ্বতর নামে একজনের উল্লেখ করেছেন। 'কম্বল' ছাড়া দুটি নামের উপাদানে আর কোনো মিল নেই; এবং শুধু এইটুকু মিল থেকে উভয়কে একই ব্যক্তি বলে অনুমান করা কতোটা নিরাপদ, সে-প্রশ্ন অবান্তর নয়। তাছাড়া, পালি গ্রন্থ-বর্ণিত অজিতের মত এবং শান্তরক্ষিত-বর্ণিত কম্বলাশ্বতর-র মত সর্বাংশে সমান কিনা—এ বিষয়েও বিচারের প্রয়োজন আছে। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় উভয়কে—এবং উভয়ের মতকে—ফলত এবং নির্বিচারে অভিন্ন বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতো বিদ্বানের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অবশ্যই কিছুটা বেশি হতে বাধ্য।

পরিশিষ্টটি প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা আছে। জৈন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের লেখা 'ন্যায়কুমুদচন্দ্র', 'প্রমেয়-কমলমার্তণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থেও চার্বাক বা লোকায়ত-মতের দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনা আছে। অতএব পূর্বপক্ষ হিসেবে মতটির বর্ণনাও আছে। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এজাতীয় গ্রন্থ অবজ্ঞা না-করলে পরিশিষ্টটি হয়তো পূর্ণতর হতো।

১৭ ॥ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

তার মানে অবশ্যই এই নয় যে পরিশিষ্টটি মূল্যহীন। তাছাড়া আজকের দিনে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর নাম কোনোমতেই উপেক্ষনীয় হতে পারে না। তাঁর আগে—এবং তাঁর পরেও—অনেকে চার্বাক প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর আলোচনা করলেও অন্য কোন সংস্কৃতবিদ্ তাঁর মতো দীর্ঘদিন ধরে প্রায় একনিষ্ঠভাবে এই অবহেলিত দার্শনিক মতটির

আলোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অন্তত শুধু এই কারণেই চার্বাক/লোকায়ত প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের যে-কোনো গবেষকের কাছে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু, হয়তো আমাদের প্রত্যাশাটা কিছু বেশি। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী যদি নানা নিবন্ধে এবং নানা গ্রন্থে চার্বাক/লোকায়ত প্রসঙ্গে একই সুসম্বদ্ধ মত প্রকাশ করতেন এবং ক্রমশ তারই গভীরে প্রবেশের প্রয়াস করতেন—তাহলে হয়ত আমরা মতটির সারমর্ম বোধে আরো বেশি উপকৃত হতাম।

অবশ্যই চার্বাক নিয়ে নানা মুনির নানা মত ; কিন্তু একই মুনি বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন মত প্রকাশ করলে বিষয়টি আরো বিভ্রান্তিকর হবার আশঙ্কা থাকে। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বস্তুতপক্ষে তাই করেছেন। যেমন, নিবন্ধ-বিশেষে তিনি লোকায়তিক ও কাপালিকাদি সম্প্রদায়কে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন ; অনুমান হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-রচিত 'লোকায়ত' নামে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির প্রভাবই তার কারণ। আবার, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থ প্রকাশের পর তিনি চার্বাকদেরই নানা উপসম্প্রদায়ের উল্লেখ ও বর্ণনা করেছেন—তার মধ্যে একটির আখ্যা দিয়েছেন সর্বপ্রমাণবিরোধী বা তত্ত্বোপপ্লববাদী সম্প্রদায়। এজাতীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্তর মধ্যে সঙ্গতি প্রদর্শনের কোনো প্রয়াসও তাঁর রচনায় স্পষ্ট নয়। সংক্ষেপে : নানা সময়ে নানা রচনায় তিনি চার্বাক/লোকায়ত প্রসঙ্গে যে-সব বিবিধ ও এমনকি পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন তা আমাদের মতো পাঠকের পক্ষে দার্শনিক মতটি বোঝবার পক্ষে বেশ কিছুটা প্রতিকূল।

অবশ্যই তার একটা বড়ো কারণও আছে এবং এই কারণটি উল্লেখ করেই আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। ইতিপূর্বেই বলেছি, কোনো এককালে চার্বাক সম্প্রদায়ের নিজস্ব গ্রন্থ বর্তমান থাকলেও তা যে কোনো কারণেই হোক না কেন বিলুপ্ত হয়েছে। আজকের দিনে চার্বক-আলোচনায় আমাদের কাছে মূল উপাদান বলতে প্রধানত তিন রকম। এক : কিছু প্রামাণিক লোকগাথা। দুই : পূর্বপক্ষ হিসাবে বিরুদ্ধ দার্শনিকদের চার্বাক বা লোকায়ত মত বর্ণন। তিন : 'অর্থশাস্ত্র' জাতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থের সাক্ষ্য। কিন্তু তৃতীয়টির কথা পরে তোলা যাবে।

১৮ ॥ প্রামাণিক লোকগাথা ও পূর্বপক্ষ বর্ণন

প্রথম দ্বিবিধ উপাদানের মধ্যে প্রামাণিক লোকগাথাগুলির গুরুত্ব অবশ্যই তুলনায় বেশি। দীর্ঘ দিন ধরে লোকের মুখেমুখে যে-সব ছড়া চলে আসছে সেগুলি নিয়ে কারচুপির চেষ্টা—বা সেগুলির মূল বিষয়বস্তু অল্পবিস্তর বিকৃত করার সুযোগ বা সম্ভাবনা—স্বভাবতই কম। তাছাড়া, এই লোকগাথাগুলির মধ্যে যুক্তিতর্কের ঘোরপ্যাচ নেই। তার বদলে সাধারণ মানুষের সহজবুদ্ধি এবং বাস্তব ব্যবহারজীবনের মানদণ্ডে প্রসিদ্ধ ধর্মাচরণ ও বিদগ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের বিচার।

আজকের দিনে আমাদের পক্ষে প্রকৃত চার্বাকমতের সারাংশ বোঝবার ব্যাপারে দ্বিতীয় উপাদানটির গুরুত্ব তুলনায় কম। অনেক সময়েই তা অল্প-বিস্তর সংশয়-সাপেক্ষ এবং এই কারণে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পরমত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত মতটি নিয়ে নানা রকম কারচুপির সুযোগ আছে। বিরুদ্ধ মতটির বিকৃত বিবরণ থেকে শুরু করতে পারলে তার খণ্ডন সহজসাধ্য হয়, মতটি নিয়ে হাসিতামাসাও করা যায়। এমনকি অতি-আধুনিক কালে কোনো মতের ব্যাখ্যায় ছাপা বই-এরও যখন প্রায় ছড়াছড়ি তখনো এই কৌশলের ভূরিভূরি নমুনা চোখে পড়ে: ডারউনর-এর মত, মার্কস্-এর মত বা ফ্রয়েড-এর মতকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে মতগুলির বিকৃত বিবরণ বা কদর্য বর্ণন বিরল নয়। সাবেক কালে—বিশেষত যে-পরিস্থিতিতে চার্বাকদের নিজস্ব সাহিত্য যখন বিলুপ্ত হয়েছে—খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত চার্বাক মতের পরিচিতি তাই সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, বিশেষত সাবেকী ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে পরমত খণ্ডনের ব্যাপারে দার্শনিকেরা অনেক সময় ধীরস্থির বিচারের বদলে চরম অশালীনতা প্রদর্শন করতেও দ্বিধা বোধ করেননি—এমনকি বাপ-মা তুলেও গালিগালাজ করেছেন। পরে নমুনা দেখা যাবে। তাই পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত চার্বাক মতের নিদর্শন বহুল হলেও বর্ণনাগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করা মোটেই নিরাপদ নয়।

অর্থাৎ, বিরোধীদের চার্বাক-বর্ণন থেকে চার্বাকমতের সারাংশ নির্ণয় করার সময় অনেকখানি সতর্কতা দরকার। মোটের উপর বলা যায়, আধুনিক বিদ্বানরা প্রায়ই এই সতর্কতার পরিচয় দেননি। চার্বাক বা লোকায়ত প্রসঙ্গে—যা,

সাধারণভাবে বলা যায়, বস্তুবাদ প্রসঙ্গে—বিপক্ষের দার্শনিকেরা যে-যা বলেছেন এবং যতোরকমের গালিগালাজ করেছেন সব কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা প্রায়ই চোখে পড়ে। ফলে মতটির অসারতা বা নিকৃষ্টতা ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আলোচনায় প্রায় সহজ-বুদ্ধিতে পরিণত হবার অবস্থা !

কিন্তু এখানে কয়েকটা কথা আছে। মতটা যদি সত্যিই অমন অসার হতো তাহলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যাঁরা দিক্‌পাল বলে বিবেচিত তাঁদের প্রায় সকলের পক্ষে চার্বাকমতকে খণ্ডন করবার অতো উৎসাহ কেন ? —যেমন মল্লক্ষেত্রে পঙ্গু বা দুর্বলকে অবজ্ঞা করাই মল্লবীরের লক্ষণ। কিন্তু অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে, মতটি কী করে উচ্ছেদ করা যায় বা খণ্ডন করা যায় এ-নিয়ে বিস্তর যুক্তিতর্কর অবতারণা করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকেই প্রমাণ না হলেও অন্তত সন্দেহ হয় যে, মতটি আসলে অমন খেলো নয়।

মাধবাচার্য বলছেন : চার্বাকদের চেষ্টা উচ্ছেদ করা চারটিখানি কথা নয়, কেননা সাধারণের মনে তাদের লোকগাথার মূল কথাগুলোর শেকড় অনেকদূর গজিয়েছে—'যতোদিন বাঁচবে সুখে বাঁচার চেষ্টা করো, মৃত্যুর চোখে কেউই ধুলো দিতে পারে না এবং লাশ পোড়াবার পর তা আবার ফিরবে কী করে ?'

মাধবের এই উক্তি কি ক্ষোভের কথা ? বিদ্রূপের প্রয়াস ? হয়তো দুইই। কিন্তু মোদ্দা কথাটা খাঁটি বলেই মনে হয় : চার্বাকদের চেষ্টা উচ্ছেদ করা চারটিখানি কথা নয়। সাধারণ লোকের মনে কথাগুলোর শেকড় অনেকদূর গজিয়েছে।

কিন্তু কী করে গজালো ? যাতে না গজায় তার জন্যে দেশের আইন-কর্তাদের থেকে শুরু করে দিগ্‌গজ দার্শনিক পর্যন্ত তো অনেক চেষ্টা করেছেন —অনেক রকম ভয় দেখিয়েছেন, তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্কর অস্ত্র দিয়ে মতটাকে টুকরো-টুকরো করবার চেষ্টা করেছেন।

আইনকর্তাদের চোখ রাঙানির কথা পরে তুলবো। তাঁদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে গেলে সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতির—দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির—কী দশা হতো তার আলোচনা কিছুটা বিস্তৃত হবে। আপাতত শুধু দর্শনের আলোচনায় ফেরা যাক।

মাধবাচার্য আমাদের বোঝাতে চান যে, মানুষের সহজাত সুখপ্রবৃত্তিই চার্বাক-

দর্শনের শক্তির একমাত্র উৎস। কথাটা মেনে নিলে আরো মানা দরকার যে পরকাল, পরলোক প্রভৃতির পক্ষে অজস্র দার্শনিকের প্রবল প্রচারও নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু মাধবাচার্যর মন্তব্যটি প্রসঙ্গেই সন্দেহের অবকাশ আছে। পক্ষান্তরে আর একটা সম্ভাবনা থাকে। চার্বাকমত উচ্ছেদ করা সহজ কথা নয়—মাধবাচার্যের এই মন্তব্য স্বীকার্য হলেও তার আসল কারণ মতটির স্বকীয় প্রাণশক্তি। অর্থাৎ, চার্বাক-বিরোধীরা যতো ভাবেই এই মত খণ্ডন করার চেষ্টা করুন না কেন, নিছক দার্শনিক বিচারের দিক থেকে মতটা খণ্ডন করা সহজ কথা নয়, কেননা তার দার্শনিক ভিত্তি সত্যিই অনেক মজবুত।

কিন্তু এ-জাতীয় কোনো কথা বলতে গেলে আবার সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে আসতে হয়: চার্বাকমতের স্বরূপ আমরা জানবো কেমন করে? তার দার্শনিক ভিত্তি সনাক্ত করার উপায়টা কী? বর্তমানে এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্বল বলতে তো অত্যন্ত সীমিত উপাদান: প্রধানতই কিছু লোকগাথা এবং নানান দার্শনিকের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাকমতের উল্লেখ। লোকগাথাগুলিকে প্রামাণিক বলে মেনে নিলেও শুধুমাত্র তার নজির থেকে দার্শনিক মত হিসাবে চার্বাকের মর্যাদা খুব একটা বড়ো কিছু নয়। এগুলির মূল ঝোঁক রকমারি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসাদির বিরুদ্ধে শ্লেষ। সেই শ্লেষ তীব্র হলেও কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে পর্যাপ্ত হতে পারে কি? দ্বিতীয়ত, আমরা বারবার বলেছি, মতটির পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণনার উপর সর্বাংশে নির্ভর করা নিরাপদ নয়; তার মধ্যে বরং রকমারি কারসাজি থাকারই সম্ভাবনা। তাহলে আসল প্রশ্নটারই তো উত্তর পাওয়া গেলো না! চার্বাকমত বলতে আসলে কী? এই প্রশ্নর মীমাংসা না-হলে মতটির স্বকীয় মর্যাদা বা তার মজবুত ভিত্তির পক্ষে আলোচনার প্রসঙ্গটাই অবান্তর হয় না কি?

উত্তরে বলবো, অনেক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এবং আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে চার্বাক প্রসঙ্গে রকমারি—বহু ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী—উপকরণ সত্ত্বেও চার্বাক-মতের মূল কথাগুলি সনাক্ত করা অসম্ভব নয়। উদ্ধৃত প্রামাণিক লোকগাথায় যুক্তিমূলক আলোচনা না থাকলেও এবং বিরুদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত চার্বাকমতের বর্ণনায় নানা স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি থাকলেও তা থেকেও বিচারমূলক—এবং অনেক সময় তুলনামূলক—পদ্ধতি অবলম্বন করে মতটির নানা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। তবে, সোজা কথায়, পূর্বপক্ষ

হিসেবে চার্বাকমতের বর্ণনাগুলি থেকে মতটির সারসংগ্রহ করতে হলে বিচারের কুলো দিয়ে বেশ কিছুটা ঝেড়ে নিতে হয়।

প্রথমে, অধুনালব্ধ চার্বাকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলির কথাই ধরা যাক। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সেগুলির মূল কথা প্রধানতই নেতিবাচক : অন্যান্য দার্শনিকেরা—এমনকি প্রসিদ্ধ দার্শনিকেরাও—যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার অনেক কথাই নস্যাৎ করার আয়োজন।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, লোকগাথাগুলি থেকেই চার্বাকদের কোনো নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্বের বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরলোক বা পরকাল মানি না ; অর্থাৎ, ইহলোকই একমাত্র সত্য। দেহাতিরিক্ত আত্মা মানি না ; অর্থাৎ দেহই আত্মা—দেহাত্মবাদ। সোজা কথায়, লোকগাথাগুলিতে পরমত খণ্ডনের উল্টো পিঠে স্বমত সমর্থনের পরিচয় বর্তমান। লোকগাথাগুলির প্রধান ঝোঁক পরমত খণ্ডন হলেও, সেগুলির মূলে স্বমত সমর্থনের আয়োজন। তাই লোকগাথাগুলি থেকেই চার্বাকদের স্বমতও অনুমেয়।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ দার্শনিকদের রচনাতেও স্বমত সমর্থনের উদ্দেশ্যে পরমত খণ্ডনের ঐকান্তিক প্রয়োজন স্বীকৃত। অতএব চার্বাকদের লোকগাথাগুলির প্রধান ঝোঁক পরমত খণ্ডন বলেই এগুলি থেকে তাঁদের স্বীয় মতের কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না—এমন কথা কল্পনা করা নিরর্থক।

তাহলে, বিদগ্ধ দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে লোকগাথাগুলির আসল পার্থক্যটা কী? পরমত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বিদগ্ধ দার্শনিকেরা বিস্তৃত যুক্তিতর্কের অবতারণা বা যুক্তিজাল বিস্তারের প্রস্তাব করেছেন। লোকগাথাগুলিতে তার পরিচয় নেই। তার বদলে এগুলিতে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসার ব্যবহার।

কিন্তু যুক্তিজাল বিস্তারের আয়োজন নেই বলেই এজাতীয় খণ্ডনপদ্ধতি যুক্তিহীন—অতএব দার্শনিক মর্যাদার দিক থেকে অবান্তর—বলে বিবেচনা করারও কোনো কারণ নেই। প্রচলিত অর্থে বিচার-বিশ্লেষণের আয়োজন না-থাকলেও লোকগাথাগুলি অবশ্যই যুক্তিশূন্য নয়। পক্ষান্তরে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হিসাবে প্রকাশিত হলেও এগুলির ভিত্তিতে যুক্তির পরিচয় অবশ্যই বর্তমান।

ভারতীয় প্রমাণ-শাস্ত্র-সম্মত পরিভাষায় লোকগাথার অন্তর্নিহিত যুক্তির অনুবাদও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ঘরে বসে শ্রাদ্ধ পিণ্ড দিলেই যদি স্বর্গগত ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তাহলে গ্রামান্তরগামীর পক্ষে আর চাল-চিঁড়ের পুটলি বওয়া কেন; আত্মীয়স্বজনেরা ঘরে বসে পিণ্ডি দিলেই তো তার পেট ভরবার কথা। প্রমাণ-বিদ্যার পরিভাষায় যুক্তিটার তর্জমা করে বলা যায়: "স্থানান্তরে স্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় গৃহে প্রদত্ত অন্নে, যেমন পরলোকগত ব্যক্তির। বিদেশস্থ দেবদত্তও স্থানান্তরে স্থিত। সুতরাং গৃহে প্রদত্ত অন্নে তার তৃপ্তি হোক।"

প্রসঙ্গত এখানে একটি মন্তব্যের প্রলোভন হয়, যদিও অধুনালভ্য কোনো লোকায়তিক লোকগাথায় তার উল্লেখ চোখে পড়েনি। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিণ্ড পার্থিব খাদ্যদ্রব্য; তা থেকে তৃপ্তি বা পুষ্টিলাভের জন্য দেহস্থ পাকযন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু পরলোকগত আত্মার কথা স্বীকার করলেও সেই আত্মার পাকযন্ত্র ও খাদ্যাদি চর্বন প্রভৃতির জন্য অত্যাবশ্যক দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পনা করা দুঃসাধ্য। আত্মবাদীরা শ্রাদ্ধপিণ্ডদানের সমর্থনে কি এমন কথা কল্পনা করবেন যে পরলোকে যাবার সময় দেহমুক্ত আত্মাটি পাকযন্ত্র প্রভৃতি দৈহিক অবয়বগুলি সঙ্গে নিয়ে যান? কিংবা, পাকযন্ত্র প্রভৃতি ব্যতিরেকেও পিণ্ডে প্রদত্ত অন্নাদি থেকে তৃপ্তিলাভ সম্ভব?

স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদেরা এই প্রশ্নর কী উত্তর দেবেন জানি না। আপাতত লোকায়ত-মত পুনর্গঠনের সমস্যায় প্রত্যাবর্তন করা যাক।

চার্বাক বা লোকায়ত মতের সারাংশ সংগ্রহের আর একরকম উপাদান বলতে বিপক্ষ-দার্শনিকদের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে মতটির বর্ণনা। কিন্তু এই উপাদান ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সাধারণভাবেই বলা যায়, পূর্বপক্ষের বর্ণনায় প্রায়ই বাগাড়ম্বরের পরিচয় থাকলেও শুধুমাত্র তার উপর নির্ভর করেই কোনো দার্শনিক মত সনাক্ত করা নিরাপদ নয়; যেমন সম্প্রদায়ান্তরের রচনায় বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মতের যেটুকু পরিচয় শুধু তার উপর নির্ভর করেই বৌদ্ধ বা জৈন মত সনাক্ত করা সম্ভব নয় এবং আধুনিক বিদ্বানরা তা করেনও না।

অবশ্যই চার্বাক প্রসঙ্গে একই কথা বলা যায় না। কেননা বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিস্তৃত রচনাবলী বর্তমানে পাওয়া যায়; কিন্তু চার্বাকদের

লেখা কোনো এককালে বর্তমান থাকলেও আজ তা বিলুপ্ত হয়েছে। তাই পূর্বপক্ষ হিসাবে মতটির বর্ণনার উপর বিশেষ নির্ভর না-করে উপায় নেই। তবে আগেই বলেছি পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত চার্বাকমতকে সনাক্ত করার আগে বিচারের কুলোয় ঝেড়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু বিচারটা কিসের ভিত্তিতে হবে ?

চার্বাক বা লোকায়ত মতের রূপরেখা পুনর্গঠনে আরো কিছু নজির উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য সেগুলির সন্ধানে প্রচলিত অর্থে দার্শনিক সাহিত্যের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকা যায় না।

যেমন 'উপনিষদ্', 'অর্থশাস্ত্র', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'পুরাণ', 'চরক-সংহিতা', 'সুশ্রুত-সংহিতা' প্রভৃতিতে নানা উক্তি পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুপ্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদের উপর আলোকপাত করে। সুপ্রাচীন বস্তুবাদটি কখনো সরাসরি চার্বাক বা লোকায়ত নামেই উক্ত, কখনো নয়। কিন্তু বস্তুবাদই চার্বাক দর্শনের প্রাণবস্তু ; তাই চার্বাক নামে উল্লিখিত না-হলেও বস্তুবাদের যে-কোনো নিদর্শনকে অন্তত চার্বাকমতের সমগোত্রীয় বলে বিবেচনা করায় বাধা নেই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। ধর্মশাস্ত্রকাররাই আমাদের দেশের আইনকর্তা ছিলেন। অবশ্য 'অর্থশাস্ত্র' এই কথার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, 'অর্থশাস্ত্র'-র পঠন-পাঠন এদেশে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিলো। বিংশ শতকের প্রথম দশকে গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হবার পর অবশ্য আধুনিক বিদ্বানরা তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্রই ভারতীয় আইনের একমাত্র আকর ; এবং 'অর্থশাস্ত্র' আবিষ্কারের পরেও ভারতীয় আইনকানুনের ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রর প্রতিপত্তি খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হয়নি।

মূলত আইনকানুনের বই হলেও ধর্মশাস্ত্রকারেরা দার্শনিক মতের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। দেশশাসনের ব্যাপারে দেশের লোকের আচরণ-বিধি বেঁধে দেবার সময় তাঁরা চিন্তা-বিধিও বেঁধে দেবার উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। আইনকর্তারা অবশ্যই শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাই তাঁদের মন্তব্য থেকে চার্বাকের—এবং সাধারণভাবে বস্তুবাদী দর্শনের—প্রতি দেশের শাসক সম্প্রদায়ের মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

ব্যাপারটা শুধু এইটুকু হলে আমাদের বর্তমান আলোচনা হয়তো এখানেই

ঢুকে যেতো। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকারদের প্রবল প্রতিপত্তির পরিণাম সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী। এখানে শুধু দার্শনিক মতের ক্ষেত্রে এই পরিণাম আলোচনার সুযোগ আছে।

দৃষ্টান্ত-বিশেষে দেখবো, দার্শনিকেরা চার্বাক মতের সারাংশ—কখনো বা খুবই চার্বাক-ঘেঁষা সিদ্ধান্ত—স্বীকার করেও চার্বাক ও লোকায়তর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলেও তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই ছিলো। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, সেই কারণ আসলে আইনকর্তাদের চোখ-রাঙানির আতঙ্ক। এই আতঙ্কে দার্শনিক-বিশেষ যে-কথা সত্যিই মেনেছেন সেই কথাও সরাসরি লিপিবদ্ধ করতে সাহস পাননি; এমনকি যে-কথা সত্যিই মানেননি সে কথা মানবারও ভাণ করেছেন। ফলে দার্শনিক মতামতের উপর ধর্মশাস্ত্রকারদের হস্তক্ষেপ সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনের প্রকৃত পরিস্থিতি বোঝবার পক্ষে অন্তরায় হয়েছে এবং বিশেষ করে চার্বাকমতের সারাংশ নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই বাধা অতিক্রম করতে পারলে আমরা দেখবো, মতটা প্রায়ই যতো খেলো বলে প্রচার করা হয় আসলে তা নয়। যে-নামেই প্রাচীন বস্তুবাদটি পরিচিত হোক না কেন, তার গুরুত্ব কম নয়; এমনকি ভারতীয় ইতিহাসে বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদী দর্শন থেকেই বহুলাংশে প্রকৃত প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ

১॥ মরার আগেই মহানরক

শাস্ত্রমতে নরক একরকমের নয়। নানা রকম। শুধু 'মনুস্মৃতি'-তেই (৪।৮৮-৯০) একুশ রকম নরকের ফর্দ আছে। টীকাকার কুল্লূকভট্ট বলছেন, রকমারি নরকের আরো বিস্তৃত বিবরণের জন্যে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু তার বোধহয় দরকার নেই। 'মনুস্মৃতি'-র ফর্দ থেকেই বোঝা যায় সম্ভব-অসম্ভব রকমারি পার্থিব যন্ত্রণার বিবরণই নরক-কল্পনার মূল উপাদান: কোথাও শুধু অনন্ত অন্ধকার, কোথাও আগুনে পোড়াবার আয়োজন, কোথাও কাকে মাংস খুবলে খাচ্ছে, কোথাও একবার করে আছড়ে মেরে আবার বাঁচিয়ে আবার আছড়ে মারা—ধোবিপাট দেবার মতো। এই রকম, আরো অনেক রকম। ভাবতে ভাবতে ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে যাবার উপক্রম!

এতো রকম নরকের মধ্যে একটির নাম মহানরক। সেখানে সমস্ত রকম যন্ত্রণার সমাবেশ।

বাচস্পতি মিশ্র ('ভামতী' ৩।৩।৫৪) বলছেন, এ-হেন মহানরকেই নাস্তিক চার্বাকের স্থান। অবশ্য সাধারণত মরবার পরে নরকে যাবার কথা। কিন্তু চার্বাকের অবস্থা তা নয়। মহানরকবাসের জন্যে তার মরবারও দরকার পড়ে না, জীবদ্দশাতেই ঐ নরকবাস। কেননা, চার্বাকের এমনই মত যে তা মানলে মহানরকের যন্ত্রণা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু কী এমন মত যা মানলে জীবদ্দশাতেই এ-হেন যন্ত্রণা? বাচস্পতি বলছেন, চার্বাক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণই মানে না। তাই তার

অবস্থা জানোয়ারেরও বেহদ্দ। জানোয়ারেরাও হিত-প্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের ব্যাপারটা বোঝে, কিন্তু বুঝতে গেলে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, জানোয়ারেরাও হিতপ্রাপ্তির জন্যে কোমল ঘাসের ক্ষেত্রে বিচরণ করে; অহিত পরিহারের জন্যে শুকনো কাঁটার জঙ্গল এড়িয়ে যায়। নিছক প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করে এজাতীয় ব্যবহার সম্ভব নয় : হিতপ্রাপ্তির ও অহিত-পরিহারের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জন্যে অনুমানের উপর নির্ভরতা প্রয়োজন। কিন্তু চার্বাক অনুমান বলে কোনো প্রমাণই মানে না ; পশুর ব্যবহারের মধ্যে যেটুকু অনুমানের আয়োজন তাও নয়। তাছাড়া, চার্বাকের পক্ষে তো বেবাক বোবা হয়ে থাকবার কথা, কেননা অপরকে কিছু বলতে গেলে শব্দ ব্যবহার প্রয়োজন এবং শব্দ প্রত্যক্ষ হলেও শব্দ থেকে শব্দবোধ্য পদার্থ অনুমানসাপেক্ষ। অতএব চার্বাক জন্মান্তরের কথা উড়িয়ে দিতে গেলেও ইহজন্মেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নিশ্চেষ্ট এবং মূক অবস্থায় মহানরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য।

বাচস্পতি মিশ্রর মন্তব্য থেকে শুরু করেছি। তার একটা বিশেষ কারণ আছে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তিনি যেসেতেসে লোক নন ; দার্শনিক হিসেবে দিক্‌পাল-বিশেষ। নানা প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায় তাঁর গ্রন্থ প্রামাণ্য বলেই স্বীকৃত। কিন্তু অমন বিদগ্ধ চিন্তাশীলও চার্বাককে গাল দেবার সময় চিন্তাচেতনার বালাই যেন একেবারে চুকিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক অবশ্যই বলতে চান যে, চার্বাক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানেন না ; অতএব চার্বাকের কাছে অনুমানও প্রমাণ নয়। কিন্তু তাই বলে পশু-ব্যবহারের মধ্যেও যতোটুকু অনুমানের পরিচয় চার্বাক ততোটুকুও মানেন না—অতএব ইহলোকেই তার কপালে মহানরকের যন্ত্রণা—এমনতরো একটা কথায় কান দেবার একেবারে কোনো কারণই নেই। চার্বাকের নিন্দা—বিশেষত তার প্রত্যক্ষপরায়ণতার বিবরণ—অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত করুন ; কিন্তু তারও একটা সীমা মানবেন না? বাচস্পতির মতো দার্শনিকও তার পরোয়া করেন নি। অথচ চার্বাকের বিরুদ্ধে একটা প্রচলিত অভিযোগ এই যে সুখাদ্যের প্রতি তার অত্যন্ত অভিরুচি। তাই কচি ঘাস দেখে ছাগলেও তার প্রতি আকৃষ্ট হবার জন্যে যতোটুকু অনুমান-পরায়ণতার পরিচয় দেয়, চার্বাকের মধ্যে তারও অভাব—এমনতরো অসম্ভব উক্তি দার্শনিক প্রতিভা তো দূরের কথা, সামান্যতম সততারও পরিচায়ক নয়।

২॥ মাধবাচার্য ও চার্বাকের অনুমান খণ্ডন

বাচস্পতির উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত নিদর্শন হিসাবে মাধবাচার্যর রচনা উল্লেখ করা যায়। মাধবাচার্যও বলতে চান যে, চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানেন; অতএব তাঁদের মতে অনুমানের প্রামাণ্য নেই, বা সোজা কথায়, অনুমান বলে কোনো প্রমাণ হয় না। কিন্তু বাচস্পতির সঙ্গে মাধবাচার্যর কায়দাটায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাচস্পতি বলেছেন, চার্বাকেরা এমনই হাবাগোবা যে জানোয়ারেরও বেহদ্দ। পক্ষান্তরে মাধব চার্বাকদের অনুমান-বর্জনের বর্ণনায় অত্যন্ত কূটতর্কের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে এই কূটতর্কের কিছুটা পরিচয় দেখা যাক; তারপর ভেবে দেখতে হবে, চার্বাকদের পক্ষে অমন কূটতর্কের প্রবণতা একান্তই সম্ভব কিনা।

চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডন হিসাবে মাধবাচার্য যে কূটকচালের অবতারণা করেছেন, তার পরিচয় দিতে গেলে ভারতীয় প্রমাণবিত্থার কিছু পারিভাষিক শব্দ থেকে শুরু না-করে উপায় নেই। সাধ্যমতো সহজে এখানে তার চেষ্টা করা যাক।

অনুমানের সবচেয়ে প্রচলিত দৃষ্টান্ত হলো: পাহাড়ে ধুঁয়ো দেখে জানা গেলো ওখানে আগুন আছে। আগুনটা জানলাম অনুমান করে।' এই অনুমানে তিনটি পদ আছে: ধুম, অগ্নি, পর্বত। ভারতীয় পরিভাষায়—

'ধুম' হলো 'হেতু' বা 'লিঙ্গ'
'অগ্নি' হলে 'সাধ্য'
'পর্বত' হল 'পক্ষ'।

কিন্তু ধুম (হেতু) থেকে পর্বতে (পক্ষতে) অগ্নির (সাধ্যর) অনুমান করা গেলো কী করে? কেননা, হেতুর (ধুমের) সঙ্গে সাধ্যর (অগ্নির) নিয়ত-সম্বন্ধ জানা আছে এবং তার কোনো ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম জানা নেই: যেখানেই ধুম সেখানেই আগুন, যেমন রান্নার চুল্লিতে; এবং জলাশয় প্রভৃতি অগ্নিহীন স্থানে ধুম কখনো দেখা যায় না। 'হেতু'র সঙ্গে 'সাধ্য'র এই নিয়ত এবং অব্যভিচারী সম্বন্ধকে 'ব্যাপ্তি' বলে। অতএব 'ব্যাপ্তি'র ভিত্তিতেই অনুমান সম্ভব; 'ব্যাপ্তি' সম্ভব না-হলে অনুমানও অসম্ভব হবে।

মাধবাচার্য বলছেন, চার্বাক-মতে 'ব্যাপ্তি' প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব, অতএব অনুমানও সম্ভব নয়। 'ব্যাপ্তি' অসম্ভব কেন? কেননা, 'ব্যাপ্তি' স্থাপনের

জন্যে সমস্ত 'উপাধি'র সম্ভাবনা দূর করা দরকার। কিন্তু উপাধি মানে কী? মোটের উপর বলা যায় ইংরেজিতে আমরা সাধারণত যাকে বলি কণ্ডিশন, *condition*। যেমন: আগুন থাকলেই যদি ধুঁয়ো থাকতো তাহলে তো তপ্ত লৌহপিণ্ডেও ধুঁয়ো থাকার কথা! ভিজে কাঠে আগুন ধরালে ধুঁয়ো থাকে। অতএব ভিজে কাঠ এই দৃষ্টান্তে হবে উপাধি। মাধব আরো বলছেন, চার্বাক-মতে উপাধি আবার দু'রকম: 'নিশ্চিত' ও 'শংকিত'। ভিজে কাঠ বলে উপাধিটি নিশ্চিত, কেননা তা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এমন উপাধি তো থাকতে পারে যার খবর আমাদের জানা নেই। তাকে বলবো, শংকিত উপাধি। এই দু'রকম সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর হলে পরই 'হেতু' এবং 'সাধ্য'র নিয়ত-সহচার ও ব্যভিচারের-অভাব থেকে ব্যাপ্তি সুনিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত ও শংকিত সমস্ত রকম উপাধির সম্ভাবনা দূর করার কোনো উপায়ই সম্ভব নয়। অতএব, ব্যাপ্তিও সম্ভব নয়, এবং ব্যাপ্তি সম্ভব নয় বলেই অনুমানও অসম্ভব।

ব্যাপ্তি স্থাপন করা—বিশেষত নিশ্চিত ও শংকিত সমস্ত রকম উপাধির সম্ভাবনা দূর করে তা স্থাপনা করা—কেন একান্তই অসম্ভব, মাধবাচার্যর মতে চার্বাকরা নাকি তাই নিয়ে অনেক কূটতর্কের অবতারণা করে থাকেন। বর্তমানে আমাদের পক্ষে তার জটিলতায় প্রবেশ করার সুযোগ নেই। দরকারও নেই। তার বদলে আমাদের প্রশ্ন শুধু একটাই: মাধবাচার্য চার্বাকদের মুখে এই রকম কঠিন ও জটিল যুক্তিজাল বসিয়ে দিলেও বাস্তব ইতিহাসের দিক থেকে তা কতোটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? কিংবা, যা একই কথা, পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাক মত বর্ণনা করতে গিয়ে বাচস্পতি মিশ্র চার্বাককে পশুর চেয়ে যুক্তিহীন বলে যে-অতিশয়োক্তি করেছেন সেই চার্বাককেই মাধবাচার্য জটিল ও কঠিন যুক্তিবিশারদ বলে বর্ণনা করে আরো একরকম উল্টো অতিশয়োক্তি করেছেন কিনা—এ প্রশ্ন অবান্তর নয়।

চার্বাকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি থেকে বরং মনে হয়, তাঁরা কূট তার্কিকও ছিলেন না, আবার একান্ত যুক্তিহীন অর্থে জানোয়ারেরও অধম ছিলেন না। তার বদলে হয়তো সাধারণ মানুষের বোধগম্য সাদামাটা যুক্তি দিয়ে সম্প্রদায়ান্তরের নানা মতামত নিয়ে হাসিতামাসা করেছেন। যজ্ঞে নিহত পশু যদি সোজা স্বর্গে যায় তাহলে নিজের পিতাকে স্বর্গে পাঠাবার অমন সোজা

পথ থেকে বঞ্চিত করা কেন? কথাটা যুক্তিহীন নয়; আবার শংকিত ও নিশ্চিত উপাধি বর্জন করে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার অসম্ভাবনার মতো যুক্তিতর্কের কূটকচালও নয়।

প্রসঙ্গত এখানে আর একটা কথা বলে রাখা যায়। চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডন হিসাবে মাধবাচার্য যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তা অন্তত অনেকাংশে মাধবাচার্যর নিজের সম্প্রদায়-উদ্ভাবিত বলে সন্দেহ করারও কারণ আছে। মাধবাচার্য ছিলেন অদ্বৈত বেদান্ত মতের অতি-নিষ্ঠ অনুগামী। অদ্বৈত-বেদান্ত মতে শ্রুতি (বা বেদান্ত) ছাড়া আর কোনো প্রমাণই সম্ভব নয়। তাই স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁর 'ব্রহ্ম-সূত্র'-ভাষ্যের ভূমিকাতেই ঘোষণা করেছেন যে সর্বপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের ভিত্তি বলতে আসলে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে শ্রীহর্ষর কূটতর্কে পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। এবং তিনি মাধবাচার্যর পূর্বেই অদ্বৈতমতকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' নামে গ্রন্থে সব রকম প্রমাণ খণ্ডনের আয়োজন করেছেন। শ্রীহর্ষ কূটতর্কে পারদর্শী ছিলেন বলেই সর্বপ্রকার প্রমাণ বলতে তাঁর কাছে বিশেষত অনুমান প্রমাণ। শ্রীহর্ষের বইতে তাই অনুমান খণ্ডনের বিশদ আয়োজন। তার জন্যে যথেষ্ট যুক্তিতর্কও। যুক্তিতর্কগুলি খুবই বিদগ্ধ, সহজবোধ্য নয়। তারই জের টেনে শ্রীহর্ষর ব্যাখ্যা-কারেরা তর্কজাল আরো জটিল করেছেন। এইসব বই থেকেই মাধবাচার্য অনুমান-খণ্ডনের অতি-বিদগ্ধ বিচার চয়ন করে চার্বাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন কিনা, যোগ্যতর বিদ্বানরা তা অনুসন্ধান করতে পারেন। সে অনুসন্ধান হয়তো নিষ্ফল হবে না। কিংবা, সবিনয়ে বললে হয়তো বলা উচিত, মাধবাচার্যর লেখার কায়দাটা মনে রাখতে হবে। বিপক্ষ-বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যেন সাময়িকভাবে বিপক্ষ অবলম্বন করেছেন: তিনি নিজে যদি চার্বাক-মতানুগামী হতেন তাহলে কোন্ ধরণের বিচার করে ঐ বিপক্ষ সমর্থন করতেন তারই পরিচয় দিয়েছেন। চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডনের বর্ণনায় এই পদ্ধতির অনুসরণ বেশ কিছুটা সুবিধাজনক হবার কথা। কেননা, তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের প্রবক্তারাই অনুমান-খণ্ডনে বিশেষ পারদর্শিতার নজির দেখিয়েছেন। তা অনুসরণ করে অনুমান-খণ্ডনের অতি-বিদগ্ধ বর্ণনা রচনা করা সহজ ব্যাপার।

মাধবাচার্য ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন কিনা—এই প্রশ্ন নিয়ে অবশ্যই বিবাদের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু অন্তত আপাতদৃষ্টিতে মাধবাচার্যর

চার্বাক-বর্ণনায় বেশ কিছুটা অসংগতি চোখে পড়ে। একদিকে তিনি বলছেন, চার্বাকেরই নামান্তর হিসেবে লোকায়ত শব্দটি বেশ জুৎসই, কেননা হাজার হোক এই দর্শন ইতর জনগণেরই দর্শন। তাদেরই মনে ধরবার মতো কথা। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, ইতর জনগণ তো শিক্ষাদীক্ষার সামান্য সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। তাই এই ইতর জনগণই নিশ্চিত ও শংকিত উভয় প্রকার উপাধি বর্জন করে ব্যাপ্তি নিশ্চয় নিয়ে অতি-বিদগ্ধ আলোচনার অবতারণা করতে পারে— এ-হেন কথা কষ্টকল্পনার পক্ষেও দুঃসাধ্য। সংক্ষেপে চার্বাকেরা যে সত্যিই অমন ফলাও করে অনুমান মাত্ররই অসারতা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, এ-হেন কথা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। আমরা পরে দেখবো, চার্বাকেরা একেবারে কোনো রকম অনুমানই মানতেন না—এমনকি এজাতীয় কথা খুব জোর করে বলায় অনেক বড়ো বাধা আছে। বরং অন্যান্য নজির থেকে মনে হয়, আত্মা পরলোক ইত্যাদি একান্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষ-গোচর বিষয়ে সাধারণ বা লৌকিক অনুমান মানবার ব্যাপারে তাঁদের মতে কোনো বাধা ছিলো না।

৩॥ হরিভদ্র ও চার্বাকের অনুমান-খণ্ডন

অতএব চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডন বিষয়ে মাধবাচার্যর বর্ণনা সংশয়-সাপেক্ষ। অন্যান্য দার্শনিকদের রচনাতে তাই চার্বাকের অনুমান-খণ্ডন সংক্রান্ত অমন বিস্তৃত, বিদগ্ধ ও যুক্তিকণ্টকিত আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তার বদলে, চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডনের উদ্দেশ্য এবং উপায়—উভয়েরই অনেকটা সাদামাটা ও সহজবোধ্য পরিচয় পাওয়া যায়। নমুনা হিসেবে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরির লেখা 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'—এবং তার ব্যাখ্যাকারদের উক্তি প্রাসঙ্গিক হবে।

হরিভদ্রর বই শ্লোকে লেখা। চার্বাক-বর্ণনায় লেখা শ্লোকের মধ্যে লোকায়তিক লোকগাথা বা তার কিছু অংশ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা হোক আর নাই হোক, শ্লোকগুলি সহজ ও প্রাঞ্জল, যদিও হরিভদ্রর রচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে এগুলির বিশদার্থ বোঝার জন্য তাঁর ব্যাখ্যাকার মণিভদ্র এবং গুণরত্নর লেখার উপর নির্ভর করা দরকার।

হরিভদ্র বলছেন,

> লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবো ন নির্বৃতিঃ।
> ধর্মাধর্মৌ ন বিদ্যেতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ ॥
> এতাবানেব লোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ।
> ভদ্রে! বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ ॥

অর্থাৎ, লোকায়তরা বলেন: দেবতা বলে কিছু নেই, মোক্ষ বলেও নয়। ধর্ম ও অধর্ম বলে কিছু হয় না, পুণ্য ও পাপের ফল বলেও নয়। যতোটুকু ইন্দ্রিয়-গোচর ততোটুকুই ইহলোক (অতএব সত্য)। হে ভদ্রে! নেকড়ের পায়ের চিহ্ন দেখো এবং তা থেকে মহাপণ্ডিতেরাও কী বলেন (ভেবে দেখো)।

শেষোক্ত উক্তি—'ভদ্রে! বৃকপদং পশ্য', ইত্যাদি—খুব সাঁটে লেখা। গুণরত্ন তাৎপর্যটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বলছেন:

"এই বিষয়ে চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গল্প চালু আছে। জনৈক ব্যক্তি নাস্তিকমতের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন আস্তিক মতে বিশ্বাসী। লোকটি নানা যুক্তি দিয়ে স্ত্রীকে নিজমতের প্রতি টানবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুক্তি দিয়ে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে লোকটি এক মতলব আঁটলেন। গভীর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি নগরের বাইরে গেলেন এবং বললেন, 'এই নগরে তো পরোক্ষ জ্ঞানের সমর্থক অনেক বড়োবড়ো পণ্ডিত আছেন। কিন্তু তাঁদের বুদ্ধির দৌড় তোমাকে দেখাবো।' এই বলে নগরদ্বার থেকে শুরু করে চৌমাথা পর্যন্ত ধুলোর মধ্যে নেকড়ের পায়ের ছাপ এঁকে ফিরলেন। পরদিন সকালে আস্তিক মহাপণ্ডিতেরা মিলিত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন: 'নিশ্চয়ই নগরে নেকড়ে বাঘ এসেছিলো, নইলে পায়ের ছাপ পড়লো কী করে?' তখন তাদের দেখিয়ে নাস্তিক তার স্ত্রীকে বললেন: 'এঁরা আসল কথা না-জেনেও সবাই মিলে একই সিদ্ধান্ত করছেন! স্বর্গ ইত্যাদি বিষয়েও এঁরা একই রকম আচরণ করেন। নিজেদের মতের সমর্থনে কিঞ্চিৎ অনুমান বা আগম উল্লেখ করে স্বর্গ প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে সাধারণ লোককে ঠকান। সুতারাং এঁদের কথা স্বীকার করবার কোনো কারণ নেই।' ফলে স্ত্রী স্বামীর মত মেনে নিলেন।"

মানতেই হবে, গল্পটা বেশ মজাদার। পাণ্ডিত্যের কোনো জাঁকজমক

নেই, কূট যুক্তি অবতারণার কোনো প্রয়াস নেই, তবুও একরকম যেন পরীক্ষা-মূলকভাবে সরাসরি দেখিয়ে দেওয়া গেলো যে মহাপণ্ডিতেরাও অনুমান, শাস্ত্র প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে যে-সব কথা বলেন তা আসলে অসার। এ-জাতীয় গল্প চার্বাকদের মধ্যে চালু থাকার সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না, কেননা গল্পটার সঙ্গে তাদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলির মূল প্রবণতার বেশ মিল আছে।

কিন্তু এমনকি বহুশ্রুত ব্যক্তিরাও অনুমান, আগম প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে প্রত্যক্ষগোচর ইহলোকের বদলে অপ্রত্যক্ষ পরলোকের প্রতি কেন সাধারণ লোককে মনোযোগী করতে চান? উত্তরে চার্বাক কী বলবেন তা হরিভদ্রর অপর ব্যাখ্যাকার মণিভদ্র মোটের উপর বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করেছেন।

তাঁর মতে চার্বাক বলবেন: "তবু যে-সব বাচাল ব্যক্তিরা শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বীকারে বিরত না হয়ে অনুমান, শাস্ত্র ইত্যাদির প্রমাণ দেখিয়ে বলেন যে, পুণ্য ও পাপের ফলে স্বর্গসুখ ও নরকদুঃখ ঘটে, তাদের উদ্দেশ্যে (চার্বাক) বলছেন—ভদ্রে, নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখো। (তাৎপর্য এই যে) জনৈক ব্যক্তির বউ নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখবার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলো। ঐ ব্যক্তি ধুলোর উপর আঙুল দিয়ে নেকড়ের পায়ের ছাপ এঁকে বললো: ভদ্রে, বৃকপাদ দেখো। (বক্তব্য এই যে) যেমন ঐ ব্যক্তি তার মুগ্ধ পত্নীর বৃকপাদ দেখার আগ্রহ প্রকৃত বৃকপাদ না-দেখিয়ে শুধুমাত্র নিজের আঙুল দিয়ে আঁকা ছবি দেখিয়ে অপরকে প্রবঞ্চনা করতে পারে তেমনি দক্ষ, কপট-ধার্মিক ব্যক্তিরাও কিছু কিছু অনুমান, শাস্ত্র প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে সাধারণ লোকের মনে স্বর্গসুখ ইত্যাদির প্রলোভন জাগিয়ে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, গ্রাহ্য-ত্যাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সংকটে ঠেলে দেয় এবং ধর্মের প্রতি অন্ধ মোহ সঞ্চার করে। পরমার্থতত্ত্ব-বেত্তা বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা এইভাবেই (প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান, শাস্ত্র, প্রভৃতি) প্রমাণের দোহাই দেখিয়ে থাকে।"

প্রাচীনকালের বস্তুবাদী হলেও চার্বাকদের এ-জাতীয় বক্তব্যর সঙ্গে অতি-আধুনিক বস্তুবাদীরও বক্তব্যে বেশ কিছুটা মিল আছে। তাছাড়া এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জৈন দার্শনিক-

দের উক্তিগুলি থেকে মনে হয় চার্বাকদের বিশেষ আস্থা প্রত্যক্ষর উপর এবং তাঁরা অনুমান প্রমাণের বিরোধী, কেননা অনুমানের দোহাই দিয়ে অনেকে অপ্রত্যক্ষ পরলোকাদির—অতএব ধর্মাধর্ম ও পাপপুণ্যর—কথা বলে থাকে। কিন্তু তাঁরা ঐকান্তিক অর্থে অনুমান-বিরোধী কিনা—সে-কথা জৈন দার্শনিকদের রচনায় উল্লিখিত হয় নি। অর্থাৎ পরলোকের প্রমাণে অনুমানের বিরোধিতা করলেও চার্বাক প্রত্যক্ষগোচর ইহলোক প্রসঙ্গেও অনুমান অগ্রাহ্য করতেন—এমন কোনো কথা হরিভদ্র ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের রচনায় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ইহলোক-সর্বস্ব দার্শনিকের পক্ষে ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমান মানায় অন্তত কোনো অনিবার্য বাধা থাকার কথা নয়। অবশ্যই, নেকড়ের পায়ের ছাপ থেকে নেকড়ের আগমন ইহলৌকিক বিষয়েরই অনুমান। কিন্তু আলোচ্য উপাখ্যানে দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, যে-কোনো অনুমানের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। বস্তুতপক্ষে, আঙুলে আঁকা নেকড়ের পায়ের ছাপ সযত্নে পরীক্ষা করলে বোঝবার সম্ভাবনা থাকে, ওগুলি আসল নেকড়ের পায়ের ছাপ নয়; কিন্তু বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও তা না-করে অসতর্কভাবে এবং হয়তো কিছুটা আতঙ্কের প্রভাবে তাড়াহুড়োয় নেকড়ের পায়ের ছাপের মতো চিহ্ন থেকেই ভেবে বসলেন যে, সত্যিই নেকড়ে এসেছিলো। এ জাতীয় অসতর্ক অনুমানই স্বর্গ নরক পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি অনুমানের ভিত্তি। অবশ্যই জৈন লেখকদের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে এই মন্তব্য নেই। তাঁদের উক্তিগুলির মূল কথা হলো, চার্বাক মতে অনুমান, শাস্ত্রবচন প্রভৃতির দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব সুখের প্রতি উদাসীন হয়ে কাল্পনিক পাপ-পুণ্য ও পরলোক প্রভৃতির কথায় কান দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়, কেননা অনুমান সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু অনুমান কোনো সময়েই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না—কিংবা অনুমানমাত্রই অসঙ্গত—এ-জাতীয় কোনো কথা হরিভদ্র, গুণরত্ন ও মণিভদ্র সরাসরি বলেন নি। তাঁরা যা বলেছেন তা থেকে শুধু এটুকুই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, অনুমান ও শাস্ত্রবচনের উপর নির্ভর করে পরলোকাদিতে বিশ্বাস একেবারেই কাজের কথা নয়। নেকড়ের পায়ের ছাপ সংক্রান্ত উপাখ্যান থেকে হয়তো আরো বোঝা যায় যে, চার্বাকমতে দৃষ্টান্ত-বিশেষে এমনকি সাধারণ লৌকিক অনুমানও ভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু তার তাৎপর্য এই হওয়া অনিবার্য নয় যে, অতএব অনুমানমাত্রই—এমনকি সবরকম লৌকিক অনুমানও—

অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। এই কথার পক্ষে এখানে একটি সহজ যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কোনো উল্লেখযোগ্য দার্শনিক এমন কথা বলেননি যে চার্বাক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অস্বীকার করেন। কিন্তু লৌকিক বিষয়েই দৃষ্টান্ত-বিশেষে তো প্রত্যক্ষও ভ্রান্ত জ্ঞানের জনক হতে পারে: মরীচিকায় জলদর্শন, রজ্জুতে সর্পদর্শন প্রভৃতি ভ্রান্ত প্রত্যক্ষর নানান নমুনা তো ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। অথচ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষর নজির দেখিয়ে প্রত্যক্ষমাত্রকেই অস্বীকার করবার উপদেশ চার্বাকমত হিসাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তেমনি, দৃষ্টান্ত-বিশেষে লৌকিক অনুমান ভ্রান্ত বলেই চার্বাকমতে সমস্ত লৌকিক অনুমানই ভ্রান্ত হতে বাধ্য—চার্বাকমতের এ-জাতীয় ব্যাখ্যা অন্তত হরিভদ্র প্রভৃতির অভিপ্রেত হতে বাধ্য নয়।

৪ ॥ পুরন্দরের মত—শান্তরক্ষিত ও কমলশীল

তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই যে প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, একথা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেছেন। হরিভদ্র ও তাঁর ব্যাখ্যাকারেরা বিশদভাবে দেখাতে চেয়েছেন, এ-জাতীয় দাবির আসল উদ্দেশ্যটা কী। একদল ধূর্ত লোক অনুমান ও শাস্ত্রপ্রমাণের দোহাই দেখিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি কাল্পনিক বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস প্রচার করে তাদের ঠকাতে চায়। এ-জাতীয় কথার সঙ্গে লোকায়তিকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলিরও সঙ্গতি সুস্পষ্ট। তাই চার্বাকমত প্রসঙ্গে এ-পর্যন্ত মোটের উপর সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

কিন্তু তারপর প্রশ্ন ওঠে: একান্ত অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করলেও কি চার্বাক সমস্ত রকম অনুমান—এমনকি প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ লৌকিক বিষয়ে অনুমানও—অস্বীকার করতে চান? মাধবাচার্যর বর্ণনা অনুসারে চার্বাক অনুমানমাত্রেরই বিরোধী: ব্যাপ্তি ছাড়া অনুমান অসম্ভব, কিন্তু ব্যাপ্তি-নিশ্চয় কিছুতেই হতে পারে না। বাচস্পতির বর্ণনায় এমনকি জন্তুজানোয়ারের আচরণ থেকে অনুমান-পরায়ণতার যতোটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, চার্বাক তাও মানেন না।

বাচস্পতির কথাটা যে অত্যুক্তির নিদর্শন তা হয়তো অনেকে স্বীকার করবেন। কিন্তু মাধবাচার্যর বর্ণনার বেলায় অন্য কথা। আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে প্রায় সকলেই মাধবাচার্যর চার্বাক-বর্ণনা হুবহু মেনে নিয়ে মতটি বুঝতে ও বোঝাতে চান। অর্থাৎ, প্রায় সকলেই ধরে নেন যে, চার্বাকমতে অনুমান-মাত্রই অপ্রমাণ: কোনো রকম অনুমানই সম্ভব নয়—তা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক যে-কোনো বিষয়েই হোক-না-কেন।

কিন্তু এ-হেন কথা স্বীকার করায় বাধা আছে।

প্রথমত, একেবারে ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অস্বীকার করলে সাধারণ-লোকব্যবহারই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধুঁয়ো দেখে আগুন অনুমান অবান্তর হলে—বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনুমান করা অসঙ্গত হলে—মানুষের পক্ষে বাঁচাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। চার্বাকরা যদি সত্যিই অমন বেকুব হতেন তাহলে তাঁদের মত খণ্ডন করবার জন্যে দিক্‌পাল দার্শনিকদের পক্ষেও মাথা ঘামাবার দরকার পড়তো না।

দ্বিতীয়ত, আগেই বলেছি, লোকায়তিকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি বিদগ্ধ প্রমাণবিদ্যা-সম্মত অনুমান রূপে ব্যক্ত না-হলেও বিচারে বোঝা যায় যে, এগুলি অবশ্যই একরকম অনুমান-নির্ভর। অনুমান সম্পূর্ণ নস্যাৎ হলে কী করে ঠাট্টা করেও বলা যায়: যজ্ঞে নিহত জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি হলে যজ্ঞে নিহত স্বীয় পিতারও স্বর্গপ্রাপ্তি মানতে হবে! অনুমান একেবারে না-মানলে লোকগাথাটির মূল শ্লেষই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ-জাতীয় কথা একেবারে অবান্তর না-হলে স্বীকার করতে হবে যে চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হলেও লোকব্যবহার প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহলৌকিক বিষয়েও অনুমানকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করার কথাটা অতিরঞ্জিত। চার্বাকমতে অবশ্যই অপ্রত্যক্ষ পরলোকাদি ব্যাপারে অনুমান স্বীকার্য নয়। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষ-গোচর বিষয়েও অনুমান অস্বীকার করা চার্বাকের অভিপ্রেত মত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

অবশ্যই উপরোক্ত দাবি প্রাসঙ্গিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দাবিটির পক্ষে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিচারই আমাদের একমাত্র সম্বল নয়। নানা দার্শনিক নানাভাবে পূর্বপক্ষ হিসেবে মতটি বর্ণনা করেছেন। সমস্ত

পূর্বপক্ষ-বর্ণন সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না-হলেও কোনো কোনো পূর্বপক্ষ-বর্ণনার মধ্যে এমন কথা স্পষ্টতই পাওয়া যায় যে, অলৌকিক বিষয়ে অনুমান না-মানলেও লোকপ্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ে অনুমান চার্বাক স্বীকার করতেন। কিছুটা নমুনা দেখা যাক :

বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত এবং তাঁর ব্যাখ্যাকার কমলশীলের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। শান্তরক্ষিত দীর্ঘবিস্তৃতভাবে লোকায়তমত খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। এই পূর্বপক্ষ বর্ণনার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃত চার্বাকপন্থী জনৈক দার্শনিকের উল্লেখ। দার্শনিকটির নাম পুরন্দর। অন্যান্য লেখকেরাও পুরন্দরকে 'চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এজাতীয় উল্লেখ থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি আধুনিক বিদ্বানরাও পুরন্দরকে চার্বাকপন্থী বলেই ধরে নিয়েছেন। দাসগুপ্তর মতে এই চার্বাকপন্থীটি আনুমানিক সপ্তম শতকের দার্শনিক হওয়া সম্ভব।

শান্তরক্ষিতের লেখা 'তত্ত্বসংগ্রহ'-র ব্যাখ্যা-গ্রন্থে (পঞ্জিকা) কমলশীল বলছেন, "পুরন্দরঃ তু আহ লোকপ্রসিদ্ধম্ অনুমানং চার্বাকৈঃ অপি ইষ্যতে এব, যৎ তু কৈশ্চিৎ লৌকিকং মার্গম্ অতিক্রম্য অনুমানম্ উচ্যতে তন্নিষিধ্যতে।" অর্থাৎ, পুরন্দর কিন্তু বলেন চার্বাকও লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করেন; তবে কেউ যদি লৌকিক পথ অতিক্রম করে কোনোকিছু অনুমান করতে চান তাহলে চার্বাক তার নিষেধ করবেন বা স্বীকার করবেন না।

চার্বাকমতের এই প্রবক্তাটির বক্তব্য সুস্পষ্ট : অনুমানমাত্রই—বা সব রকম অনুমানই—অস্বীকার করার দরকার নেই। লোকপ্রসিদ্ধ বা ইহলোক সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত অনুমানের যে প্রয়োগ তার বিরুদ্ধে চার্বাকেরও কোনো আপত্তি নেই। আপত্তিটা অন্যত্র। পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানের বিরুদ্ধে। লৌকিক পথ অতিক্রম করে পারলৌকিক বিষয়ে অনুমান অবশ্যই অচল।

কমলশীলের উপরোক্ত মন্তব্য—এবং তারই সঙ্গে জৈন লেখক বাদিদেব সূরির পুরন্দর প্রসঙ্গে উক্তির সংগতি রেখে—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যে-ভাবে আধুনিক ভাষায় এই চার্বাকমত ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না; বরং পাঠকদের পক্ষে আসল কথাটা বোঝবার সুবিধা হবে। দাসগুপ্ত বলছেন :

Purandara, however, a follower of Carvaka (probably of the seventh century), admits the usefulness of inference in determining the nature of all worldly things, where perceptual experience is available, but inference cannot be employed for establishing any dogma regarding the transcendental world, or life after death or the laws of *Karma* which cannot be available to ordinary perceptual experience. The main reason for upholding such a distinction between the validity of inference in our practical life of ordinary experience, and in ascertaining transcendental truths beyond experience, lies in this, that an inductive generalization is made by observing a large number of cases of agreement in presence together with agreement in absence, and no case of agreement in presence can be observed in the transcendental sphere ; for even if such spheres existed they could not be perceived by the senses. Thus, since in the supposed supra-sensuous transcendent world no case of a *hetu* agreeing with the presence of *sadhya* can be observed, no inductive generalization or law of concomitance can be made relating to the sphere.

অর্থাৎ, সহজ কথায় : (আনুমানিক সপ্তম শতকের) চার্বাকমতানুগামী পুরন্দর নামে দার্শনিক প্রত্যক্ষসাপেক্ষ পার্থিব বা ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমানের উপযোগিতা স্বীকার করেন ; কিন্তু প্রত্যক্ষাতীত লোকোত্তর বিষয়ে বা পরকাল ও কর্মফল প্রভৃতি বিষয়ে কোনো মত অনুমানের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করা যায় না। সাধারণ অভিজ্ঞতায় জানা ব্যবহারিক জীবনে অনুমানের প্রামাণ্য এবং অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অনুমানের অনুপযোগিতা—এই দু-এর পার্থক্য প্রদর্শনের মূল যুক্তি হলো, দুটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না-হলে অনুমান সম্ভব নয় ; পরিভাষায় এই দুটিকে বলে 'লিঙ্গ' (যেমন ধূম) এবং 'সাধ্য' (যেমন বহ্নি)। (ধূম ও বহ্নির মধ্যে নিয়ত-সম্বন্ধ স্বীকৃত বলেই ধূম থেকে বহ্নির অনুমান হয়)। এ-জাতীয় নিয়ত-সম্বন্ধ স্থাপনের দুটি শর্ত ঃ

এক : বহু দৃষ্টান্তে উভয়কেই একত্রে দর্শন। যেমন বহু দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে যে, যেখানেই ধূম বর্তমান সেখানেই বহ্নিও বর্তমান। দুই : বহু দৃষ্টান্তে একটির অভাবে অপরটিরও অভাব দর্শন। যেমন, বহু দৃষ্টান্তে দেখা গেছে বহ্নি-শূন্য স্থানে ধূম অবর্তমান। কিন্তু এ-জাতীয় দ্বিবিধ পরিদর্শন পারলৌকিক বিষয়ে অসম্ভব, কেননা কোনো ক্ষেত্রেই পরলোক প্রত্যক্ষগোচর হতে পারে না। অতএব, পরলোকাদি প্রসঙ্গে কোনো নিয়ত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার কথাই ওঠে না ; আর তাই পরলোকাদি বিষয়ে অনুমানও অসম্ভব। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে এজাতীয় দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত দর্শনের সম্ভাবনা আছে। তাই প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে সাধারণ-স্বীকৃত অনুমানের উপযোগিতা মানা যায়।

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের নানা নজির অবজ্ঞা না-করলে পুরন্দর নামের দার্শনিককে চার্বাকমতের প্রবক্তা বলে স্বীকার করতে হবে। অতএব পুরন্দরের উপরোক্ত বক্তব্য চার্বাকমতসম্মত বলেও স্বীকার করা প্রয়োজন। তাহলে, চার্বাকরা কোনো রকম অনুমানই মানতেন না—এ-হেন দাবিকে অত্যুক্তি বলে সন্দেহ করারও কারণ আছে। বরং স্বীকার করা দরকার যে, চার্বাকমতে পরলোকাদির অনুমান অসম্ভব হলেও প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার্য।

এই কথা মানলে চার্বাক প্রসঙ্গে প্রচলিত অনেক কথাই কল্পিত বলে প্রমাণিত হবে।

৫॥ জয়ন্তভট্টর বক্তব্য

চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্টর প্রকৃত বক্তব্য নির্ণয় করায় বেশ কিছুটা সমস্যা আছে।

'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে এক জায়গায় (১।২৬) তিনি অবশ্য সরাসরি বলছেন : 'তথাহি প্রত্যক্ষং এব একং প্রমাণম্ ইতি চার্বাকাঃ'। অর্থাৎ, চার্বাকরা বলেন, প্রত্যক্ষই এক এবং একমাত্র প্রমাণ। শুধু এটুকু বললে অবশ্য সিদ্ধান্ত হতো যে, চার্বাকমতে অনুমান বলে কোনো প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, চার্বাক-প্রসঙ্গে জয়ন্ত শুধু এইটুকুই বলেননি। একই গ্রন্থের অন্যত্র (১।৫৯) তিনি মন্তব্য করছেন, 'চার্বাকধূর্তঃ তু অথ অতঃ তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ, ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ-প্রমেয়-সংখ্যা-লক্ষণ-নিয়ম-অশক্য-করণীয়ত্বম্ এব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্।'

সেয়ানা বা ধূর্ত চার্বাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল : এবার আমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো ; কিন্তু 'তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো' বলে চার্বাক আসলে দেখাতে চাইলো যে প্রমাণ ও প্রমেয়র সংখ্যা ও লক্ষণ সংক্রান্ত কোন নিয়মই সম্ভব নয়।

জয়ন্তর এই দ্বিতীয় উক্তি স্বীকার করলে মানতে হবে যে, চার্বাক এমনই চালাক যে তার মতে কোনো রকম প্রমাণেরই লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়— অতএব প্রত্যক্ষরও নয়। মনে হয় জয়ন্তর অভিপ্রায় এই ধরণের কথা বলাই ; কেননা এই উক্তির জের টেনে তিনি উদাহরণ হিসাবে বলছেন, চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ দ্বারাও সর্বদা যথার্থ জ্ঞান হয় না।

অতএব, চার্বাক সংক্রান্ত জয়ন্তর এই দুটি উক্তির মধ্যে সংগতিসাধন সহজ নয়। প্রথম উক্তি অনুসারে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে, কোনো রকম প্রমাণই সম্ভব নয়—তাই প্রত্যক্ষও সংশয়াতীত নয়। অবশ্যই চার্বাকদের মুখে এ জাতীয় কথা কতোটা শোভা পায় তাও ভাববার কথা। শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর মুখে দ্বিতীয় উক্তিটি শোভা পেতে পারে এবং তা জয়রাশিভট্টর 'তত্ত্বোপপ্লব-সিংহ'র কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয় ; নানা কারণে বরং তাঁকে শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর দার্শনিক জ্ঞাতি বলে মনে করা যেতে পারে ; কিন্তু তাঁকে 'কোনো-এক-কালে কোনো-এক-স্থানে' প্রচলিত চার্বাকদেরই কোনো-এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে কল্পনা করার পক্ষে যেটুকু নজির দেখানো হয়েছে তার মূল্য আসলে গৌণ। বরং মনে হয় 'তত্ত্বোপপ্লব-সিংহ'-র মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদকেরা জয়ন্তভট্টর উপরোক্ত দ্বিতীয় উক্তির নজির দেখালে লেখককে চার্বাকপন্থী বলে প্রচার করার সুবিধা হতো। কিন্তু তাঁরা তা করেননি ; এবং না-করার কারণ এও হতে পারে যে সুখলালজীর মতো পণ্ডিত অবশ্যই জানতেন যে জয়ন্তভট্ট একই গ্রন্থের অন্যত্র সহজসরল ভাষায় বলেছেন যে, চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।

যাই হোক, আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্তর দ্বিবিধ বর্ণনার মধ্যে সংগতিসাধন সহজসাধ্য নয়। একই সঙ্গে কী করে বলা যায় যে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করতেন এবং তাঁরা কোনো প্রমাণই মানতেন না ; প্রত্যক্ষও তাঁদের কাছে সংশয়াতীত নয়!

অবশ্য 'ন্যায়মঞ্জরী'র একটি টীকা প্রকাশিত হয়েছে। টীকার নাম 'গ্রন্থিভঙ্গ',

টীকাকার চক্রধর। এই টীকায় জয়ন্তর দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জয়ন্ত এখানে আসলে উদ্ভট নামে জনৈক চার্বাকপন্থীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। উদ্ভট নামটা একটু উদ্ভুটে—ঠাট্টার মতো শোনায়, যদিও অবশ্য গ্রন্থান্তরেও উদ্ভটের কথা পাওয়া যায়। যাই হোক, চক্রধর আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন, উদ্ভট নামের এই চার্বাকপন্থীর মতে সব রকম প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি বর্জনের উপদেশ আছে। কিন্তু চক্রধর আরো বলছেন, উদ্ভটের এই মন্তব্য অবশ্যই (চার্বাক) সূত্রের যথাশ্রুত বা আক্ষরিক অর্থ নয়; এটা আসলে উদ্ভটের নিজস্ব উদ্ভাবন।

কিন্তু মোট ব্যাপারটা আসলে আরো জটিল। একই গ্রন্থে (১।৩৩) জয়ন্ত আবার আরেকরকম কথা বলেছেন। জয়ন্তর স্বীয় সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ ন্যায় সম্প্রদায়ের—দাবি এই যে প্রমাণ আসলে চার রকম। অতএব স্বমত সমর্থনে যে-দার্শনিকেরা প্রমাণের সংখ্যা চারের চেয়ে বেশি বলে মনে করেন, জয়ন্তর পক্ষে তাঁদের মত খণ্ডনের প্রয়োজন বোধ করার কথা। কিন্তু কারা চারের চেয়ে বেশি প্রমাণ মানেন? জয়ন্ত বলছেন, প্রভাকর-পন্থী মীমাংসকরা বলেন, প্রমাণ পাঁচ রকমের; কুমারিলভট্টর অনুগামী মীমাংসকরা বলেন, প্রমাণ ছয় রকমের; কেউকেউ আবার বলেন প্রমাণ আট রকমের; কিন্তু 'সুশিক্ষিত চার্বাক'রা বলেন, প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মানা যায় না। কথাটার তাৎপর্য কি এই যে 'সুশিক্ষিত চার্বাক' মতে প্রমাণের সংখ্যা অসংখ্য, নাকি, প্রমাণ বলেই কিছু নেই?

টীকাকার চক্রধর অবশ্য এখানেও আলোচ্য মতটিকে উদ্ভট নামে জনৈক চার্বাকবিশেষের মত বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু উদ্ভট নামের কোনো চার্বাকের কথা স্বয়ং জয়ন্ত জানতেন কিনা—এ-বিষয়ে কোনো নজির জয়ন্তর গ্রন্থে নেই। তাই টীকাকারের মন্তব্যটি বড় জোর সংশয়-সাপেক্ষ।

কিন্তু জয়ন্ত-উক্ত 'সুশিক্ষিত চার্বাক' নিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে বেশ একটু সোরগোল পড়েছে। তার একটা কারণ, একই গ্রন্থে (১।১১৩) জয়ন্ত আর এক জায়গায় বলেছেন, 'সুশিক্ষিততররা বলে থাকেন: অনুমান দু'রকম: উৎপন্ন-প্রতীতি এবং উৎপাদ্য-প্রতীতি। ঈশ্বর প্রভৃতির অনুমান উৎপাদ্য-প্রতীতি। ধূম প্রভৃতি থেকে বহ্নি প্রভৃতির অনুমান কে অস্বীকার করে? এসব ক্ষেত্রে তার্কিক দ্বারা অক্ষত ব্যক্তিরাও সাধ্য-কে জানতে পারে। তবে আত্মা,

সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে যে-অনুমানের কথা বলা হয় সেগুলির প্রামাণ্য তত্ত্বদর্শীরা স্বীকার করেন না। এইসব অনুমানের দ্বারা সোজা মানুষের অনুমেয়-বিষয়ে জ্ঞান হয় না—অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মন দুষ্ট তার্কিকদের দ্বারা কুটিল হয়ে ওঠে।'

জয়ন্তভট্টর লেখার কায়দাটাই ওই রকম রকমারি শ্লেষ বা ঠাট্টা-তামাসায় ঠাসা। কিন্তু তা বাদ দিয়ে সোজা ভাষায় তাঁর বক্তব্যটা কী? জয়ন্ত বলছেন, সুশিক্ষিততরদের মতে প্রত্যক্ষগোচর ইহলোক বিষয়ে সাধারণ লোক যা অনুমান করে থাকে তা অবশ্যই স্বীকার্য: যেমন ধূম থেকে বহ্নির অনুমান। কিন্তু আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কূট তার্কিকেরা যে-সব অনুমান প্রদর্শন করেন তা শুধু তাঁদের কূটবুদ্ধিরই পরিচায়ক, স্বীকারযোগ্য অনুমান হতে পারে না।

'সুশিক্ষিততর'-দের মত হিসাবে জয়ন্ত এখানে যা বলেছেন তা অবশ্যই পুরন্দরের কথা মনে করিয়ে দেয়। জয়ন্তর লেখার কায়দাটা যাই হোক না কেন, মূল বক্তব্যটা একই। পুরন্দর যে প্রকৃত চার্বাকপন্থী ছিলেন এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে একাধিক নজির আছে; তাই সেকথা না-মেনে উপায় নেই। কিন্তু 'সুশিক্ষিততর' বিশেষণ দিয়ে জয়ন্ত যাঁদের কথা বলছেন তাঁরাও যে চার্বাকপন্থী ছিলেন—এ বিষয়ে কোথাও নিশ্চিত নজির নেই; অন্তত জয়ন্তর 'ন্যায়মঞ্জরী'তে নেই। অর্থাৎ তাঁর আলোচ্য উক্তির আগে বা পরে কোথাওই চার্বাক বা লোকায়ত শব্দ চোখে পড়ে না। উক্তিটি অবশ্য পূর্বপক্ষ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসাবে এখানে ঠিক কাকে বা কাদের বোঝা হবে? জয়ন্ত যেহেতু এখানে এমনকি আভাসে-ইংগিতেও চার্বাকের উল্লেখ করেননি সেইহেতু এখানেও পূর্বপক্ষ বলতে ঐ চার্বাকই—এমনতরো কথা কল্পনা করা ভিত্তিহীন হবে। পক্ষান্তরে, মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে (Indian Logic in its Sources, pp. 31 f.) স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে, জয়ন্তর আলোচ্য পূর্বপক্ষ-বর্ণনাটির মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়'তেও পাওয়া যায়—একেবারে হুবহু একইভাবে পাওয়া যায়। ভর্তৃহরিকে চার্বাকপন্থী মনে করার কারণ নেই। তাই শুধুমাত্র এই শ্লোকগুলির নজির থেকেই বলা যায় যে 'সুশিক্ষিততরাঃ' বলে এখানে জয়ন্ত যাঁদের কথা উল্লেখ করছেন তাঁদের সরাসরি চার্বাক বলে কল্পনা করা নিরাপদ নয়।

কথাগুলো বিশেষ করে তোলবার দরকার আছে। আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় প্রায়ই একরকম অতি-সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই নির্বিবাদে ধরে নেন যে জয়ন্তর লেখা থেকেই বোঝা যায়, চার্বাকদের দুটি সম্প্রদায় ছিলো। একটি হলো ধূর্ত চার্বাক এবং অপরটি হলো সুশিক্ষিত চার্বাক। আধুনিক বিদ্বানরা আরো ধ েনেন যে, দুটির মধ্যে মূল প্রভেদ এই যে ধূর্ত চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানেননি; সুশিক্ষিত চার্বাকেরা অবশ্য ত। ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ মেনেছেন, শুধু অপ্রত্যক্ষ লোকোত্তর বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করেছেন।

এ জাতীয় মতের পক্ষে আধুনিক বিদ্বানদের কাছে একমাত্র নজির বলতে জয়ন্তভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী'। কেননা, জয়ন্ত চার্বাকদের বিশেষণ হিসেবে এক জায়গায় 'ধূর্ত' এবং অপর জায়গায় 'সুশিক্ষিত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ধরেই নেওয়া হয় যে 'সুশিক্ষিততরাঃ' বলে জয়ন্ত যাঁদের উল্লেখ করেছেন তাঁরা ঐ সুশিক্ষিত চার্বাকই।

কিন্তু এই মত স্বীকার করায় অনেক বাধা আছে। প্রথমত, বিদ্বেষমূলক বিশেষণ ব্যবহারে পটু জয়ন্ত একই গ্রন্থে চার্বাককে 'বরাক' বলেছেন। বরাক মানে বোকা-হাবা—ধূর্ত নয়। তাহলে কি এই নজির থেকেই চার্বাকদের আরো এক সম্প্রদায় কল্পনা করতে হবে? দ্বিতীয়ত, চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্ত যেখানে 'ধূর্ত' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, সেখানে চার্বাক বলতে যে-সর্বপ্রমাণ-বিরোধী দার্শনিকদের কথা বর্ণনা করেছেন তাঁরা কোনোমতেই চার্বাকমতবাদী হতে পারেন না। এমনকি জয়ন্তর মতেও তা হওয়া কঠিন। কেননা একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। এমনকি জয়ন্তর টীকাকার চক্রধর এখানে মতটির সমর্থক হিসাবে উদ্ভট বলে কোনো এক ব্যক্তির কথা কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তৃতীয়ত, 'সুশিক্ষিততরাঃ' বলে জয়ন্ত যাঁদের কথা বলেছেন তাঁরা যে কোনো-এক সম্প্রদায়ের চার্বাকপন্থী—এ কথার পক্ষে কোনো নিশ্চিত নজির নেই।

আসলে, আধুনিক বিদ্বানরা একটি কথা যেন অবজ্ঞা করেই জয়ন্তর লেখার নজির থেকে এই দ্বিবিধ চার্বাক সম্প্রদায়ের কল্পনা করে থাকেন। সেটা হলো, জয়ন্তর রচনাকৌশল এবং এই রচনাকৌশলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো শ্লেষাত্মক

বিশেষণ ব্যবহার। 'সুশিক্ষিত' শব্দটি তাঁর রচনায় এইরকম ব্যঙ্গার্থক। যেমন একই গ্রন্থে (১।১৬১) ঠাট্টা করে তিনি প্রাভাকরদের সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার করেছেন ; অন্যত্র (১।২৭৩) আবার যে-দার্শনিকেরা 'সামান্য বা জাতি' (*universal*) মানেন না তাঁদেরও পরিহাস করে 'সুশিক্ষিত' বলেছেন।

অতএব, সংক্ষেপে, জয়ন্তভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী' থেকে চার্বাকমত সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন, বিশেষত চার্বাকেরা অনুমান মানতেন কিনা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা নিরাপদ নয়।

জয়ন্তভট্টর মতো মহাপণ্ডিতের পক্ষে চার্বাক প্রসঙ্গে এরকম উল্টো-পাল্টা কথা বলার কারণ কী ? এ-নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। যোগ্যতর বিদ্বানরা তা করুন। বর্তমান আলোচনার পক্ষে আমাদের মন্তব্য এই যে, শুধুমাত্র জয়ন্তর রচনার নজির দেখিয়ে চার্বাকদেরই 'ধূর্ত' এবং 'সুশিক্ষিত' নামের দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের কল্পনা বিচারের ধোপে টেঁকে না। অতএব এ-হেন কল্পনারও কোনো সুযোগ নেই যে ধূর্ত চার্বাকেরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানতেন, কিন্তু সুশিক্ষিত চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। পুরন্দরের প্রামাণ্য উক্তি থেকে বরং মনে হয় যে, দ্বিতীয় কথাটিই চার্বাকপন্থীদের কথা : তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ হলেও প্রত্যক্ষর অনুগামী অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করায় বাধা ছিল না।

৬॥ কৌটিল্যর সাক্ষ্য

"চার্বাক বা প্রাচীনতর কালে লোকায়ত নামে খ্যাত দার্শনিক মতে অনুমানও যে প্রমাণ বলেই স্বীকৃত ছিলো—এ বিষয়ে মোক্ষম প্রমাণ কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্র'।

'অর্থশাস্ত্র'-তে কৌটিল্য ঠিক কী বলেছেন প্রথমে তার সরলার্থ দেখা যাক। রাজার শিক্ষণীয় 'বিদ্যা'র আলোচনায় কৌটিল্য (১।২) বলছেন :

"বিদ্যা বলতে আসলে চাররকম : আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি।

মানব-মতে (শুধু) ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীবিশেষ মাত্র।

বার্হস্পত্য মতে (শুধু) বার্তা ও দণ্ডনীতি। লোকযাত্রাবিদদের কাছে ত্রয়ী সংবরণমাত্র।

ঔশনস (অর্থাৎ উশনসের অনুগামীদের) মতে দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা। তার দ্বারাই সর্বপ্রকার বিদ্যা আবদ্ধ।

(কিন্তু) বিদ্যা (প্রকৃতপক্ষে) চার রকম। এই হলো কৌটিল্যের মত। এগুলির সাহায্যেই ধর্মাধর্ম ও অর্থের সাধন হয়। তাই এগুলিই বিদ্যা।

আন্বীক্ষিকী বলতে শুধুমাত্র সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। অন্যান্য তিন বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর ধর্মাধর্ম এবং অর্থ-অনর্থ, বার্তার লাভ-লোকসান, দণ্ডনীতির বল ও দুর্বলতা—এই সবই হেতু দ্বারা পরীক্ষা করেই লোকের উপকার সম্ভব। তারই দ্বারা অসময়-সুসময়ে মন স্থির রাখা যায়। তারই দ্বারা জ্ঞান, বাক্য ও কর্মের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

তাই এই আন্বীক্ষিকীই সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায় এবং সর্বধর্মের আশ্রয়।"

প্রথমে কয়েকটি শব্দার্থ আলোচনা করা যাক। কৌটিল্যর মতে (রাজার পক্ষে) শিক্ষণীয় বিদ্যা বলতে চার রকম: আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। এর মধ্যে বার্তা এবং দণ্ডনীতির অর্থ নিয়ে বিশেষ কোনো হাঙ্গামা নেই। বার্তা মানে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি—সেকালের ইকনমিক্স্ (Economics)। দণ্ডনীতি মানে রাজ্যশাসন-বিদ্যা—সেকালের পলিটিক্স্ (Politics)। জ্যাকবি ত্রয়ী শব্দের অর্থ করেছেন থিয়োলজি (Theology) বা ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যে-কোনো ধর্মতত্ত্বই ত্রয়ী নয়। প্রাচীন ভারতে একটি প্রথা অনুসারে অথর্ববেদকে বাদ দিয়ে শুধু ঋক্, সাম ও যজুর্বেদকে তিন বেদ বলে ধরা হতো। সেই প্রথা অনুসারে এখানেও ত্রয়ী বলতে তিন বেদ। অর্থাৎ, ত্রয়ী মানে ধর্মতত্ত্ব হলেও শুধু এই তিন বেদমূলক ধর্মতত্ত্ব বা এই তিন বেদের বিদ্যা। কিন্তু চার রকম বিদ্যার মধ্যে কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বলে বিদ্যাটির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। আন্বীক্ষিকী মানে কী?

অন্বীক্ষা শব্দের অর্থ 'পরবর্তী জ্ঞান': অনু (অর্থাৎ পরবর্তী) + ঈক্ষা (বা জ্ঞান)। অনুমান শব্দটির অর্থও হুবহু একই: অনু (পরবর্তী) + মান (জ্ঞান)। অতএব 'অন্বীক্ষা' ও 'অনুমান' একই কথা, ভারতীয় পরিভাষায়

যাকে বলে পর্যায়শব্দ। কিন্তু 'পরবর্তী জ্ঞান' বললে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে : কিসের পরবর্তী ? ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'প্রত্যক্ষর পরবর্তী'। অতএব, আজকাল যদিও চলতি কথায় আমরা 'অনুমান'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরেজি ইন্‌ফারেন্‌স্ (*inference*) শব্দর ব্যবহার করে থাকি, তবুও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'অনুমান' জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুগামী—পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমে কোনো প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং তারই অনুসরণ করে অনুমান জ্ঞান। কিংবা, বলা যায়, অনুমানের একটি মূল শর্ত হলো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ। ভারতীয় দার্শনিকেরা একথা বলছেন কেন ? পূর্ব-প্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে অনুমান কেন সম্ভব নয় ? একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত থেকে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। ধূম থেকে আমরা অগ্নি অনুমান করি। কী করে করি ? কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (বা প্রত্যক্ষ করেছি) : যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নি, যেমন রান্নার উনুনে। এ-জাতীয় পূর্বপ্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে শুধু ধূম থেকে অগ্নির অনুমান সম্ভবই নয়। তাই অন্বীক্ষা (অনু+ঈক্ষা) বা অনুমান (অনু+মান)। 'চরক-সংহিতা' এবং 'ন্যায়-সূত্র'-তে বিষয়টি আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু আপাতত কৌটিল্যর কথাটা দেখা যাক।

তাহলে, 'আন্বীক্ষিকী'র শব্দার্থ হলো 'অনুমানবিদ্যা' বা 'হেতুশাস্ত্র'—আজকাল চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'লজিক' (Logic)। অবশ্য, কৌটিল্য এখানে বিশুদ্ধ অনুমানবিদ্যা অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি ; তাঁর মতে 'আন্বীক্ষিকী' শুধু অনুমানবিদ্যা ছাড়াও অনুমান-মূলক দার্শনিক মতও। কেননা, একই সঙ্গে তিনি বলেছেন—'আন্বীক্ষিকী' বলতে তিন এবং শুধুমাত্র তিন : সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত। এগুলি দার্শনিক মতের নাম। তাই এখানে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে হেতুবিদ্যা বা অনুমানবিদ্যা ছাড়াও এমন দার্শনিক মতও বুঝতে হবে যার মূল ভিত্তি বলতে অনুমান বা অন্বীক্ষা। অর্থাৎ, কৌটিল্য এখানে প্রকৃত অনুমান-ভিত্তিক—বা, চলতি কথায় হয়তো বলা যায়, যুক্তিমূলক—দার্শনিক মত হিসাবে শুধুমাত্র তিনটির উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। তাঁর বিচারে আর কোনো দার্শনিক মতের যুক্তিবিদ্যা-ভিত্তির মর্যাদা নেই।

প্রথমেই লক্ষ করা দরকার যে, তাঁর এই তালিকায় 'যোগ' শব্দটি প্রচলিত

অর্থে—অর্থাৎ পতঞ্জলির নামের সঙ্গে যুক্ত যোগ-দর্শন অর্থে—ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, দার্শনিক মত হিসাবে পতঞ্জলির যোগ-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে মূল তফাৎ শুধু এই যে, সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই; কিন্তু পতঞ্জলি সাংখ্য-দর্শনের বাকি সব কথা মেনে নিয়ে কোনোরকমে তার সঙ্গে ঈশ্বরকেও জুড়ে দিয়েছেন। তাই পতঞ্জলির যোগদর্শন নামান্তরে 'সেশ্বর সাংখ্য' (বা সাংখ্য+ঈশ্বর) নামেও খ্যাত। তাই, কৌটিল্যর আলোচ্য মন্তব্যে 'যোগ' বলতে পতঞ্জলির যোগ-দর্শন মনে করলে মানতে হবে যে তাঁর মতে আন্বীক্ষিকী বা অনুমানভিত্তিক—বা যুক্তিভিত্তিক—দর্শন বলতে শুধু তিনটি: সাংখ্য, সেশ্বর সাংখ্য এবং লোকায়ত। এ জাতীয় সম্ভাবনা অবশ্যই সুদূর-পরাহত। তাই প্রশ্ন ওঠে: 'যোগ' বলতে এখানে কৌটিল্য কোন্ দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন?

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীর মতো মহাপণ্ডিতেরা প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের নানা নজির থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন, প্রাচীনকালে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে 'যোগ' নামে উল্লেখ করার একটা প্রথা ছিলো এবং কৌটিল্যও নিশ্চয়ই সেই প্রথা অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী যে-সব নজির দেখিয়েছেন এবং ন্যায়-বৈশেষিককে 'যোগ' নামে আখ্যা দেবার কারণ কী হতে পারে এ বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—এখানে তা পুনরুল্লেখ করতে গেলে আলোচনা অনেক বিস্তৃত হবে এবং আমাদের পক্ষে বর্তমানে তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় উভয়েরই অধিকার ও পারদর্শিতা সংশয়াতীত। অতএব এঁদের মন্তব্যর উপর নির্ভর করে আমরা নিরাপদেই স্বীকার করতে পারি যে, 'যোগ' শব্দ 'অর্থশাস্ত্রে' ন্যায়-বৈশেষিক অর্থেই ব্যবহৃত। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে, আন্বীক্ষিকী বা অনুমান-মূলক দর্শন বলতে শুধুমাত্র সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে যোগ এবং লোকায়ত।

আমাদের বর্তমান আলোচনা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারতো। চার্বাক বা লোকায়ত মতে অনুমান-মাত্রই অগ্রাহ্য কিনা—'অর্থশাস্ত্র'র উক্তিতে এই প্রশ্নের চরম উত্তর পাওয়া যায়। অনুমান-মাত্রই অগ্রাহ্য করা তো দূরের কথা, 'অর্থশাস্ত্র'র মতে মাত্র তিনটি দর্শন অনুমান-মূলক বা আন্বীক্ষিকী বলে স্বীকার্য। তার মধ্যে একটি হলো লোকায়ত। অতএব লোকায়তিকেরা সব রকম

অনুমানই অস্বীকার করেছেন—পরবর্তীকালের এ-জাতীয় কথার সঙ্গে প্রাচীন নজিরের মিল হয় না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'অর্থশাস্ত্র'র উক্তি আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, কৌটিল্য শুধুমাত্র তিনটি মতকে প্রকৃত দর্শনের মর্যাদা দিয়েছেন। তার মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্তর মতো প্রভাবশালী দর্শনের উল্লেখ নেই। এগুলিকে অবজ্ঞা করার কারণ কী? জ্যাকবি অনুমান করেছেন যে, কৌটিল্য বা চাণক্যর মতো প্রখ্যাত ব্রাহ্মণের পক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন মতকে প্রকৃত দার্শনিক মতের মর্যাদা না-দেবারই কথা। কিন্তু এই অনুমান সহজে মানা যায় না। কেননা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে তাঁর পক্ষে লোকায়তমতই সবপ্রথম অবজ্ঞা করার কথা এবং পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তর মতো মতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনই স্বাভাবিক। অতএব, জ্যাকবির মন্তব্য গ্রহণ না-করে বরং মনে করা যেতে পারে যে, কৌটিল্যের সময় বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিলো; অন্তত প্রভাবশালী দার্শনিক হিসাবে কৌটিল্য-পূর্ব কোনো প্রখ্যাত বৌদ্ধ বা জৈন মতের সমর্থক ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হননি—হলেও তাঁদের কথা কৌটিল্যের জানা ছিলো না। মহারাজ অশোকের পর—অর্থাৎ কৌটিল্যর পরে—নাগার্জুনের মতো বৌদ্ধ বা উমাস্বাতির মতো প্রখ্যাত জৈন দার্শনিকদের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু কৌটিল্যের লেখায় পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তের উল্লেখ নেই কেন? অবশই পূর্বমীমাংসার আকরগ্রন্থ জৈমিনির 'মীমাংসাসূত্র' এবং বেদান্তর আকর-গ্রন্থ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'-র রচনাকাল সংক্রান্ত সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক ('যোগ') এবং লোকায়ত দর্শনের পূর্ববর্তী। অতএব দার্শনিক মত হিসাবে শুধু এই তিনটি উল্লেখ করেও কৌটিল্য কেন পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্ত সম্বন্ধে নীরব? প্রশ্নটি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু কৌটিল্যের উক্তির সঙ্গে পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের মূল দাবি মিলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। পূর্বমীমাংসকদের মূল দাবি কোনো স্বতন্ত্র বা স্বাধীন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। তার বদলে পূর্বমীমাংসা বেদেরই কর্মকাণ্ডের রূপায়ণ। তেমনি বেদান্তও কোনো স্বাধীন দার্শনিক মত নয়: বেদেরই জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্-উক্ত দার্শনিক-

দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়সাধন। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, এই দুটি দর্শনের স্বীয় দাবিই হলো, এগুলি বেদ ছাড়া আর কিছুই নয়—বেদ-এরই তাৎপর্য ব্যাখ্যা। অতএব, কৌটিল্য-উক্ত বিদ্যার তালিকায় 'ত্রয়ী' বা বেদ ছাড়াও দর্শন হিসাবে পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্তর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন : উভয় দর্শনেরই সারাংশ 'ত্রয়ী'-রই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এখানে প্রাচীনকালের মতাদর্শগত একটা বিতর্কেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যর স্বীয় মতে বিদ্যা বলতে চার রকম। কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রাচীনেরা সকলেই এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত নন। মতান্তর হিসাবে এখানে বিশেষত দুটির উল্লেখ করবো।

প্রথমত, মানব বা মনু-র অনুগামীদের মত। কৌটিল্য বলছেন, মনুর অনুগামীদের মতে বিদ্যা বলতে শুধুমাত্র তিনটি : ত্রয়ী, দণ্ডনীতি এবং বার্তা; আন্বীক্ষিকীকে স্বতন্ত্র বিদ্যা বলে মানার কোনো কারণ নেই, কেননা তা ত্রয়ী-বিশেষই বা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত।

এখানে মনু নামে কোটিল্য যাঁর উল্লেখ করছেন তিনিই 'মনুস্মৃতি'-কার কিনা —এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা কিছুটা বিতর্ক তুলেছেন। যেমন কঙ্গলে (R. P. Kangle) মন্তব্য করেছেন, এখানে 'মানব' বা মনুর অনুগামী বলতে অধুনালভ্য 'মনুস্মৃতি'র অনুগামীদের বোঝা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেননা, 'মনুস্মৃতি'-তে আন্বীক্ষিকী (বা নামান্তরে হেতুবিদ্যা, তর্কবিদ্যা) অবজ্ঞা করার উপদেশ নেই; বরং স্বীকৃতিই চোখে পড়ে। কিন্তু 'অর্থশাস্ত্র'র প্রামাণিক সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদের জন্যে আমরা তাঁর কাছে যতোই ঋণী হই না কেন, তাঁর এই মন্তব্য আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা, 'মনুস্মৃতি'-তে (২।১০-১১) স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র) চরম প্রমাণ; এমনকি কোনো দ্বিজও যদি হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করে শ্রুতি-স্মৃতিতে কিছু সংশয় প্রকাশ করে তাহলে ধার্মিক ব্যক্তিরা তাকে একেবার দূরে করে দেবেন।

এখানে একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হেতুশাস্ত্রর প্রতি অশ্রদ্ধাই মনুর মতে বেদনিন্দা বা নাস্তিকতার উৎস। কিন্তু কাদের মধ্যে এ-হেন হেতুশাস্ত্রর প্রতি অশ্রদ্ধা? ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট চার্বাক প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। চার্বাকেরা যে বেদনিন্দক নাস্তিক ছিলেন, একথা অবশই সুবিদিত। কিন্তু কুল্লূকভট্টর

ব্যাখ্যা স্বীকার করলে মানতে হয়, তার আসল কারণ চার্বাকদের হেতুশাস্ত্র-পরায়ণতা। অবশ্যই অনুমান সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে হেতুশাস্ত্র-পরায়ণতার কথা ওঠে না। অতএব, চার্বাকেরা ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অস্বীকার করেছেন—মনু ও কুল্লুকের কথা মাধবাচার্য প্রভৃতির দাবির বিরুদ্ধে যায়।

অন্যত্র হৈতুক বা হেতুশাস্ত্র-পরায়ণদের প্রতি 'মনুস্মৃতি'র মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে উক্ত হয়েছে। কিন্তু "দর্শন ও রাজনীতি" প্রসঙ্গে আলোচনায় সে-সব কথা দেখা যাবে।

'মনুস্মৃতি'র এজাতীয় নজিরগুলি মনে রেখে 'অর্থশাস্ত্র' প্রসঙ্গে ফেরা যাক। কৌটিল্য বলছেন, তাঁর স্বীয় মতে (রাজার শিক্ষণীয়) বিদ্যা বলতে চার রকম হলেও 'মানব' বা মনুর অনুগামীরা তা মানেন না : তাঁদের মতে আন্বীক্ষিকীর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, তা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত।

তাহলে কৌটিল্যের কথা এবং মনুর কথা এক নয়। কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বলতে স্বাধীন যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার কথাই বলেছেন। কিন্তু 'মনুস্মৃতি'র মতে কেবল-আন্বীক্ষিকী অবশ্য পরিত্যাজ্য ; শুধুমাত্র শাস্ত্রানুগামী—বা বেদান্ত-অনুগামী—অর্থে আন্বীক্ষিকীর কিছুটা মূল্য আছে, কেননা তা আত্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা বোঝবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

আন্বীক্ষিকী অর্থে কৌটিল্য শুধুমাত্র যে-তিনটি দার্শনিক মত স্বীকার করেছেন তার মধ্যে লোকায়তর স্থান কী করে ব্যাখ্যা করা যায় ? এই যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ যদি বলেন যে এখানে কৌটিল্য লোকায়ত বলতে চার্বাক দর্শন বোঝেন নি—অন্য কিছু বুঝেছিলেন—তাহলে তাঁদের সঙ্গে তর্ক তুলে লাভ নেই। ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে না-দিলে মানতেই হবে, লোকায়ত ও চার্বাক একই দর্শন : প্রাচীন কালে যে-দর্শনকে সাধারণত লোকায়ত বলা হতো তুলনায় পরবর্তী কালে, যে কোনো কারণেই হোক না কেন, তাকেই চার্বাক নামে উল্লেখ করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিলো।

৭॥ প্রত্যক্ষ—প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ

তাহলে, পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকদর্শনের বর্ণনায় মাধবাচার্য প্রমুখ যদিও বলেছেন যে প্রমাণ হিসেবে চার্বাকেরা অনুমান প্রমাণ একেবারে বরবাদ করে দিতে

চেয়েছিলেন, তবুও অন্তত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে একথা মেনে নিতে আমরা বাধ্য নই। মাধবাচার্যর নিজের সম্প্রদায়ে (অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্তে) অবশ্যই সর্বপ্রমাণ বর্জনের—অতএব অনুমান বর্জনেরও—উপদেশ আছে। শঙ্করাচার্যর লেখা থেকে শ্রীহর্ষ ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের রচনায় সেকথা সুস্পষ্ট। কিন্তু অনুমান খণ্ডনের প্রস্তাব মাধবাচার্য চার্বাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের দার্শনিক মতকে খেলো প্রতিপন্ন করবার সহজ পথ বেছে নিয়েছেন : অনুমানই যদি কেউ না মানে তাহলে দর্শনের দরবারে তাকে কী করে স্থান দেওয়া যায়? প্রসঙ্গত, এ-জাতীয় যুক্তির জবাব দিয়েই শ্রীহর্ষ তাঁর প্রখ্যাত 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' বই শুরু করেছেন; অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীরা সব রকম প্রমাণ অগ্রাহ্য করেও শূন্যবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের অধিকারী ছিলেন।

অবশ্যই আমাদের বর্তমান আলোচনা শূন্যবাদ বা মায়াবাদ নিয়ে নয়, প্রখর বস্তুবাদ নিয়ে—যে-বস্তুবাদ লোকায়ত বা চার্বাক নামে ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ। এবং নানান নজির থেকে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে প্রকৃত চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ অবশ্যই প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ—অর্থাৎ, প্রমাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে সেরা। কিন্তু প্রত্যক্ষ-অনুগামী ইহলোক প্রসঙ্গেও অনুমানকে প্রমাণ বলে মানায় বাধা নেই। কেবল পরলোক, কর্মফল, আত্মা প্রভৃতি একান্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান নিষ্ফল—একদল ধূর্ত এজাতীয় বিষয়ে অনুমান প্রমাণ দেখাবার চেষ্টা করে লোক ঠকাবার আয়োজন করে।

এই যদি চার্বাকদের অভিপ্রেত মত হয় তাহলে সাধারণত মতটিকে যতোটা খেলো বলে প্রচার করার চেষ্টা হয় তা মূলতই বিরূপ-প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষত আমাদের দেশে শ্রুতি-স্মৃতির দোহাই পাড়ার আয়োজন এমনই প্রবল হয়েছিলো যে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব নেহাতই গৌণ বা অনেকাংশে অবান্তর বলেই বিবেচিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো এবং এমন একটা ধারণা চালু হয়েছিলো যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যই বুঝি ঋষিদের ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্মবিদ্যা—যার সঙ্গে চোখে দেখা মাটির পৃথিবীর বড়ো একটা সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপই সম্ভব হয় না।

আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মীদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সহজ-সরল সত্যটি মর্মেমর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই সাবেকী ভারতীয় রসায়নবিদদের পক্ষে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের নজিরটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করছেন :

I shall endeavour to unfold before you to-day a forgotten chapter in the history of the intellectual development of the Indian people, namely the cultivation of the Experimental Sciences. It is generally taken for granted that the Hindus were a dreamy, mystical people given to metaphysical speculation and spiritual contemplation..... But the fact that the Hindus had very large hand in the cultivation of the experimental sciences is hardly known in these days....

Experiments and observations constitute the fundamental bases of sciences. It is naturally a relief to come across such dicta as laid down by two standard works on Hindu Chemistry, namely *Rasendra-cintamani* by Ramacandra and *Rasa-prakasa-sudhakara* by Yasodhara, both belonging to the 13th or 14th century A. D.

Says the former : 'That which I have heard of learned men and have read in the *sastras* but have not been able to verify by experiment, I have discarded. On the other hand, those operations which I have according to the directions of my sage teachers been able to perform with my own hands—those alone I am committing to writing. Those are to be regarded as real teachers who can verify by experiments what they teach—those are to be regarded as laudable disciples who can perform what they have learned—teachers and pupils other than these are mere actors on the stage.'

Yasodhara, the author of the latter, observes : 'All the chemical operations described in my book have been performed with my own hands—I am not writing from mere hearsay. Everything related is based upon my own conviction and observations.'

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ভারতবাসীর চিন্তাবিকাশকে সাধারণত অধ্যাত্মবিদ্যা-বিহ্বল বলে মনে করা হলেও আসলে পরীক্ষামূলক প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চাও তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষমূলক এবং পরীক্ষামূলক জ্ঞানই বিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি। ভারতীয় রসায়নবিদ্যার গ্রন্থে এই জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস দেখে বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে খুবই উৎসাহিত হবার কথা। আনুমানিক তেরো বা চোদ্দ শতকে রচিত রামচন্দ্র প্রণীত 'রসেন্দ্র-চিন্তামণি' এবং যশোধর প্রণীত 'রস-প্রকাশ-সুধাকর' গ্রন্থে এই জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয়েই জোর দিয়ে বলেছেন, শুধু শাস্ত্রের (রসায়ন-শাস্ত্রের) বচন বা গুরুমুখে শোনা কথার উপর নির্ভর করে তাঁরা কোনো কিছু লেখেননি ; তার বদলে তাঁদের সমস্ত বক্তব্যই পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু শুধু তেরো বা চোদ্দ শতকের বিজ্ঞান-সাহিত্যেই নয়, সুপ্রাচীন কালের শল্যবিদ্যা বা Surgery-র আকরগ্রন্থ 'সুশ্রুত-সংহিতা'-তেও প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপাদন করা হয়েছে ; এই কারণেই সুশ্রুত-মতে শবব্যবচ্ছেদ না করে প্রকৃত ভিষক্ হওয়া সম্ভব নয়। 'সুশ্রুত-সংহিতা'-র এই মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে :

"ত্বক্ পর্যন্ত সমস্ত দেহের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উক্ত হইয়াছে, শল্যজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার কোন অঙ্গ বর্ণন করিতে পারা যায় না। অতএব শল্যাপহর্তা যদি নিঃসংশয় (সন্দেহরহিত) জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটি মৃতদেহকে শোধন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্যক্রূপ দর্শন করা তাঁহার কর্তব্য। যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় এবং যাহা শাস্ত্রে দেখা যায় তদুভয়ই উভয় বিষয়ে সহজে অধিকতর জ্ঞান বর্ধন করিয়া থাকে ॥

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনার্থ যেরূপ শব গৃহীত হইবে, তাহাই বলা যাইতেছে।

শবটির যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, তাহা যেন বিষোপহত না হয়, দীর্ঘকাল ব্যাধিপীড়িত না হইয়া থাকে, শতবৎসর বয়স্কের দেহ না হয়। এইরূপ শবের অতঃপুরীষ নিষ্কাষিত করিয়া কোন নির্জন প্রদেশে তাহা একটি স্রোতহীন জলাশয়ে পচাইবে। মৎস্যাদিতে ভক্ষণ করিতে না-পারে এবং অন্য কোথাও সরিয়া না যায়, এইজন্য সেই জলাশয়ের জলের মধ্যে একটি মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ঐ শবকে রাখিতে হইবে, এবং মুঞ্জ বল্কল কুশ ও শণাদি রজ্জুর কোন রজ্জুদ্বারা তাহার সর্বাবয়ব বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে হইবে। সাতদিনের মধ্যেই উহা সম্যক পচিবে, তখন উহাকে তুলিয়া বেণারমূল, চুল, বাঁশের চেয়াড়ী বা কুঁচী দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া ত্বগাদি সমস্তই অর্থাৎ যথোক্ত বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে॥

…যিনি শবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে তৎসমস্ত অবগত হইয়াছেন, তিনিই আয়ুর্বেদবিশারদ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং শাস্ত্রশ্রুত বিষয়দ্বারা সন্দেহ নিরাকরণপূর্বক তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন।" (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর তর্জমা। শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়)।

আয়ুর্বেদের আকরগ্রন্থ—'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'য়—প্রত্যক্ষ-লব্ধ জ্ঞানের উপর চরম গুরুত্ব অর্পণের অজস্র নজির আছে। এখানে তার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুতের অবকাশ নেই। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার বিশেষ প্রলোভন হয়।

আয়ুর্বেদ-মতে অম্বষ্ঠ নামের একজাতীয় ফল আমাশয় জাতীয় রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রসূ, কেননা বহু দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে যে তা খেলে কোষ্ঠ-বদ্ধ হয়। আয়ুর্বেদ-মতে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতেই অম্বষ্ঠ জাতীয় ফলের এই উপযোগিতা স্বীকার্য। এবং প্রত্যক্ষর উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই একই ফলের বিপরীত গুণাগুণ হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও প্রমাণ করা অসম্ভব। 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় তাই বলা হয়েছে,

প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাঃ চ স্বভাবতঃ।
নৌষধী হের্তুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন॥
সহস্রেণাপি হেতূনাং ন অম্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।
তস্মাত্তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে ন তু হেতুষু॥ ১।৪১।২৩-২৪॥

—অর্থাৎ, সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ বিষয়কে শুধুমাত্র হেতু বা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া বিদ্বানের লক্ষণ নয়। যেমন, সহস্র হেতু প্রয়োগ করেও প্রমাণ করা যাবে না যে অম্বষ্ঠ জাতীয় ফল বিরেচনের কারণ হতে পারে।

তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, আয়ুর্বেদে যুক্তিতর্কের—এবং সাধারণভাবে অনুমানের—গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। 'চরক-সংহিতা'য় অনুমান নিয়ে দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনা আছে; সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর মতে এমনকি ন্যায়দর্শনের উৎস-সন্ধানে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনায় উপনীত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আয়ুর্বেদের অভিপ্রেত মত এই যে যুক্তিতর্ক এবং অনুমানের গুরুত্ব যতোই হোক না কেন, তা প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হলে বস্তুত অচল হয়ে যাবে। এই দাবিও ন্যায়দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়, কেননা 'ন্যায়-সূত্র'র ভাষ্যে বাৎস্যায়নও দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের মূল্য স্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপে, ন্যায়দর্শনের মতোই আয়ুর্বেদ-মতেও প্রত্যক্ষই প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ—প্রমাণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিরক্ত হয়ে কেউ হয়তো বলবেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় তো চার্বাকমত। কিন্তু তা ছেড়ে রসায়ন ও আয়ুর্বেদ নিয়ে এতো কথা কেন?

কারণ আছে। চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানের একটা বড়ো হাতিয়ার হলো তাদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা। চার্বাকমতকে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করবার উৎসাহে কথাটাকে বিকৃত করে বলা হয়েছে যে, চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; এমনকি সাধারণ লোকব্যবহারসিদ্ধ অনুমানকেও প্রমাণের মর্যাদা দিতে চার্বাকেরা নারাজ। আমরা নানা নজির থেকে দেখাবার চেষ্টা করেছি, এই দ্বিতীয় কথাটি স্বীকার করা যায় না—চার্বাকেরা একেবারে ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অগ্রাহ্য করেননি: প্রত্যক্ষই প্রধান; তবুও প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ বিষয়ে সাধারণ লৌকিক অনুমান মানায় তাঁদেরও আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তা স্বীকার করলেও মানতে হবে, চার্বাকেরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু চার্বাক-বিরোধীদের মন্তব্য এই যে, চার্বাকদের এই প্রত্যক্ষ-বিহ্বলতা স্বাভাবিক এবং এর থেকেই বোঝা যায় মতটা আসলে অত্যন্ত অসার। ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখভোগের

প্রতিই যাদের অমন টান—যাদের মনের মতো কথা শুধু এই যে খাও-দাও-ফুর্তি করো—তারা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া আর কীই বা মানতে পারে ?

উত্তরে আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি যে, পরলোকের কাল্পনিক সুখের আশায় ইহলোকের বাস্তব সুখের প্রতি বিরাগ চার্বাকমতে অবশ্যই বেকুবের কথা। প্রত্যক্ষলব্ধ ইহকালের কথা ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ পরকালের কল্পনাও তাইই। তবু এই নজির থেকে—চার্বাকের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা থেকে—দার্শনিক মত হিসাবে তার নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে, চার্বাকের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা একদিক থেকে দার্শনিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। কেননা, প্রত্যক্ষ-পরায়ণতাই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদের কাল থেকে মধ্যযুগের রসায়নবিদ্যা পর্যন্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যতোটুকু উৎকর্ষ তার মূলেও এই প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা। প্রত্যক্ষকেই প্রমাণজ্যেষ্ঠ বা প্রমাণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার না করে অন্যান্য দেশের মতো ভারতের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। এদিক থেকে বরং বলা যায়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অন্যান্য দার্শনিক মতের তুলনায় চার্বাকমতই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক ছিলো। অতএব, চার্বাকমতের আলোচনায় ভারতীয় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অবান্তর নয় ; পক্ষান্তরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৮ ॥ প্রত্যক্ষ-অনুগামী অনুমান

অবশ্যই নিছক প্রত্যক্ষ বা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমানের উপরও নির্ভর করা প্রয়োজন। আয়ুর্বেদের গ্রন্থেই তার ভূরিভূরি নিদর্শন আছে। অতএব অনুমানের আলোচনাও আছে। অন্বীক্ষা বা অনুমান শব্দটির অর্থ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অনু+ঈক্ষা, অন্বীক্ষা। অনু+মান, অনুমান। সহজ কথায়, পরবর্তী জ্ঞান—অন্য কোন জ্ঞানের অনুগামী জ্ঞান। কিন্তু কিসের পরবর্তী ? প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। সহজ কথায়, কোনো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল আরেক রকম জ্ঞান।

'চরক-সংহিতা'য় কথাটা খুবই স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে :

প্রত্যক্ষ-পূর্বং ত্রিবিধিং ত্রিকালং চ অনুমীয়তে।
বহ্নিঃ নিগূঢ়ঃ ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ ॥
এবং ব্যবস্যন্তী অতীতং বীজাৎ ফলম্ অনাগতম্।
দৃষ্ট্বা বীজাৎ ফলং জাতম্ ইহ এব সদৃশং বুধৈঃ ॥ ১।১১।২১-২ ॥

অনুবাদে বলা হয়েছে : 'যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব, ত্রিবিধ এবং তিন কালেই অনুমেয় হয়, তাহাকে অনুমান বলে। অনুমান প্রত্যক্ষ-পূর্ব, অর্থাৎ পূর্বে যাহার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেই অনুমান করা যায়। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান কখনই হইতে পারে না। অনুমান তিন প্রকার বলাতে কারণ-অনুমান, কার্য-অনুমান ও সামান্যদৃষ্ট-অনুমান বুঝায়। অনুমানের গতি যে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই হইয়া থাকে তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত যথা : ধূম দ্বারা বর্তমান বহ্নির অনুমান, গর্ভ দেখিয়া অতীত মৈথুনের অনুমান হয় এবং বীজ দেখিয়া সেই বীজে একবার যেরূপ বৃক্ষ ফলিয়াছিল, এবারেও তৎসদৃশ ফল ফলিবেক, এইরূপ ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায়।' (কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্মা কবিভূষণ)।

তাহলে 'চরক-সংহিতা'য় ত্রিবিধ অনুমানের কথা বলা হয়েছে : বর্তমান ধূম দেখে বর্তমান অগ্নির অনুমান, বর্তমান গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান এবং বর্তমান বীজ দেখে ভবিষ্যৎ বৃক্ষ ও ফলের অনুমান। কিন্তু এই তিন রকম অনুমানেরই মূল সর্ত হল পূর্ব-প্রত্যক্ষ। এই কারণে অনুমান প্রসঙ্গে প্রথম কথাই হলো 'প্রত্যক্ষ-পূর্ব'। প্রথমে প্রত্যক্ষ ; এবং সেই প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই অনুমান। বলাই বাহুল্য, এই মতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান জ্ঞানের কোনো স্থান নেই ; অতএব আত্মা, কর্মফল, পরকাল, পরলোক প্রভৃতি প্রসঙ্গে অনুমান অবান্তর হবে, কেননা এ-জাতীয় বিষয়ে কোনো পূর্ব-প্রত্যক্ষর সুযোগই নেই। এখানে অবশ্য একটি কথা বলে রাখা যায়। অধুনালভ্য 'চরক-সংহিতা'য় আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চোখে পড়ে। কিন্তু তার নজির থেকে আমাদের বর্তমান যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না। গ্রন্থান্তরে, *Science and Society in Ancient India* গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে আত্মা, পরলোক, প্রভৃতি আলোচনার সঙ্গে আয়ুর্বেদের প্রকৃত সারাংশের কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই। আসলে প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যার সমর্থনে আয়ুর্বেদ-বিদেরা গোমাংসাদি ভক্ষণ জাতীয় এমন অনেক

কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা ধর্মশাস্ত্রকারদের—অর্থাৎ সুপ্রাচীন আইনকর্তাদের—বিধান-বিরুদ্ধ। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রকারেরা চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করেছেন। ফলে, আইনকর্তাদের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের আশায় অধুনালভ্য 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় এমন অনেক আলোচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে যার সঙ্গে আয়ুর্বেদের সারাংশর প্রকৃত সম্পর্ক না থাকলেও অন্তত আপাতদৃষ্টিতে আয়ুর্বেদের উপর ধর্মশাস্ত্র-আনুগত্যের একরকম যেন মুখোস পরানো যায়। কে বা কারা এই আয়োজন করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই ; শুধু এইটুকু জানা আছে যে দীর্ঘযুগ ধরে অনেকের হাত ঘুরে—অনেক অবান্তর কথা সংযোজিত হয়ে—'চরক-সংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'র বর্তমান সংস্করণ আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতএব পরবর্তী সংস্কারক ও সম্পাদকদের পক্ষে আত্মাদি বিষয়ে আলোচনা সংযোজনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোট কথা, অনুমানের লক্ষণ ও তার ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে যে-উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই উক্তি অনুসারে একান্ত অপ্রত্যক্ষ আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে আয়ুর্বেদ-মতে অনুমানের সুযোগ নেই।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, বহু প্রাসঙ্গিক নজির থেকে মনে করা যেতে পারে যে অনুমান প্রসঙ্গে চার্বাকদেরও আসল বক্তব্য মোটের উপর একই রকম হওয়া সম্ভব। প্রত্যক্ষ-অনুগামী লৌকিক বিষয়ে অনুমান চার্বাকেরাও অগ্রাহ্য করেন নি। অতএব, এদিক থেকেও বলা যায়, বহু বিরূপ প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও চার্বাকমতকে একেবারে খেলো মনে করার কারণ নেই। পক্ষান্তরে ভারতীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে চার্বাকমতের অন্তত অনেকাংশে আত্মীয়তা চোখে পড়ে।

এখানে আরো চিত্তাকর্ষক একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর মতে ন্যায়-দর্শনের উৎস সন্ধানে আমাদের পক্ষে 'চরক-সংহিতা'য় ফিরে যাবার সম্ভাবনা ; অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-এর আকরগ্রন্থে প্রমাণ প্রসঙ্গে যে-আলোচনা আছে তাই কালক্রমে ন্যায়দর্শনের রূপ গ্রহণ করেছিলো। দাসগুপ্তর এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা—বর্তমানে আমাদের পক্ষে সে-আলোচনা তোলার দরকার নেই। কিন্তু এখানে একটি কথা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। 'ন্যায়সূত্র'-তে অনুমান প্রসঙ্গে প্রায় হুবহু একই কথা বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষর আলোচনার পরেই 'ন্যায়-সূত্র'কার বলছেন, 'অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঃ চ'। —'অনন্তর, অর্থাৎ প্রত্যক্ষনিরূপণের

অনন্তর অনুমান (নিরূপণ করিতেছি)। তৎপূর্বক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান অনুমান-প্রমাণ ত্রিবিধ : পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট।'

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় যাঁরা অনভ্যস্ত তাঁদের কাছে এই সূত্রের ব্যাখ্যা অল্পবিস্তর কঠিন মনে হতে পারে, যদিও ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সূত্রটির যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা তাঁর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করবো। তারই ভিত্তিতে চার্বাকদর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের একরকম আত্মীয়তা দেখা যাবে। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের কাছে পুরো উদ্ধৃতিটি অবশ্যপাঠ্য নয়; তাঁরা এই অংশ বাদ দিয়েও বর্তমান আলোচনা অনুসরণ করতে পারেন। পরে, এই উদ্ধৃতির সারাংশ অবলম্বন করেই আমরা সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করবো, কেন চার্বাকদর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের কোনো একরকম আত্মীয়তা—বা অন্তত মৌলিক সাদৃশ্য—স্বীকার করার কারণ আছে, যদিও অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও অবজ্ঞা করা যায় না। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ফণিভূষণ বলছেন,

"পূর্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই এই সূত্রের প্রথমোক্ত 'তৎ' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। তাহা হইলে 'তৎপূর্বক' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রত্যক্ষ-পূর্বক। কিন্তু যে-কোনো প্রত্যক্ষ-পূর্বক জ্ঞানকে অনুমান বলিলে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শব্দবোধও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। সুতরাং উক্ত 'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষবিশেষই মহর্ষির (অর্থাৎ 'ন্যায়সূত্র'-কারের) বিবক্ষিত ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ কী? ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'লিঙ্গলিঙ্গিনো সম্বন্ধদর্শনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ'। যে স্থলে অনুমানের যাহা প্রকৃত হেতু, তাহাকে বলে 'লিঙ্গ'। এবং তাহা যে পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক, সেই অনুমেয় পদার্থকে বলে 'লিঙ্গী'। যে যে স্থানে সেই লিঙ্গ পদার্থ থাকে সেই সমস্ত স্থানেই সেই লিঙ্গী পদার্থ অবশ্য থাকে। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থটি ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী পদার্থ তাহার ব্যাপক। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থের এবং লিঙ্গী পদার্থের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে। পূর্বে কোন স্থানে সেই সম্বন্ধের তাহাই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। যেমন ধূম লিঙ্গ এবং বহ্নি লিঙ্গী। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ধূম ও বহ্নির কার্যকারণভাব সম্বন্ধবশতঃ ধূমের উৎপত্তিস্থান মাত্রেই অবশ্যই বহ্নির সত্তা স্বীকার্য। সুতরাং ধূমরূপে ধূম ব্যাপ্য, এবং বহ্নিরূপে বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ হওয়ায় ঐ উভয়ের ব্যাপ্যব্যাপকভাবে সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থকেই

ব্যাপ্য বলে।…প্রথমে উক্ত ব্যাপ্তিসম্বন্ধের নিশ্চয় ব্যতীত কোন স্থানে ধূম দর্শন করিলেও তৎ দ্বারা সেখানে বহ্নির অনুমিতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়াছেন।…এই সূত্রে 'তৎ' শব্দের দ্বারা যে প্রত্যক্ষবিশেষ মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তাহা ভাষ্যকারের মতে প্রথমোৎপন্ন লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরে উৎপন্ন লিঙ্গের প্রত্যক্ষ। পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে যে ধূমদর্শন, তাহাই প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। ভাষ্যকার পরে 'লিঙ্গদর্শনঞ্চ' এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমত্বরূপে ধূমের এবং বহ্নিত্বরূপে বহ্নির যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন। সেই প্রত্যক্ষজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এই সংস্কার জন্মে। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূম দর্শন করিলে তৎজন্য সেই পূর্বোৎপন্ন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তৎজন্য 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য' এইরূপ স্মৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি না হইলে সেখানে অনুমিতি জন্মে না।…কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি হইলেও উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে না। সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অনুমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন—'স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন অপ্রত্যক্ষঃ অর্থ অনুমীয়তে'। ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ লিঙ্গদর্শন অনুমেয় ধর্মের 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান' এবং উহারই নাম 'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ'। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধূমদর্শনের পরে পর্বতে ধূমদর্শন হওয়ায় পরে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম' এইরূপে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট স্মরণ হইলে পরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বত' এইরূপে পর্বতে আবার যে ধূমদর্শন হয়, তাহাই শেষোক্ত তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন। তাই উহা 'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ' কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই 'পর্বতো বহ্নিমান্' এইরূপে সেই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। পূর্বোক্ত তৃতীয় পরামর্শের পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন ও পূর্বদৃষ্ট সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অনুমিতির চরম কারণ সেই লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান 'তৎপূর্বক জ্ঞান'। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উহা অনুমানপ্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হয়।"

ফণিভূষণের ব্যাখ্যা আরো বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করার প্রলোভন হয়। কিন্তু

এখানে তার সুযোগ নেই। হয়তো প্রয়োজনও নেই। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন তোলার দরকার আছে। 'ন্যায়সূত্র'র আলোচ্য সূত্রটির সরল অর্থ শুধু এই যে, অনুমান বলতে বোঝায় "প্রত্যক্ষ-পূর্বক" অর্থাৎ আগেকার কোন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল প্রমাণ ; তা তিন রকম : পূর্ববৎ (সোজা কথায় বর্তমান কারণের প্রত্যক্ষ থেকে ভাবী কার্যর অনুমান : যেমন মেঘ দেখে অনুমান হয় বৃষ্টি হবে) ; শেষবৎ (সোজা কথায়, কার্য থেকে কারণ অনুমান : যেমন নদীর জলস্ফীতি প্রভৃতি দেখে অনুমান হয় অতীতে বৃষ্টি হয়েছিলো) ; এবং সামান্যতোদৃষ্ট (যেমন কোনো বস্তুর স্থানান্তরপ্রাপ্তি থেকে তার গতি অনুমান : সূর্যের গতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, কিন্তু আকাশে সূর্যের স্থানান্তর প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করে অনুমান হয় তার গতি আছে)। অবশ্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই তিনরকম অনুমানের প্রত্যেকটির দু'রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ; কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে জটিলতায় প্রবেশ করার দরকার নেই।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন তোলা হয়তো অসঙ্গত হবে না। 'ন্যায়-সূত্র'টির সরলার্থর তুলনায় যে-বিস্তৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছি তা মূলতই বাৎস্যায়ন-ভাষ্যর উপর নির্ভরশীল। তাই ফণিভূষণ একাধিকবার বলেছেন, কথাগুলি ভাষ্য থেকে গৃহীত হলেও সেগুলি সূত্রকারের 'বুদ্ধিস্থ'। অর্থাৎ কথাগুলি আসলে সূত্রকারেরই মাথায় ছিলো ; ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তারই তুলনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একথা না-বলে অবশ্য উপায় নেই ; কেননা তা না-হলে সমগ্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যই অবান্তর বলে বিবেচিত হবার আশঙ্কা। কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে অন্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়। অবশ্যই 'ন্যায়-সূত্র' এবং 'বাৎস্যায়নভাষ্য'র সুনিশ্চিত রচনাকাল আমাদের জানা নেই ; তবুও দুই এর মধ্যে অন্তত কয়েক শতকের ব্যবধান মানতেই হবে। এই কয়েক শতকের মধ্যে সূত্রকারের তুলনায় সরল বক্তব্যর সমর্থনে অল্পবিস্তর জটিল দার্শনিক বিচার নৈয়ায়িকদের মধ্যেই পল্লবিত হওয়া অসম্ভব নয়। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে ভাষ্যকারের পুরো আলোচনা এবং 'ন্যায়সূত্র'-র অপেক্ষাকৃত সরল বক্তব্য সম্পূর্ণ অভিন্ন না-হতেও পারে। অবশ্যই বিদ্বানরা এ জাতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করবেন না, কেননা বাৎসায়নভাষ্য বাদ দিয়ে বা অবজ্ঞা করে 'ন্যায়-সূত্র'র মর্মার্থ বোঝবার কোনো প্রথা নেই এবং হয়তো তা সম্ভবও নয়। তবুও এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উত্তরকালে 'ন্যায়-সূত্র'র ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা নানা নতুন দার্শনিক সমস্যার সম্মুখীন

হয়েছিলেন বলেই 'ন্যায়সূত্র'র সমর্থনে অনেকরকম নতুন নতুন দার্শনিক বিচার উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন: বাৎস্যায়নের পর উদ্দ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বার্তিক' গ্রন্থে, এবং উদ্দ্যোতকরের পর বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'ন্যায়বার্তিক-টীকা'য়—তাছাড়া জয়ন্তভট্ট, উদয়ন থেকে গঙ্গেশ পর্যন্ত সকলেই 'ন্যায়সূত্র'র প্রামাণ্য অনুসরণ করে যতো কথা বলেছেন তা সবই 'ন্যায়সূত্রে' অস্ফুটভাবে বর্তমান—একথা কল্পনা করায় বাধা আছে, কেননা এদের মধ্যেও পারস্পরিক মতভেদ বর্তমান।

আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে এই কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'ন্যায়-সূত্র'র সরল অর্থ অনুসারে অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ-নির্ভর। অর্থাৎ, আগে প্রত্যক্ষ এবং সেই প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই অনুমান। শেষ কথায় ফণিভূষণ যেমন বলেছেন, 'প্রত্যক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়েরও কার্য-কারণ ভাব আছে।' (ন্যায়দর্শন ১/১৩১)।

অনুমান প্রসঙ্গে এই কথাই যদি ন্যায়দর্শনের সারাংশ হয় তাহলে চার্বাক-মতের সারাংশর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় এবং কতোখানি? চার্বাক কোনো অর্থেই অনুমান মানতেন না—একথা চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক। বরং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করা চার্বাকমতসম্মত হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ চার্বাকমতেও অনুমান প্রত্যক্ষ-পূর্বক—যদিও কথাটি "লিঙ্গপরামর্শ" প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করে প্রকাশ করার দার্শনিক কৌশল চার্বাকদের জানা ছিলো, এমন কোনো ইংগিত কোথাও পাওয়া যায় না।

অবশ্যই ন্যায়দর্শনের গ্রন্থাবলীতে চার্বাকমত খণ্ডনের ভূরি ভূরি নজির আছে। তাছাড়া অনুমানকে "প্রত্যক্ষ-পূর্বক" বলে স্বীকার করলেও ন্যায়-দর্শনে আত্মা, প্রেত্যভাব (বা পুনর্জন্ম) প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমানও বিরল নয়। কিন্তু এ-সবের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের সারাংশের কতোখানি মিল হয়, সে-বিষয়েও স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। আপাতত আমাদের মন্তব্য শুধু এই যে, অনুমানকে "প্রত্যক্ষ-পূর্বক" বলে গ্রহণ করে নৈয়ায়িকেরা যে-মতের উল্লেখ করছেন তার সঙ্গে অনুমান-প্রসঙ্গে প্রকৃত চার্বাকমতের খুব একটা পার্থক্য থাকে না।

৮। উপসংহার

চার্বাকমতকে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করার উৎসাহে অনেকে বলেছেন, এই মতে নিছক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুর প্রামাণ্য নেই। অতএব চার্বাকেরা অনুমান মানেন না। কিন্তু বহু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষগোচর—বা প্রত্যক্ষ-অনুগামী—লৌকিক অনুমান স্বীকার করায় চার্বাকদের আপত্তি ছিলো না। শুধু তাই নয়। চার্বাকদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা—এবং প্রত্যক্ষ-অনুগামী অনুমানের স্বীকৃতি —ভারতীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি এবং এমনকি ন্যায়দর্শনের সারাংশের সঙ্গে একরকম আত্মীয়তার আভাস পাওয়া যায়। অতএব মতটি একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মতো খেলো নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেহ, আত্মা

১ ॥ প্রাথমিক কথা

পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা চার্বাকমত হিসাবে প্রধানত দুটি দাবি খণ্ডন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন :

এক : প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অতএব অনুমানের কোনো প্রামাণ্য নেই।

দুই : দেহাত্মবাদ। অর্থাৎ দেহ ছাড়া আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। আত্মা বলে একান্তই যদি কোনো শব্দ ব্যবহার করতে চাও তাহলে ওই দেহকেই আত্মা বলে মানো।

আগের পরিচ্ছেদে আমরা প্রথম কথাটি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, চার্বাকদের ঘাড়ে এ-হেন একটা দাবি চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে বেশ কিছুটা কারসাজির পরিচয় আছে বলে সন্দেহ হয়। কেননা, ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য নানা সাক্ষ্য থেকে অনুমান হয় যে, চার্বাকেরা আসলে অনুমান প্রমাণকে বরবাদ করে প্রত্যক্ষকেই এক এবং অদ্বিতীয় প্রমাণ বলে ঘোষণা করতে চাননি। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষ অবশ্যই প্রমাণ-শ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষর অনুগামী অর্থে অনুমানকেও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার বাধা নেই। আমাদের যুক্তি তথ্য যদি ঠিক হয় তাহলে প্রকৃত চার্বাকমতের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক মতের এবং 'চরক-সংহিতা'য় স্বীকৃত বিজ্ঞানের খুব একটা তফাৎ থাকে না, বিপক্ষ দল চার্বাকদের প্রত্যক্ষ-সংক্রান্ত যে কোনো দাবিকে গেলাবার যতোই চেষ্টা করুন না কেন।

বর্তমান পরিচ্ছেদে চার্বাকদের দ্বিতীয় কথাটি নিয়ে আলোচনা করবো ঃ

প্রথমে সাদামাটা ভাষায় মতটির সারমর্ম উল্লেখ করা যাক। তারপর দেখা যাবে, বিপক্ষ দার্শনিকেরা কীভাবে মতটি ব্যাখ্যা করতে চান, তার সমর্থনে চার্বাকদের কোন্ ধরনের যুক্তি উল্লেখ করে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন্ ধরনের বিচারের উপর নির্ভর করে মতটি বর্জন করার উপদেশ দেন। সাধ্যমতো সংক্ষেপে এই আলোচনা সেরে আমরা শেষে করবো চার্বাকদের দেহাত্মবাদের তাৎপর্য আসলে কতো গুরুত্বপূর্ণ।

চার্বাকেরা আত্মা মানেন না। কিংবা, তাঁদের বিচারে দেহ ছাড়া বা দেহ-অতিরিক্ত আত্মা বলে আলাদা কিছু মানা যায় না। মাটি, জল, আগুন, বাতাস—তামাম দুনিয়ার সব কিছুরই উপাদান। দেহরও। অনেকে অবশ্য এই চার রকম ভূতপদার্থ ছাড়াও আকাশ নামে এক পরম ভূতপদার্থ স্বীকার করার প্রস্তাব করেছেন। কেন করেছেন, সে-কথা জটিল, তার আলোচনায় বিক্ষিপ্ত না-হয়ে আপাতত মন্তব্য এই যে তাঁদের মতে চতুর্ভূতের বদলে পঞ্চভূতের কথাই মানা দরকার। কিন্তু তা যাই হোক-না-কেন, চার্বাকমতে নিছক ভূতপদার্থ দিয়ে গড়া আমাদের দেহ ছাড়া আত্মা বলে আর কিছু মানবার কোনো কারণ নেই।

চলতি কথায় আমরা অবশ্য বলি "আমার দেহ"। অর্থাৎ, যেন "আমি" এক এবং দেহটি আলাদা কিছু। এবং "আমি" বা "আমার" বলতে যা উল্লেখ করছি—তাইই যেন ওই "দেহ"র মালিক। এ-হেন মালিক আত্মা ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? চার্বাকমতে এ-হেন যুক্তি ধোপে টেঁকে না। "আমার দেহ" নেহাতই কথার কথা; ভারতীয় পারিভাষায় তাকে বলে উপচার। কিন্তু এ-হেন ঔপচারিক ব্যবহার থেকে "আমি" আর "দেহ"-র মধ্যে তফাৎ করতে যাওয়াটা অবান্তর হবে। কথার কথা হিসেবে তো অনেক সময় "রাহুর মাথা"-ও বলা হয়। তাই বলে কি স্বীকার করতে হবে যে "রাহু" এক, এবং তার "মাথা" বলতে অন্য কিছু। রাহুর কথা তো পুরাণকারদের কাছে শোনা এবং তাঁদেরই মতে, ওই মাথাই রাহুর সর্বস্ব; মাথাটির মালিক হিসেবে রাহু বলে স্বতন্ত্র কারুর কল্পনা একান্তই অবান্তর। তাই অতো সহজে—কথার কথার নজির দেখিয়ে—দেহ ছাড়াও আত্মা বলে কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, বা দেহাত্মবাদ খণ্ডন করা সম্ভব নয়। বরং, যাঁরা স্বতন্ত্র আত্মা মানেন তাঁদেরই বিপদে পড়ার ভয় আছে। যেমন, আমরা তো হামে-

শাই বলে থাকি, 'আমি রোগা', 'আমি কালো', 'আমি ফর্সা'। এ-জাতীয় ক্ষেত্রে 'আমি' বলতে দেহ ছাড়া আর কি বোঝা যেতে পারে? কালোই বলুন আর ফর্সাই বলুন, রোগাই বলুন আর মোটাই বলুন—এ সবই দেহধর্ম বা দেহের গুণ। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তেও আত্মবাদীরা—অর্থাৎ, আত্মায় বিশ্বাসীরা—'আমি' বলতে কি আত্মা বোঝাবেন? তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা তামাশার মতো শোনাবে: আত্মাটি মোটা বা রোগা, কালো বা ফর্সা—এ-জাতীয় কথা মানতে হবে।

অবশ্যই লৌকিক ভাষা-ব্যবহারের নজির থেকে কোনো মতের দার্শনিক মূল্যায়ন হয় না। দেহাত্মবাদেরও নয়। তার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যে দার্শনিক বিচারের অবতারণা প্রয়োজন। দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে তাই আমরা মূলত চারটি বিষয়ের আলোচনা করবো।

১ ॥ দেহাত্মবাদের সমর্থনে চার্বাকদের পক্ষে কোন্ ধরনের নজির দেখানো সম্ভব?

২ ॥ দেহাত্মবাদ খণ্ডনে বিপক্ষ দার্শনিকরা কী যুক্তি প্রস্তাব করেন?

৩ ॥ এজাতীয় যুক্তি দিয়ে দেহাত্মবাদ কি সত্যিই নস্যাৎ হয়?

৪ ॥ সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদের প্রকৃত তাৎপর্য কী?

২ ॥ দেহাত্মবাদের সমর্থনে

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে কঠিন। কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি চার্বাকমত পুনর্গঠনের পক্ষে আজকের দিনে আমাদের আসল সম্বল বলতে খুবই কম: 'অর্থশাস্ত্র'-জাতীয় কিছু প্রাচীন পুঁথিপত্রের নজির ছাড়া কিছু প্রামাণিক লোকগাথা এবং পূর্বপক্ষ হিসাবে বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু রচনা। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণনার উপর নির্বিচারে নির্ভর করা নিরাপদ নয়। খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত কোনো মত সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ না-হবারই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে কিছুটা কারসাজিই থাকতে পারে। অর্থাৎ, পূর্বপক্ষ বর্ণনায় এমন যুক্তি বা বিচার গুঁজে দেবার প্রবণতা অসম্ভব নয়, যার অন্তঃসারশূন্যতা দেখানো তুলনায় সহজ হয়। অবশ্যই ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরকে খণ্ডন-

করতে চেয়েছে, অতএব পূর্বপক্ষ হিসেবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখও করেছে। তবে ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত, পূর্বমীমাংসা, জৈন ও বিবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা আলাদা ; এগুলির সমর্থনে রচিত নানা গ্রন্থ বর্তমান। পূর্বপক্ষ হিসাবে এগুলির বর্ণনায় কারসাজির কোনো চেষ্টা থাকলেও তা সনাক্ত করা কঠিন নয়। কিন্তু চার্বাকদের নিজস্ব রচনা এককালে যে বর্তমান ছিলো—সে-বিষয়ে মোটের উপর সুনিশ্চিত নজির থাকলেও, বাস্তব পরিস্থিতিটা এই যে, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, আজ তা বিলুপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত জয়রাশিভট্টর 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' বলে বইটি নিয়ে অবশ্যই বেশ কিছুটা সোরগোল পড়েছিলো। কেননা এর সম্পাদকেরা মনে করেছিলেন প্রসিদ্ধ চার্বাক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ না-হলেও কোনো-এক-কালে কোনো-এক-দেশে কোনো-একরকম "সর্বপ্রমাণ-বিরোধী" চার্বাক সম্প্রদায় সম্ভবত বর্তমান ছিলো ; এই গ্রন্থে তারই মত বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বইটা নিয়ে সোরগোল আজকাল প্রায়াংশেই স্তিমিত। অগ্রণী বিদ্বানদের বস্তুনিষ্ঠ বিচারে প্রমাণ হয়েছে চার্বাকমতের সঙ্গে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পর্ক মোটের উপর কল্পিতই : বইটিতে আসলে একরকম চরম সংশয়বাদেরই পরিচয় রয়েছে— অনেকটা শ্রীহর্ষর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-র মতোই, যদিও স্বয়ং শ্রীহর্ষ সর্বপ্রমাণ খণ্ডন করে অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শনের সমর্থন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার তাৎপর্য যাই হোক-না-কেন, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই যে চার্বাকমতের সমর্থনে রচিত কোনো বইএর অভাবে পূর্বপক্ষ হিসাবে বিরুদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় কম-বেশি কারসাজি থাকলেও তা সনাক্ত করা সহজ নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান অবলম্বন বলতে বোধ হয় চার্বাকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি : আলোচ্য পূর্বপক্ষের সঙ্গে প্রামাণিক লোকগাথাগুলির যতোটা সঙ্গতি অন্তত ততোটা পর্যন্ত ওই পূর্বপক্ষ-বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করায় বাধা নেই। তাছাড়া আরো একটা ভাববার মতো কথা আছে : সমস্ত বিরুদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় দেহাত্মবাদের সমর্থনে বর্ণিত যুক্তিতর্ক সমান নয়। নানা দার্শনিক দেহাত্মবাদের বর্ণনায় নানা রকম যুক্তিতর্কের—এমনকি রকমারি কূটতর্কের অবতারণা করেছেন। এদিক থেকেও ভেবে দেখার সুযোগ আছে কোন্ যুক্তি চার্বাকদের প্রকৃত অভিপ্রায় হবার সম্ভাবনা আর কোন্ যুক্তি বিরুদ্ধ-কল্পনায় অনুপ্রাণিত।

৩ ॥ শঙ্করাচার্য বর্ণিত দেহাত্মবাদ

উপরের কথাগুলি মনে রেখে পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের কিছু নমুনা আলোচনা করা যাক।

শঙ্করাচার্যর বর্ণনা থেকে আলোচনাই সুবিধাজনক হবে। তার কারণ অবশ্যই এই নয় যে শঙ্করের পক্ষে দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে তুলনায় কোন সহনশীলতার পরিচয় সম্ভব। পক্ষান্তরে, শঙ্করমতের সম্পূর্ণ বিপরীত বলতে ভারতীয় দর্শনে যদি কিছু থাকে তাহলে এই দেহাত্মবাদই : চার্বাকমতে দেহই সত্য, আত্মা বলে কিছু নেই ; শঙ্করমতে আত্মাই একমাত্র সত্য, তথাকথিত দেহ বলে বস্তুটি অজ্ঞানের ঘোরে সাময়িক কল্পনামাত্র। তবুও শঙ্করের বর্ণনা থেকে শুরু করাই ভালো। তার একটা বড়ো কারণ এই যে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে শঙ্করের মতো সহজ-সরল গদ্য রচনার নমুনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আলঙ্কারিকদের ভাষায়, শঙ্করের লেখা প্রসাদগুণে অতুলনীয়। কূটতর্কের বিশেষ বালাই নেই, কেননা শঙ্কর যুক্তিতর্কেরই বড়ো একটা ধার ধারতেন না। তাঁর নিজের দাবি অনুসারে মায়াবাদ বা অদ্বৈত-বেদান্তর আসল খুঁটি হলো শাস্ত্র বা শ্রুতি-স্মৃতি। শ্রুতি-স্মৃতির উপর নির্ভর না করে স্বাধীন যুক্তিতর্কের প্রতি যে-কোনো প্রবণতাই অজ্ঞানের কুহেলিকায় দিশেহারা হতে বাধ্য। তবে নেহাতই নিকৃষ্ট পরমত খণ্ডনের জন্যে—বা পাঠক-সাধারণের মোহমুক্তির উদ্দেশ্যে—যুক্তি-তর্কের কিছু গৌণ মূল্য থাকতে পারে। এই কারণে তিনি তুলনায় সীমিত অর্থে তর্কবিতর্করও পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর রচনায় দেহাত্মবাদের বর্ণনাও যেমন সহজ-সরল, দেহাত্মবাদের খণ্ডনও তেমনি সাদা-মাটা।

অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত ও তাঁর ব্যাখ্যাকার কমলশীল দেহাত্মবাদের বর্ণনা ও খণ্ডন উভয় প্রসঙ্গেই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ; জৈন দার্শনিক হরিভদ্রর ব্যাখ্যাকার—বিশেষত গুণরত্ন—দেহাত্মবাদ নিয়ে পাতার পর পাতা লিখেছেন ; প্রভাচন্দ্র নামে অপর এক জৈন মহাতার্কিক তাঁর 'ন্যায়কুমুদচন্দ্র' এবং 'প্রমেয়-কমলমার্তণ্ড' বলে বইতে দেহাত্মবাদের বিচারে বিস্তর বাগ্‌বিস্তার করেছেন। আরো অনেকেই করেছেন এবং তাঁদের রচনায় তর্কবিতর্কের মারপ্যাচ বোঝা সহজসাধ্য নয়। লোকায়তর অর্থ যদি হয় "লোকেষু আয়ত" বা জনসাধারণের

মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহলে সহজেই সংশয় হবে, চার্বাক বা লোকায়তিকেরা সত্যিই অতোশতোর ধার ধারতেন কি না !

কিন্তু শঙ্করের লেখা একেবারে অন্য রকম। এমন সহজ-সরল ভাষায় তিনি লোকায়তিকদের দাবিটা বর্ণনা করেছেন যে, সাধারণ পাঠক অল্প আয়াসেই তা বুঝতে পারেন। আরো কথা আছে। আমরা একটু পরেই দেখবো, শঙ্করের দেহাত্মবাদ বর্ণনার সঙ্গে লোকায়তিকদের প্রামাণিক লোকগাথারও অন্তত অনেকাংশে মিল হয়। অবশ্যই এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না যে শঙ্করের দেহাত্মবাদ বর্ণনায় একেবারেই কোন রকম কারসাজি নেই। কিন্তু যদিই বা থাকে তাহলেও তিনি সেটা সহজ-সরল ভাষায় দেহাত্মবাদীদের বক্তব্যর সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে তা সনাক্ত করা সহজসাধ্য নয়।

শঙ্করের দেহাত্মবাদ বর্ণনার পক্ষে আরো একটা কথা আছে। অন্যান্য নানা অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দেহাত্মবাদ নিয়ে যেটা প্রধান বিতর্ক শঙ্কর সরাসরি তারই আলোচনা তুলেছেন। কিসের বিতর্ক ? দেহাত্মবাদীর মতে দেহগঠনের মূল উপাদান বলতে আগুন, বাতাস, জল ও মাটি। ভূতপদার্থই। কিন্তু এই উপাদানগুলির মধ্যে কোথাও চেতনা বা চৈতন্যের পরিচয় নেই। এগুলির সবই নিছক অচেতন বা জড়পদার্থ। অথচ, মানুষ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টভাবেই চেতনার পরিচয়। এবং এই চৈতন্যর সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ হয় যে মানবাদির ক্ষেত্রে আত্মা বলে অতিরিক্ত কিছু মানা দরকার, কেননা আত্মাই চেতনপদার্থ বা চৈতন্যবিশিষ্ট। দেহাত্মবাদ নিয়ে অন্যান্য দার্শনিকেরাও যতো তর্ক তুলুন-না-কেন, শেষ পর্যন্ত সবকিছুই এই চৈতন্য বা চেতনার নজিরটির উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্বাকেরা এ-বিষয়ে কী উত্তর দেবেন ?

দেহাত্মবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসেবে শঙ্কর বলছেন, "দেহমাত্রং চৈতন্য-বিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতজনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ।" অর্থাৎ, অশিক্ষিত বা ইতর জনগণ এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। তার মানে, লোকায়তমতে চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। কিন্তু নিছক অচেতন বা জড় বস্তু দিয়ে গড়া এই দেহই কী করে চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যগুণ যুক্ত হতে পারে ? একই গ্রন্থের অন্যত্র শঙ্কর লোকায়তমতের বর্ণনায় এই প্রশ্নের কিছুটা বিশদ উত্তর দিয়েছেন। কিছুটা স্বাধীন তর্জমায় তার উল্লেখ করা যাক : "লোকায়তিকেরা বলে আত্মা বলে কিছুই নেই ; নিছক দেহকেই

তারা আত্মা বলে বোঝে। তাদের মতে পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্য ভূতবস্তুগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে এবং এমনকি মিলিতভাবেও চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবস্তুগুলিই শরীরাকারে পরিণত হলে তাতে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। অতএব জ্ঞান বা চৈতন্য (ভারতীয় পরিভাষায় 'বিজ্ঞান') মদশক্তির মতো। অর্থাৎ, মদ তৈরি করার জন্যে কিণ্ব—খামির বা গাঁজ—প্রভৃতি বস্তু ব্যবহার করা হয়। এগুলির কোনোটিতেই মদশক্তির পরিচয় নেই : সোজা কথায়, এগুলির কোনোটি খেলেই নেশা হয় না। কিন্তু এগুলি দিয়েই মদ তৈরি করলে—বা এগুলিই মদিরাকারে পরিণত হলে—তাতে মদশক্তির উদ্ভব হয় বা এগুলি দিয়ে তৈরি মদ গিললে নেশা হয়। এইভাবেই পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুগুলিই দেহ আকারে পরিণত হলে—অর্থাৎ এগুলি থেকেই দেহ তৈরি হলে—সেই দেহে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। তাই ওরা—লোকায়তিকেরা—বলে মানুষ বলতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দেহ ছাড়া, স্বর্গগমন বা মোক্ষলাভে সমর্থ আত্মা বলে আর কিছু নেই। এমনতর কথা বলা যাবে না যে দেহের মধ্যে আত্মা বলে আলাদা কিছু আছে বলেই দেহে চৈতন্যের পরিচয়। লোকায়তমতে দেহই সচেতন, বা—আত্মা বলে কোনো কিছুর কথা যদি বলতেই চাও, তাহলে—ওই দেহকেই আত্মা বলো। এই মতের সমর্থনে সূত্র আছে : 'শরীরে ভাবাৎ'। অর্থাৎ, যা বর্তমান থাকলে অপরকিছু বর্তমান থাকে, এবং যার অবর্তমানতায় সেই অপরকিছুও অবর্তমান হয়, সেই অপরকিছুকে তারই ধর্ম বলতে হবে। যেমন, অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা ও প্রকাশ : আগুন থাকলে তাপ ও আলো থাকে, আগুন না-থাকলে তাপ ও আলো থাকে না; অতএব তাপ ও আলো আগুনেরই ধর্ম। আত্মবাদীরা—অর্থাৎ যাঁরা দেহ ছাড়াও আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু মানতে চান, তাঁরা— প্রাণ, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে ওই আত্মার ধর্ম বা গুণ বলে কল্পনা করেন। কিন্তু এসবই দেহতেই উপলব্ধ হয়, দেহ ছাড়া আর কোথাওই উপলব্ধ হয় না। তাই দেহ ছাড়া—বা দেহ-অতিরিক্ত—আত্মা বলে এমন কিছু মানা যায় না যার ধর্ম বা গুণ বলতে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে স্বীকার করার সুযোগ আছে। দেহের বর্তমানতায় বর্তমান এবং অবর্তমানতায় অবর্তমান বলে এগুলিকে দেহধর্ম বলেই মানতে হবে। এই অর্থে দেহই আত্মা।"

দেহাত্মবাদের এরকম 'সহজ ও সরল বর্ণনা ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে

দুর্লভ। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে লোকায়তিক সূত্র হিসেবে শঙ্কর 'শরীরে ভাবাৎ' বলে যে-কথা উদ্ধৃত করেছেন তা তিনি কোথা থেকে পেলেন জানা নেই। তবে এটুকু বোঝা কঠিন নয় যে সূত্রটির তাৎপর্যর সঙ্গে দেহাত্মবাদের মিল হয়। যদি এমন হয় যে লোকায়তমতের প্রকৃত তাৎপর্য দার্শনিক পরিভাষায় বোঝাতে গিয়ে শঙ্কর এ-হেন একটি সূত্র নিজেই জুড়ে দিয়েছেন তাহলে কিন্তু সন্দেহ করার কারণ থাকে যে শঙ্কর নিজের বিপদ নিজেই টেনে এনেছেন। কিছু পরেই আমরা একথার ব্যাখ্যা করবো।

আপাতত অন্য একটি লোকায়তিক বক্তব্য আলোচনা করা যাক। মদ-শক্তিবৎ। মদ্য প্রস্তুতের নানা উপকরণ। স্বতন্ত্র কিংবা মিলিত অবস্থায় (অর্থাৎ একসঙ্গে জড়ো করে দিলেও) এগুলির মধ্যে মদশক্তির বা নেশা ধরানোর সামর্থ্য থাকে না। অথচ, এগুলিরই কোনো-এক-রকম 'বিশেষ পরিণামে'র ফলে মদ তৈরি হলে সেই মদ গিললে নেশা হয়। 'বিশেষ পরিণাম' শব্দটি অবশ্য শঙ্কর নিজে ব্যবহার করেননি। কিন্তু জয়ন্তভট্ট করেছেন এবং তা করে শঙ্করের অভীষ্ট বক্তব্য আরো প্রাঞ্জল করেছেন। কেননা, মদ তৈরির উপকরণগুলি যে-কোনো-ভাবে একজায়গায় জড়ো করলেই মদ পাওয়া যায় না; অথচ এগুলিকেই কোন এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে মদ তৈরি হয়। এই ঘটনার নজির দেখিয়ে লোকায়তিকেরাও বলবেন, আগুন, বাতাস, জল আর মাটি যেমন-তেমন করে একত্র জড়ো করলেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু এগুলিরই কোনো-এক-রকম বিশেষ পরিণামের ফলে প্রাণ-চেষ্টা-চৈতন্য-স্মৃতিবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়।

পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের আলেয়ার টানে দেহাত্মবাদের বর্ণনা হিসেবে আরো অনেক দার্শনিকের অনেক পল্লবিত আলোচনা উদ্ধৃত করার লোভ হতে পারে। এবং তা খুব কঠিনও নয়। শান্তরক্ষিত, কমলশীল থেকে শুরু করে গুণরত্ন প্রমুখ অনেকের গ্রন্থ সামনে রয়েছে; তার থেকে উদ্ধৃতি সংকলন বেশ কিছুটা আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে সে-প্রয়াস করবো না। তার একটা কারণ এই যে এ-জাতীয় বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করে উক্ত দার্শনিকেরা স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনেরই অল্পবিস্তর প্রয়াস করেছেন বলে সন্দেহের অবকাশ আছে, কেননা এই প্রসঙ্গে তাঁরা এতোরকম কূট বিচারের অবতারণা করেছেন যার তোয়াক্কা লোকায়তিকেরা সত্যিই করতেন বলে মনে হয় না।

পক্ষান্তরে লোকায়তিকদের প্রামাণ্য লোকগাথাগুলি থেকে অনুমান হয়, তাঁরা সত্যিই অতোশতোর ধার ধারতেন না। দ্বিতীয়ত, মনে হয়, খুবই সংক্ষেপে এবং নেহাতই সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করলেও চার্বাকমতের বিশিষ্ট বক্তব্যটির হদিস শঙ্করের উপরি-উদ্ধৃত রচনাটুকুর মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। এই বিশিষ্ট বক্তব্য বলতে মদশক্তির নজির: 'মদশক্তিবৎ'। আমাদের এই দাবির পক্ষে বিশেষত তিনটি যুক্তি উল্লেখ করবো।

এক: এই নজির—বা এ-জাতীয় কোনো নজির—দেখাতে না পারলে দেহাত্মবাদ সমর্থন করা সহজ বা সম্ভবও নয়। কেননা, আগুন বাতাস জল মাটি—এই সব স্বয়ং-অচেতন পদার্থ থেকেই দেহের উৎপত্তি। এবং চৈতন্য, প্রাণ, চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষণগুলি আসলে সেই দেহেরই লক্ষণ, অতএব এগুলির নজির ছেড়ে দেহ-অতিরিক্ত কোনো আত্মার স্বীকৃতি অবান্তর—এ-হেন কথা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে দেহগঠনের উপাদানগুলির স্বতন্ত্র বা মিলিত-অবস্থায় যে লক্ষণের পরিচয় নেই তা ওই উপাদানগুলিরই কোনো একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে পরিণত বস্তুটির মধ্যে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব এবং বাস্তব দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে তা সত্যিই হয়ে থাকে। একথা প্রমাণ করতে না-পারলে দেহাত্মবাদের প্রকৃত ভিত্তি টলে যায়। এদিক থেকে মদশক্তির দৃষ্টান্ত বাদ দিলে দেহাত্মবাদের মূল ভিত্তিই নস্যাৎ হবার আশংকা। তাই মদশক্তির নজির দেহাত্মবাদের পক্ষে অনিবার্য।

দুই: অনুমান হয়, এই সহজ-সরল বিষয়টি বিপক্ষ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব দার্শনিকেরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন। তাই পূর্বপক্ষ হিসেবে দেহাত্মবাদের বর্ণনায় তাঁদের প্রায় সকলের রচনাতেই এই মদশক্তির দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। বর্তমানে তাঁদের সকলের লেখা উদ্ধৃত করে আলোচনা ভারাক্রান্ত করবার দরকার নেই। শুধুমাত্র এটুকু কথাই বোধহয় পর্যাপ্ত হবে যে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সম্যক্ পরিচয় আছে, তাঁদের কারুরই এই বিষয়টি নজর এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় অসম্ভব।

তিন: প্রামাণিক লোকগাথার সাক্ষ্য। প্রকৃত চার্বাকমত বোঝার জন্যে প্রামাণিক লোকগাথার গুরুত্ব আমরা বারবার উল্লেখ করেছি। এখানে, দেহাত্মবাদের সমর্থনে কয়েকটি প্রামাণিক লোকগাথার উদ্ধৃতিই পর্যাপ্ত হবে। লোকগাথাগুলি সংরক্ষণের জন্য আমরা মাধবাচার্যের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর

'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই—'চার্বাক-দর্শন'—তিনি অনেকগুলি লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। যথা :

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারি-অনল-অনিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে ॥
কিণ্ব-আদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যঃ মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশঃ অস্মি ইতি সামানাধিকরণ্যতঃ ॥
দেহঃ স্থৌল্য-আদি-যোগাৎ চ স এব আত্মা ন চ অপরঃ।
মম দেহঃ অয়ম্ ইতি উক্তিঃ সম্ভবেৎ ঔপচারিকী ॥

—এখানে মাটি, জল, আগুন, বাতাস—শুধুমাত্র এই চার রকম ভূতবস্তুই বর্তমান। এই চার রকম ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়—যেমন কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুগুলি থেকেই মদশক্তি উৎপন্ন হয়। 'আমি মোটা', 'আমি রোগা'—এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসলে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্কই বর্তমান। 'মোটা' প্রভৃতি শব্দ দেহেরই বিশেষণ বলে স্বতন্ত্র কোনো আত্মার কথা অবান্তর। 'আমার দেহ'-জাতীয় কথা নেহাতই কথার কথা—যাকে বলে উপচার।

৩ ॥ মদশক্তির দৃষ্টান্ত

তাহলে, মদশক্তির নজিরটা প্রকৃত চার্বাকমতের পরিচায়ক বলে স্বীকার করবার পর্যাপ্ত কারণ আছে। আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে মদশক্তির এই নজিরটাই—বা তার প্রকৃত তাৎপর্য—কিছুটা খতিয়ে দেখা দরকার।

এ-হেন নজির ব্যবহার করার মধ্যেই—বিশেষত প্রাচীন কালের পটভূমিতে—একটা বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তব মনোভাবের পরিচয় খোঁজা অবান্তর হবে না। মদ গিললে যে নেশা হয়, একথা অবশ্যই সকলের জানা আছে। কিন্তু কেন হয়, তা দীর্ঘ যুগ ধরে দেশ-বিদেশের অনেকেরই জানা ছিলো না। তাই এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চোখে পড়ে। এ-সব জল্পনা-কল্পনার মূল কথা এই যে, মদের মধ্যে বুঝি কোনো একরকম অপ্রাকৃত বা এমনকি অলৌকিক শক্তি আছে, যারই প্রভাবে মদ পেটে পড়লে মানুষ

রকমারি অদ্ভুত আচরণ করে থাকে—চলতি কথায় আমরা যাকে বলি মাতলামি। উৎসাহী পাঠকেরা এই জাতীয় বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত হেস্টিংস্ সম্পাদিত 'এন্সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজন এণ্ড এথিক্স্'-এর (*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, ed. Hastings) 'Drinks, Drinking'-শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লেই দেখতে পাবেন। এই নিবন্ধে অবশ্য বেশির ভাগই তুলনায় অনগ্রসর বা পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের বিশ্বাসের বিবরণ। তার কথা আপাতত না-হয় না-ই তোলা গেলো। কিন্তু আজকের দিনেও ইংরেজরা কড়া মদকে বলেন স্পিরিট বা *Spirit*—অর্থাৎ, আক্ষরিক অর্থে ভূত বা প্রেতাত্মা জাতীয় কিছু। এই শব্দ-ব্যবহার থেকেই সন্দেহ হয় যে এর পিছনে যে-বিশ্বাস লুকোনো আছে তা এই যে, মদের বোতলের মধ্যে ভূত-প্রেত জাতীয় অলৌকিক কিছু বুঝি পোরা আছে; মদ গেলার ফলে তারই প্রভাবে মানুষ রকমারি তাণ্ডব বা তাজ্জব ব্যবহার করতে শুরু করে। ব্যাপারটা বানানো কথা নয়। জে. ডি বার্নাল রচিত 'ইতিহাসে বিজ্ঞান' (J. D. Bernal, *Science in History*) বই দেখুন। দেখবেন, য়ুরোপের বিজ্ঞানীমহলেও অন্তত ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই রকম একটা ধারণা চালু ছিলো। নমুনা হিসেবে প্যারাসেল্সাস্ (Paracelsus : 1493-1541) নামে (বা আসলে ছদ্মনামে) রসায়নবিদের উল্লেখ করেছেন বার্নাল। তাঁর মতে, "The crucial process of chemistry, distillalion, was essentially a process of capturing the invisible spirits that rose from a boiling liquid. That such spirits were indeed powerful was only too evident from the effect of drinking them." (বার্নাল, পৃ ৩১৯)।

অর্থাৎ, প্যারাসেল্সাস্-এর ধারণায় রসায়নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মস্ত প্রস্তুতের বিশিষ্ট প্রক্রিয়াটি আসলে ফুটন্ত তরল পদার্থ থেকে অদৃশ্য প্রেত ধরবার এক রকম পদ্ধতি; এই প্রেতের শক্তিটা যে কতোখানি মদ্যপানের ফলাফল থেকেই বস্তুত তা বোঝা যায়। এমনকি ভ্যান্ হেলমোস্ট (van Helmost : 1577-1644) মনে করতেন মদ তৈরি করা বলে ব্যাপারটা আসলে শুঁড়িখানায় শুঁড়ির ভাঁটি থেকে একরকম ভূত বা প্রেত ধরবার কৌশল। এ-জাতীয় বিশ্বাস আজো ইংরেজদের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে টিঁকে আছে; তাই আজো তাঁরা কড়া মদকে 'স্পিরিট' বা ভূতুড়ে কিছু বলে থাকেন।

কথাগুলো মনে রাখলে চার্বাকদের মদশক্তির দৃষ্টান্তটিরই একটা চিত্তাকর্ষক তাৎপর্য অবজ্ঞার ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। কিণ্ব প্রভৃতি কতকগুলি নেহাতই জাগতিক বস্তুর কোনো-একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে মদ্য বলে একরকম নেহাতই জাগতিক জিনিস প্রস্তুত করা হয়, এবং তারই মধ্যে নেহাতই জাগতিক এক নতুন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'আত্মা' বলে দেহাতীত কোনো অলৌকিক বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলে মদশক্তির এই নজিরটির মধ্যে অজাগতিক কোনো কিছুর কল্পনা অবশ্যই অবান্তর হবে। ঠিক কবে—কীভাবে—চার্বাকদের মাথায় এই মদশক্তির দৃষ্টান্ত এসেছিলো, তা আমাদের জানা নেই, জানবার কোনো উপায়ও নেই। জানতে পারলে হয়তো ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার—বা বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা বিকাশের—ইতিহাসে কিছুটা নতুন আলোকপাতের সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দেহ ছাড়া আত্মা বলে আলাদা কিছু মানবার বিরুদ্ধে—বা দেহাত্মবাদের সমর্থনে—তাঁরা এই মদশক্তির নজিরটি ব্যবহার করেছেন। নজিরটির স্বকীয় বৈজ্ঞানিক মূল্য তুচ্ছ নয়।

কিন্তু চার্বাকমতের সঙ্গে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় পরে ফেরা যাবে। আপাতত চার্বাকদের দেহাত্মবাদের দার্শনিক গুরুত্ব আরো কিছুটা খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যাক। অন্যান্য বিদগ্ধ দার্শনিকেরাও মতটা একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেননি। দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যেন রীতিমতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন।

৪ ॥ দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস

উপরের আলোচনা থেকে অন্তত একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। দেহাত্ম-বাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দার্শনিকেরা সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হিসাবে চৈতন্যর নজির দেখাতে চেয়েছেন। আগুন, বাতাস, জল, মাটি—সবই অচেতন বা জড় বস্তু। দেহের উপাদান হিসাবে আর কিছু মানার সুযোগ নেই; অন্তত চার্বাকেরা আর কিছুই মানতে রাজি নন। কিন্তু এ-জাতীয় নিছক জড় বা অচেতন বস্তু দিয়ে যা গড়া তাও তো সহজ-সরল যুক্তিতে নেহাত অচেতনই হবার কথা। কিন্তু মানুষ তো আর তা নয়। আমাদের মধ্যে চৈতন্যর পরিচয় রয়েছে।

তার ব্যাখ্যাটা কী হবে? কিংবা চৈতন্যর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার জন্যে দেহ ছাড়াও দেহস্থ চেতন-আত্মা স্বীকার না-করে উপায় কী? উত্তরে চার্বাকেরা বলতে চান, উপায় আছে। বস্তুবিশেষ প্রস্তুতের উপাদানগুলিতে স্বতন্ত্র বা মিলিত-অবস্থায় কোনো গুণ বা লক্ষণের পরিচয় না-থাকলেও সেগুলিরই কোনো একরকম বিশেষ পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ওই গুণ বা লক্ষণের উদ্ভব এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। নজির: মদশক্তি। মদশক্তি যেমন মদের গুণ, চৈতন্যও তেমনি দেহরই গুণ। মদ তৈরির কোনো উপকরণে মদশক্তির পরিচয় নেই। তেমনি দেহ গঠনের কোনো উপকরণেও চৈতন্যর পরিচয় নেই। উভয় ঘটনাই সমজাতীয়।

শুধু শঙ্করাচার্যর কথাই নয়। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য প্রখ্যাত প্রতিনিধি-দের লেখা থেকেও অনায়াসেই বোঝা যায়, দেহাত্মবাদ নিয়ে যতো বিতর্ক তার মধ্যে মূল কথা বলতে এইটাই। এর সঙ্গে অবশ্য অনেক সময় অনেক রকম বাড়তি যুক্তিতর্কর অবতারণা করেছেন—পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকমতের বর্ণনা প্রসঙ্গেও করেছেন, খণ্ডন প্রসঙ্গেও। অত্যুক্তির অপবাদ না-কুড়িয়েও বলা যায়, অনেকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও যুক্তিকৌশলের উৎকর্ষ দেখাবার উৎসাহেই করেছেন বলে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, চার্বাকদের পক্ষে যে-ধরণের কূট তর্ক আদপেই তোলবার দরকার ছিলো না, স্বাভাবিকও নয়, এমনতরো অনেক কথাই দেহাত্মবাদের বিচার প্রসঙ্গে অনেকের লেখায় চোখে পড়ে। উৎসাহী পাঠকেরা তার নমুনা হিসেবে প্রভাচন্দ্র, শান্তরক্ষিত-কমলশীল বা গুণরত্নর বিস্তৃত আলোচনা উলটে দেখতে পারেন। কিন্তু কথা হলো, চার্বাকপক্ষ থেকে দেহাত্মবাদের সমর্থনে যেটা সবচেয়ে মোক্ষম নজির বলে মনে করার পর্যাপ্ত কারণ আছে—অর্থাৎ ওই মদশক্তির নজির—তা বাস্তবিকই খণ্ডন করবার চেষ্টা কতোটা সার্থক হয়েছে? এই নজির খণ্ডন করতে না-পারলে হাজারো রকম কূট তর্কের অবতারণা করলেও দেহাত্মবাদ কি সত্যিই খণ্ডন করা যায়?

বলাই বাহুল্য, মদ্য প্রস্তুতের উপাদানগুলির মধ্যে কোনোটি থেকেই—বা এগুলিকে যেন-তেন-প্রকারে এক জায়গায় জড়ো করলেই—মদ তৈরি হয় না; অর্থাৎ মদশক্তি বা মাদকতা জননের সামর্থ্য সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলিরই কোনো একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে মদ তৈরি হয় এবং তাতে মদশক্তি বলে এক অভূতপূর্ব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব;

উড়িয়ে দেবার উৎসাহ যদি কারুর থাকে, তাহলে একবার ভাঁটিখানায় শুঁড়ির কলাকৌশলটা দেখে এলে সে-উৎসাহর অবসান ঘটতে বাধ্য। এবং, এই নজির মানতে বাধ্য হলে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে মূল আপত্তিটা আর অতো জোর গলায় তোলার সুযোগ থাকে না, কেননা সে-আপত্তি বলতে তো এই যে আগুন, বাতাস, জল প্রভৃতি দেহগঠনের উপাদানগুলি দিয়েই তৈরি নিছক দেহর মধ্যে চৈতন্য বলে গুণের পরিচয় সম্ভব নয়। এবং এই কারণেই দেহবাসী চেতন আত্মা মানা দরকার। কিন্তু উপাদান-সামগ্রীতে যে-গুণের পরিচয় নেই সেগুলিরই বিশেষ পরিণামের ফলে ওই উপাদান-গঠিত বস্তুতেই অভূতপূর্ব গুণ—বর্তমান দৃষ্টান্তে চৈতন্য প্রভৃতি গুণ—আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। সংক্ষেপে: দেহগঠনের উপাদানগুলি স্বয়ং-অচেতন, শুধুমাত্র এই যুক্তি দিয়ে দেহাত্মবাদ খণ্ডন কিছুতেই পর্যাপ্ত হতে পারে না।

তাই দেহাত্মবাদের বিচারে আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন এই নয় যে এই প্রসঙ্গে কতো দার্শনিক কতোরকম কূট তর্কের নমুনা দেখিয়েছেন। তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, চার্বাকমতের পক্ষে এই মূল নজিরটি অন্যান্যরা কতোটা সার্থক ভাবে খণ্ডন করতে পেরেছেন?

যতোদূর মনে হয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে মদশক্তির এই দৃষ্টান্তটি নিয়ে বিপক্ষ দার্শনিকেরা খুব একটা তর্কাতর্কি তোলেননি। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়, হয়তো সম্ভবও নয়। তাছাড়া, তাঁরা হয়তো বলবেন, শুধুমাত্র একটা দৃষ্টান্তর নজির থেকে অতো বড়ো একটা সিদ্ধান্ত—দেহাত্মবাদ—সুনিশ্চিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নিরর্থক। তার মানে অবশ্য এই নয় যে দার্শনিক বিচারে দৃষ্টান্তর গুরুত্ব নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু নিছক কোনো দৃষ্টান্তর—বিশেষত এমন এক দৃষ্টান্তর যা মোটের উপর খুব প্রচলিত নয়, বরং তুলনায় দুর্লভ ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয়—উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা অতি-বড়ো অপ্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার পক্ষে হয়তো সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। যাই হোক, যে-কোনো কারণেই হোক, বিপক্ষ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা মদশক্তির দৃষ্টান্ত নিয়ে তেমন কিছু তর্কাতর্কি করেননি। তার বদলে অন্যান্য অনেক যুক্তি দেখিয়ে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন।

আমাদের পক্ষে এখানে তাঁদের সমস্ত যুক্তির কোনো তালিকা তৈরি করার সুযোগ নেই এবং তা সম্ভবও নয়। তার বদলে তাঁদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ—এবং

অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ—যুক্তির বিচারই বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে। এ-হেন যুক্তি হিসেবে আমরা এখানে বিশেষত দুটির আলোচনা করবো। এক : দেহাত্মবাদের সমর্থনে চার্বাকেরা আগুন, বাতাস, জল প্রভৃতি স্বয়ং-অচেতন বা জড় ভূতবস্তুগুলির 'বিশেষ পরিণাম' হিসেবে যে-কথা বলতে চান তা আসলে বিচারের ধোপে টেঁকে না। বিশেষত জৈন দার্শনিক গুণরত্ন এই কথাটি বেশ ফলাও করে দেখাতে চেয়েছেন : তাঁর বিশেষ বক্তব্য হলো, আর যে-যাই-বলে-বলুক, বিশেষত চার্বাকদের মুখে কথাটা একেবারেই শোভা পায় না। দুই : চৈতন্য প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র কোনো আত্মার ধর্ম বলে স্বীকার না-করে চার্বাকেরা যে-ভাবে নিছক দেহধর্ম বলে প্রতিপন্ন করতে চান তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো মৃতদেহর সাক্ষ্য : চৈতন্য প্রভৃতি যদি শুধুমাত্র দেহরই গুণ বা লক্ষণ হতো তাহলে যতোক্ষণ বা যেখানেই দেহ বর্তমান ততোক্ষণ সেখানেই চৈতন্য প্রভৃতি থাকবার কথা। কিন্তু আসলে দেখা যায় যে দেহ থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য নাও থাকতে পারে ; তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মৃতদেহ। ন্যায়-বৈশেষিকদের প্রথা অনুসারে জয়ন্তভট্ট যেমন খুব সাঁটে বলছেন, "শরীরং চৈতন্য-শূন্যং, শরীরত্বাৎ, মৃতশরীরবৎ"—অর্থাৎ শরীর আসলে চৈতন্যশূন্য, কেননা তা নিছক শরীর, যেমন কিনা মৃতশরীর। শঙ্করাচার্য অবশ্য যুক্তিটা এরকম সাঁটে বলেননি ; তাঁর সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মূলত একই যুক্তি। এবং অন্যান্য নানা দার্শনিকও এই যুক্তিকেই চলতি কথায় যাকে বলে "তুরুপের টেক্কা" হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, অনেকের কাছেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনে এই যেন মোক্ষম প্রমাণ।

দেহাত্মবাদ খণ্ডনের নমুনা হিসেবে আমরা মূলত এই দুটি যুক্তিই আলোচনা করবো এবং দেখার চেষ্টা করবো এ'দুটির বলে দেহাত্মবাদ সত্যিই বরবাদ হয় কিনা, কিংবা, যা প্রায় একই কথা, দেহ ছাড়াও চৈতন্য-বিশিষ্ট আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু মানবার বাধ্যবাধকতা থাকে কিনা।

৫ ॥ "দেহাকারে পরিণাম" : নিছক ভূতবস্তু না আরো কিছুর ফল ?

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, মধ্যযুগ থেকে —কিংবা নাগার্জুনের কথা মনে রাখলে বোধহয় মানতে হবে প্রাচীন কাল

থেকেই—এদেশে দার্শনিক দ্বন্দ্বের একটা কৌশল হিসেবে বিপক্ষকে একভাবে কোণ-ঠাসা করার একটা চেষ্টা ছিলো। কী ভাবে কোণ-ঠাসা করা? বিপক্ষের মত উল্লেখ করে প্রথমে দেখানো বিপক্ষের পক্ষেই ঠিক কী কী সম্ভাব্য অর্থে এই মত ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। তারপর দেখানো, এর মধ্যে কোনো অর্থই যুক্তিসহ নয়।

দেহাত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে গুণরত্ন এই রকম একটা দার্শনিক কায়দার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত মনে রাখতে হবে, আগুন-বাতাস-জল-মাটি এ ভূতবস্তুগুলি থেকেই চার্বাকমতে দেহ গঠিত হলেও চার্বাকেরা নিশ্চয়ই মানতে বাধ্য হবে যে ওই ভূতবস্তুগুলিকে যা-হোক তা-হোক করে একজায়গায় জড়ো করে দিলেই তা থেকে দেহগঠন সম্ভব হবে না, যেমন মদ তৈরির উপকরণগুলি যে-কোনভাবে একত্র করলেই তা থেকে মদ তৈরি হয় না। চার্বাকদের আসল বলবার কথাটা জয়ন্তভট্ট বেশ স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন: "বিশেষ পরিণামের ফলে জড়পদার্থ-গুলিই কোনোরকম বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হলে সেগুলিতেই জ্ঞান বা চৈতন্য উৎপন্ন হয়; যেমন গুড় পিষ্ট প্রভৃতিতে আগে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও সেগুলিই সুরাকারে পরিণত হলে মদশক্তি লাভ করে। তেমনি ভূতবস্তুগুলি মাটি প্রভৃতি অবস্থায় অচেতন হলেও সেগুলিই 'দেহাকারে পরিণত' হলে চৈতন্যবিশিষ্ট হয়।"

চার্বাকদের বক্তব্য যে মোটের উপর এইরকমই ছিলো তা প্রামাণিক লোকগাথা প্রভৃতি থেকে স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ আছে। অতএব, চার্বাক-মতের একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'দেহাকারে পরিণাম' বলে কোনো একরকম পরিবর্তন স্বীকার না-করে উপায় নেই। এবং ঠিক এই কথাটি নিয়েই গুণরত্ন চার্বাকদের কোণ-ঠাসা করতে চান। তাঁর বক্তব্য হলো, 'দেহাকারে' বা 'কায়াকারে' পরিণাম না-মেনে চার্বাকদের গত্যন্তর নেই; কিন্তু চার্বাকরা কীভাবে তার ব্যাখ্যা করবে?

গুণরত্নর মতে চার্বাকপক্ষ থেকে ঘটনাটার মাত্র তিনরকম ব্যাখ্যা সম্ভব; চতুর্থ কোনো পথ থাকতে পারে না। এইভাবে দেহাত্মবাদীকে কোণ-ঠাসা করে গুণরত্ন দেখাতে চান, তিনটির মধ্যে কোনোটিই চার্বাকমতে স্বীকৃত হতে পারে না। অর্থাৎ, দেহাত্মবাদী একদিকে 'কায়াকারে' পরিণত হবার কথা বলতে বাধ্য, কিন্তু অপরদিকে স্বমত-সম্মত ভাবে ঘটনাটির কোনোরকম ব্যাখ্যাই দিতে পারেন না।

দেহাত্মবাদীর পক্ষে 'কায়াকারে' বা 'দেহাকারে' পরিণামের কারণ মোটের উপর তিনরকম হতে পারে :

এক : শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভূতই তার কারণ।

দুই : ঘটনাটির আসল কারণ অন্য কিছু। দার্শনিক পরিভাষায় তাকে বলে 'তত্ত্বান্তর' স্বীকৃতি।

তিন : ব্যাপারটা অহেতুক, অর্থাৎ তার কোনো কারণই নেই।

প্রথমত, দেহাত্মবাদী নিশ্চয়ই বলতে পারে না যে শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবস্তুই কায়াকারে পরিণামের কারণ। কেননা, এই ভূতবস্তুগুলি তো সর্বত্রই বর্তমান এবং শুধুমাত্র এগুলিই যদি শরীররূপে পরিণত হবার পর্যাপ্ত কারণ হয় তাহলে তো সর্বত্রই কায়াকার ঘটবার কথা। তাহলে কি দেহাত্মবাদী বলবে, ভূতবস্তুগুলিই কায়াকারে পরিণত হবার কারণ হলেও এই পরিণতির জন্যে 'সহকারী কারণ' হিসাবে আরো কিছু মানা দরকার। যেমন, ধুঁয়োর আসল কারণ অবশ্যই আগুন; কিন্তু গনগনে লোহার পিণ্ডে আগুন থাকলেও ধুঁয়ো থাকে না—তার জন্য ভেজা কাঠ জাতীয় সহকারী কারণ থাকা দরকার। কিন্তু ভূতবস্তুর পক্ষেও শরীর-আকারে পরিণত হবার জন্যে কোনো রকম সহকারী কারণ কি মানা যায়? গুণরত্ন বলছেন, সহকারী কারণের কথা আর যার মুখেই শোভা-পাক-না-কেন, অন্তত চার্বাকদের মুখে শোভা পায় না। কেননা, তামাম দুনিয়ায় চার্বাকমতে এই ভূতবস্তুগুলি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই সহকারী কারণ হিসেবে আর কোনো কিছু মানা চার্বাকের পক্ষে অসম্ভব, কিংবা, যা একই কথা, মানতে গেলে চার্বাকের পক্ষে নিজের মূল প্রতিপাদ্যই পরিহার করতে হবে। তথাকথিত 'সহকারী কারণ'টিকে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপদার্থেরই বৈশিষ্ট্য বলে ব্যাখ্যা করতে গেলে কিন্তু আবার সর্বত্রই দেহাকারে পরিণাম হবার কথা। অতএব, সংক্ষেপে, গুণরত্নের বক্তব্য হলো, হয় ভূতবস্তুকেই একমাত্র সত্য বলে বক্তব্য ছাড়ো, না-হয় তো কায়াকারে পরিণামের কথা ছাড়ো। আর, এতোশতো ঝামেলা এড়াতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি বলতে চাও যে দেহাকারে পরিণাম সম্পূর্ণ অহেতুক—তার কোনো কারণই নেই—তাহলে একদিকে যেমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেহাকারে পরিণতির সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে, অপরদিকে তেমনই কোথাওই এবং কখনোই তার সম্ভাবনা মানা যাবে না : কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া একটা

ঘটনা যেমন যত্রতত্র ঘটতে পারে আবার তেমনি কোথাওই তা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। মোদ্দা কথা: কোনো ঘটনাকে অহেতুক বললে তা নিয়ে আর কোনো দার্শনিক আলোচনার সুযোগই থাকে না।

গুণরত্নর যুক্তি-চাতুর্য অবশ্যই মানতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকেরা এজাতীয় যুক্তিবিন্যাসের সত্যিই কোনো জবাব দিতে পারতেন কিনা—বা এই রকম যুক্তির মারপ্যাঁচের সত্যিই বড়ো একটা পরোয়া করতেন কিনা—আমাদের পক্ষে আজ তা নিশ্চিতভাবে জানবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে গুণরত্নের যুক্তিটা এমনই অমোঘ যে চার্বাকপক্ষ থেকে তার কোনো জবাবই হয় না। খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চার্বাকপক্ষ সমর্থনে এহেন যুক্তির জবাব অসম্ভব নয়।

কী জবাব হতে পারে?

একথায় অবশ্যই সন্দেহ নেই যে আগুন-বাতাস-জল-মাটিকে যেমন-তেমনভাবে একত্র করলেই 'দেহাকারে পরিণাম' সম্ভব নয়। এটুকু কথা যে চার্বাকেরা বুঝতেন না—তা কল্পনা করারও কোনো কারণ নেই। কেননা, চার্বাকদের বেকুব বলে প্রচার করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এটুকু প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা তাঁদের পক্ষে অবশ্যই বোঝবার কথা। অতএব গুণরত্ন-বর্ণিত প্রথম পক্ষটি চার্বাক-পক্ষ বলে কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। তৃতীয় পক্ষটিও নয়: অর্থাৎ, 'কায়াকারে পরিণাম' হিসেবে বর্ণিত ব্যাপারটাকে নেহাতই অহেতুক বলে স্বীকার করে চার্বাকদের পক্ষে একেবারে হাল ছেড়ে দেবার সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত। অহেতুক বলে স্বীকার করে হাল ছেড়ে দিলে মতটা সমর্থন করার আর কোনো সুযোগই থাকে না। অর্থাৎ, গুণরত্নর যুক্তি-খণ্ডনে চার্বাকেরা সত্যিই কী বলতেন-না-বলতেন—আমাদের পক্ষে আজ তা নিশ্চিতভাবে জানবার মতো সুনিশ্চিত কোনো তথ্য না-থাকলেও অন্তত এটুকু অনুমান করার সুযোগ আছে যে, যে-তিনটি সম্ভবপর পক্ষ দেখিয়ে গুণরত্ন তাঁদের কোণ-ঠাসা করতে গিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্তত দুটি চার্বাকপক্ষ থেকে মানবার কোনো কারণ নেই। তাহলে বাকি থাকে মাত্র আর একটি পক্ষ। দার্শনিক পরিভাষায় তা হলো "তত্ত্বান্তর" স্বীকৃতি। ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা যাক।

চার্বাকমতে প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব বলতে মাত্র চতুর্ভূত। তামাম দুনিয়ায় এই চতুর্ভূত ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। কিন্তু এই চতুর্ভূতকে যেন-তেন-

প্রকারে সমবেত বা একত্র করলেই তো আর দেহাকারে পরিণাম সম্ভব নয়। তাহলে দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যা হিসেবে আরো বাড়তি কিছু মানতে হবে। অর্থাৎ, চতুর্ভূত ছাড়াও আরো কোনো তত্ত্ব মানতে হবে। ওই বাড়তি কিছুকে "তত্ত্বান্তর" বলা হবে: তোমার নিজের মতেই শুধুমাত্র যা তত্ত্ব বলে ঘোষণা করতে চাও—বা শুধুমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করতে চাও—তোমার নিজের পক্ষ সমর্থনেই শুধুমাত্র তাকেই সত্য বলে মানা চলে না। তাছাড়াও আরো কিছু মানা দরকার। এবং এ-হেন বাড়তি কিছুকে যদি মানতে বাধ্য হও তাহলে নিজের মূল মতটা শোধরাতে রাজি হও। স্বীকার করো যে আগুন-বাতাস-জল-মাটি ছাড়াও আরো কোনো সত্য আছে—এ হেন বাড়তি সত্য না-মানলে কোনো-এক বিশেষ অবস্থায় কায়াকারে পরিণাম সম্ভব হয় না—এ-হেন ঘটনার আর কী ব্যাখ্যা দেবে? কিন্তু এইভাবে "তত্ত্বান্তর"—বা বাড়তি তত্ত্ব—মানতে বাধ্য হওয়াটা দার্শনিকের পক্ষে সাংঘাতিক মারাত্মক ব্যাপার! সোজা কথায় যাকে বলে হার স্বীকার করা। নিজেই যাকে শুধুমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করছো তা ছাড়াও আরো কিছু সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হও। সোজা কথায়, নিজের দর্শন থেকেই ইস্তফা দাও।

তাহলে কি দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চার্বাকেরা নিরুপায় হয়ে 'শুধুমাত্র চতুর্ভূতই সত্য' এই দাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন? গুণরত্নর তর্ক-চাতুর্য মেনে নিয়েও উত্তরে বলবো, অন্তত আমাদের বিচারে এই সম্ভাবনা অনিবার্য নয়। অর্থাৎ, প্রকৃত অর্থে "তত্ত্বান্তর" স্বীকার করতে বাধ্য না-হয়েও স্বমত-সম্মতভাবে চার্বাকদের পক্ষে দেহাকারে পরিণামের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

কী রকম ব্যাখ্যা?

আসলে তত্ত্বান্তরের প্রসঙ্গটা ওঠে কখন?

প্রথমে একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেখা যাক। সকলেই মানবেন, "অগ্নি উষ্ণ"। কিন্তু একথা মানলেই সকলে কি 'অগ্নি' ছাড়াও 'উষ্ণতা' বলে বাড়তি কোনো তত্ত্ব স্বীকার করতে বাধ্য? নিশ্চয়ই নয়। কেন নয়? কারণ, 'উষ্ণতা' অগ্নি-বহির্ভূত স্বতন্ত্র কিছু নয়। অগ্নির স্বভাবই হলো "উষ্ণ"। তাই উষ্ণতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অগ্নি ছাড়া বাড়তি কিছু মানতেই হবে—এ-হেন দাবি চলতি কথায় যাকে বলি এঁড়ে তর্ক। বাজে কথা।

তাহলে "স্বভাব" বলে কোনো কিছু মানার একটা সুযোগ আছে। জল শীতল। কেন শীতল? জলের স্বভাবই তাই। কোনো দার্শনিক মুখে স্বীকার করুন-আর-নাই-করুন, "স্বভাব" বলে একটা কিছু মানতেই হবে, এবং "স্বভাব" বলে কিছু মানা মানেই "তত্ত্বান্তর" স্বীকৃতি নয়। তত্ত্বান্তরের প্রসঙ্গে তাহলে ওঠে কখন? স্বমত-স্বীকৃত তত্ত্ব র স্বভাব-বহির্ভূত কোনো কিছু মানলে। নইলে নয়।

এই কথা মনে রাখলে চার্বাকমতের সমর্থনে চতুর্ভূতেরই দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যার জন্যে তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি অনিবার্য নয়। চার্বাকপক্ষ থেকে অনায়াসেই বলা যায়, চতুর্ভূতের স্বভাবই হলো 'পরিস্থিতি-বিশেষে তা দেহাকারে পরিণত হয়'। এখানে কোটেশন চিহ্ন ইচ্ছে করে ব্যবহার করছি, কেননা পুরো বক্তব্যটাকেই চতুর্ভূতের স্বভাব বলে বর্ণনা করতে চাই। কূট তার্কিক অবশ্যই আপত্তি তুলতে পারেন যে 'পরিস্থিতি-বিশেষ' বলে ব্যাপারটাকে আলাদা করে বুঝতে হবে; ওটাকেও চতুর্ভূতের স্বভাবের মধ্যে গুঁজে দেওয়া চলবে না। এবং আলাদা করে ভাবলে তত্ত্বান্তরের স্বীকৃতি থেকে যায়। কিন্তু এ-হেন আপত্তিতে চার্বাকের পক্ষে বিচলিত হবার কারণ নেই। কেননা, পরিস্থিতি-বিশেষ-কে কেন আমরা আলাদা করে ভাবতে বাধ্য হবো? স্বভাব বলে ব্যাপারটা কখনো বা সরল আবার কখনো বা জটিল হতে পারে। ভারতীয় দর্শনে স্বভাব-এর ব্যাখ্যায় অনেকরকম প্রাকৃতিক নিদর্শন বা নমুনার কথা পড়েছি। নিম তেতো; খেজুর মিষ্টি। কিন্তু কেন? কেননা ওদের স্বভাবই ওই রকম। আধুনিক বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করুন। নিম কেন তেতো বা খেজুর কেন মিষ্টি—এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনি নিশ্চয়ই অল্প-বিস্তর দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেবেন। অতো কথা অবশ্যই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের জানা ছিলো না, থাকবার কথাও নয়। কিন্তু তাঁরা যখন বলতেন, নিমের স্বভাবই তিক্ততা বা খেজুরের স্বভাবই মধুরতা তখন তাঁদের প্রকৃত বক্তব্যটুকু আজকের দিনে আমরা কী ভাবে বুঝবো? আধুনিক বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় এ-বিষয়ে জটিল ব্যাপার পুরোটাই। পুরো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতিটি উপাদান ভেঙে এবং আলাদা-আলাদা ভাবে বুঝতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের "স্বভাব" বলে ধারণাটাও মিশমার হয়ে যাবার আশঙ্কা। চার্বাক-পক্ষ থেকেও এই কথা, চার্বাকদের বিপক্ষর পক্ষেও একই কথা। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের

অগ্রগতিকে অবহেলা করার কোনো প্রস্তাব আমাদের কাছে স্বীকৃত হতে পারে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও মানা দরকার যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিতর্কটার বিচার প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখা প্রাসঙ্গিক। যেমন ধরা যাক চতুর্ভূত-এর (বা পঞ্চভূত-এর) কথা: আগুন বাতাস জল মাটি (এবং তার সঙ্গে অনেকে আকাশ বলে পঞ্চম একটা ভূতপদার্থ জুড়েছেন)। চার্বাকমতে সত্য চতুর্ভূতই; অন্যান্য নানা দার্শনিকের মতেও ভূতপদার্থর তালিকা মোটামুটি একই রকম। অন্যান্যরা এই ভূতপদার্থকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করতে রাজি না হলেও ভূতপদার্থ বলতে তাঁদের জ্ঞান-গন্ডি ওই পর্যন্তই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আগুন বাতাস জল প্রভৃতির কতোটুকুই বা আজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে? শুধু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথাই বা কেন? প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের বেলাতেও একই কথা। যুগের পর যুগ ধরে ভূতপদার্থর জ্ঞান বেড়েছে, ধারণাও বদলেছে। আসল কথাটা এই যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। এবং জ্ঞানের এই অগ্রগতির দৌড় আজ এমন প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও প্রাচীন দর্শনের আলোচনা নিছক অজ্ঞানের আবর্জনা বলে বর্জিত হয়নি, বা অন্তত তা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষ আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে এবং কোন্‌দিকে কীভাবে আগামীকাল তার অগ্রগতির পথ নির্ণীত হবে তা উপলব্ধির জন্যে অতীতকে আরো ভালো করে বোঝবার তাগিদ থেকে গিয়েছে। সোজা কথায়, অজ্ঞানের অপবাদ দিয়ে অতীতটাকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না। তাহলে ইতিহাস বলে ব্যাপারটাই বরবাদ হবার আশঙ্কা। হেনরি ফোর্ড (Henry Ford) বলেছিলেন, *History is bunk*—ইতিহাস আসলে ভুয়ো ব্যাপার। কিন্তু তাঁর মত স্বীকৃত হয় নি। ইতিহাসের চর্চা চলেছে, চলবে। কেননা, অতীতের উপর থেকে পর্দা সরাতে পারলেই ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করার প্রয়াস তুলনায় নির্ভুল হয়।

কথাগুলো এই কারণে তুলেছি যে আধুনিক বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করে প্রাচীন দর্শনকে একেবারে বাতিল করার প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রাচীন দর্শনের বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগের দিকেই ফিরে তাকাতে হবে। ফিরে তাকাতে যদি রাজি হন তাহলে প্রাচীন বিতর্কটার পুনর্বিচারে প্রাচীন

কালের ধ্যান-ধারণার সাধারণ চৌহদ্দির কথা ভুলে গেলে চলবে না। সেই চৌহদ্দির মধ্যেই চার্বাকেরা দাবি করেছিলেন, ভূতপদার্থ থেকেই প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির উদ্ভব। ওপারিন (Operin), বার্নাল (Bernal) প্রমুখ অতি-আধুনিক বিজ্ঞানীদের উচ্চাঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা মনে রেখেও বোধ হয় বলা যায় প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির উদ্ভব বা উৎপত্তি প্রসঙ্গে সমস্যার চরম সমাধান আমাদের পক্ষে এখনো অপেক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলার দিন এসেছে যে সে-সমাধানের আশায় আধুনিক বিজ্ঞান ভূতপদার্থ ছাড়াও আত্মা জাতীয় কিছুর প্রাচীন কল্পনা পুনরুজ্জীবনের তাগিদ বোধ করছে না। অবশ্য ভূতপদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে সেকালের সঙ্গে একালের আকাশ-পাতাল তফাৎ, আবার একালের সঙ্গে আগামীকালের পার্থক্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও আন্দাজ করা সহজ কথা নয়। একেই বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রগতি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গেই আরো একটা কথা আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের যৎসামান্য সম্বল সত্ত্বেও চার্বাকেরা সমস্যাটার একটা সন্ধান খুঁজেছিলেন। আধুনিক জ্ঞানের মানদণ্ডে তার মূল্যায়ন অবশ্যই অবান্তর। কিন্তু তারই মধ্যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের কোনো প্রতিশ্রুতি—বা এমন কি কোনো রকম অস্পষ্ট আভাস—ছিলো কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। সে-আভাসের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, নিছক ভূতবস্তু থেকেই প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির উৎপত্তি-ব্যাখ্যার দিকেই আজকের বিজ্ঞানের ঝোঁক, ভূতবস্তু-অতিরিক্ত কোনো আত্মার কথায় ফিরে আসবার দিকে নয়। এমনকি একথাও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে এই উৎপত্তির ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানেও এক অর্থে শেষ পর্যন্ত স্বভাববাদের উপরই নির্ভরতা। কেননা, স্বভাববাদের মূল কথাটা হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বভাবকে বোঝবার ব্যাপারেও যে-অগ্রগতি, তার কথা ভুলে যাওয়াও কোনো কাজের কথা নয় ; তুলনায় এই প্রসঙ্গে চার্বাকদের যেটুকু জ্ঞান তা একান্তই প্রাথমিক। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই মানুষ শুরু করতে বাধ্য। আধুনিক জ্ঞানের প্রকাণ্ড ইমারত রাতারাতি গড়ে ওঠে নি। এবং এই ইমারত গড়ার ভিত্তিস্থাপনে যাঁরা প্রথম পদক্ষেপের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসের বিচারে তাঁদের অবদান অসীম। অনুমান হয় ভূতপদার্থ থেকে চৈতন্য প্রভৃতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে চার্বাকদের পক্ষ থেকে চরম কথা "স্বভাব" হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তর্কের খাতিরে এই

স্বভাবের কথা চেপে গিয়ে "তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি"র একটা গুরুগম্ভীর যুক্তির অবতারণা বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক বিচারের পরিচায়ক নয়। স্বভাব শব্দের একটা সংকীর্ণ অর্থ উদ্ভাবন করে বিপক্ষের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও চলবে না। যেমন "অগ্নির স্বভাব উষ্ণ"—শুধু এটুকু বলাই পর্যাপ্ত নয়। আরো বলা দরকার: "উষ্ণ-স্বভাব অগ্নির স্বভাবই এই যে অন্যান্য ভূতপদার্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়মে মিলিত এবং পরিবর্তিত হয়ে তা কায়াকারে বা দেহরূপে পরিণত হয়।" বাড়তি কথা-টুকুকে "স্বভাব" ছাড়াও অন্য কিছু বলে কল্পনা করে "তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি"-র অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না।

মদশক্তির মতো। মদশক্তির দৃষ্টান্তটা আবার উল্লেখ করছি, কেননা এক্ষেত্রেও কি গুণরত্নর মতো প্রখর তার্কিক "তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি"র অভিযোগ আনবেন? বা, এজাতীয় অভিযোগ তোলবার কোনো সুযোগ আছে? শুষ্ক তর্কের খাতিরে হয়তো থাকতে পারে; কেননা মদ্য প্রস্তুতের উপাদানগুলি যেন-তেন-প্রকারে জড়ো করলেই মদ তৈরি হয় না। এগুলিরই একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে মদ তৈরি হয়। কিন্তু ওই বিশেষ পরিণাম স্বীকার করা মানেই বাড়তি তত্ত্বর স্বীকৃতি নয়; তা উপাদানগুলির স্বভাব। তার প্রমাণ, অন্য উপাদান দিয়ে মদ তৈরি করা যায় না; শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উপাদান—অতএব সেগুলির নির্দিষ্ট স্বভাব—থেকেই মদ তৈরি হয়। "বিশেষ পরিণাম"টা তাই তত্ত্বান্তর নয়; উপাদান-সমূহের স্বভাবেরই অন্তর্ভুক্ত।

এইখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। "স্বভাব" বলে এই ধারণাটি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সর্বসম্প্রদায়-স্বীকৃত কোনো ধারণা নয়। সম্প্রদায়-বিশেষে তা স্বীকৃত; সম্প্রদায়-বিশেষে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। আমরা পরের পরিচ্ছেদে দেখাবার চেষ্টা করবো, "স্বভাববাদ"-এর সমর্থক হিসাবে চার্বাকেরাই একমাত্র দার্শনিক হোন-আর-নাই-হোন অন্তত সবচেয়ে অগ্রণী দার্শনিক। পক্ষান্তরে ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা স্বভাববাদ খণ্ডনের সাধ্যমতো প্রয়াস করেছেন।

কেন করেছেন? কেননা, স্বভাববাদ মানায় দেহাত্মবাদ ছাড়াও অন্যান্য দার্শনিক বিপত্তির আশঙ্কা আছে। এমনকি তার ফলে অধ্যাত্মবাদের ভিত টলে যাবার ভয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও উপেক্ষণীয় নয়। বিজ্ঞানী-মহলে—বিশেষত চিকিৎসা-

বিজ্ঞানীদের মূল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে—স্বভাববাদ স্বীকৃত হয়েছে। এদিক থেকে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে চার্বাকমতের একরকম আত্মীয়তা অনুমানের অবকাশ থাকে। অন্যান্য দিক থেকেও আছে। আগেও দেখেছি। পরে আরো দেখবো।

৬ ॥ মৃতদেহর নজির

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে তর্ক ছাড়াও রকমারি গালিগালাজের রেওয়াজও ছিলো। এমনকি, অতি-বড়ো অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যেও তা একান্ত বিরল নয়। যেমন বেদান্তদর্শনের একটি সম্প্রদায় বলতে দ্বৈতবাদ। তার সমর্থকেরা অদ্বৈত-বাদের ঘোর বিরোধী। কিন্তু বিরোধিতাটা শুধু যুক্তিতর্কের মধ্যে সীমিত নয়। অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারক শঙ্করাচার্যর বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদীরা রীতিমতো কাঁচা খিস্তিও করেছেন। গল্প ফেঁদেছেন, এক বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং রাক্ষসের ঔরসে শঙ্করের জন্ম। তাই বানানটা পাল্টে শঙ্কর না বলে দ্বৈতবাদীরা লেখেন সঙ্কর—অর্থাৎ, বর্ণসঙ্কর বা বেজন্মা। এ-জাতীয় নজির আর যাই হোক নির্লিপ্ত সত্যান্বেষণের পরিচায়ক নয়।

কিন্তু যতোদূর জানি, ভারতীয় দর্শনে একেবারে দাবাড়েদের ভাষার পরিচয় নেই। যদি থাকতো, তাহলে বলা যেতো দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে চরম চালটা যেন : মড়া দিয়ে কিস্তি মাৎ। কিন্তু প্রাচীনেরা যাই করুন, আমাদের মতো অর্বাচীনদের পক্ষে এই রকম ভাষা ব্যবহার অশালীনতার দোষদুষ্ট হবে। যুক্তিটা তাই ভদ্রোচিত ভাষায় বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

আসলে একাধিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই যুক্তি প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, সহজ সরল ও সুখপাঠ্য হিসাবে সমগ্র ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে শঙ্করের রচনা যেন তুলনাহীন। তাই দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রধানতম এই যুক্তিটি বোঝবার জন্যে তাঁর লেখাই অনুসরণ করা ভালো। কিন্তু যতো সহজ ভাষাতেই শঙ্কর এই যুক্তি প্রকাশ করুন না কেন, 'ব্যতিরেক', 'অব্যতিরেক' প্রভৃতি কয়েকটি অতি-প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ তিনিও ব্যবহার করেছেন। পারিভাষিক শব্দগুলি আজকের দিনের নেহাত সাধারণ পাঠকের কাছে অল্প-বিস্তর অপরিচিত হতে পারে। অথচ প্রধানত তাঁদের উদ্দেশ্যেই বর্তমান বইটা

লেখার চেষ্টা। তাই এ-জাতীয় পারিভাষিক শব্দর তাৎপর্য সাধ্যমতো অক্ষুণ্ণ রেখে যতোটা সাদামাটা ভাষায় পারি দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে এই মূল যুক্তিটি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবো।

যুক্তিটা কী?

দেহ ছাড়া আত্মা বলে যদি আর কিছু না মানো তাহলে আত্মবাদীরা যে ধর্মগুলিকে আত্মধর্ম বলে স্বীকার করতে চান সেগুলিকেও আসলে দেহধর্ম বলে গ্রহণ করতে হবে। এজাতীয় ধর্ম বলতে শঙ্কর প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতির কথা উল্লেখ করছেন। দেহাত্মবাদীরা এই ধর্মগুলিকেও নিছক দেহের ধর্ম বলে স্বীকার করতে বাধ্য; অন্য কিছুর ধর্ম বলে মানতে গেলে তো দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু—অর্থাৎ আত্মা—মানতে হয়। কিন্তু শঙ্কর দেখাতে চান এগুলিকে নিছক দেহধর্ম বলে প্রমাণ করা অসম্ভব। আসলে আমাদের ক্ষেত্রে দু'রকম ধর্মর পরিচয় পাওয়া যায়। একরকম হলো নিছক দেহের ধর্ম; আর একরকম ধর্মকে দেহ-অতিরিক্ত কিছুর (আত্মার) ধর্ম বলে স্বীকার না-করে উপায় নেই। তফাৎটা কীভাবে নির্ণয় করা হবে? যা নিছক দেহধর্ম তার লক্ষণ হবে দেহের বিদ্যমানতায় ধর্মটিরও বিদ্যমানতা: যতোক্ষণ দেহ থাকবে ততোক্ষণ ধর্মটিও থাকতে বাধ্য। যেমন, রূপ। দেহ বর্তমান অথচ তার রূপ অবর্তমান—এ-হেন কথা কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু দেহ বর্তমান হলেও যদি কোনো ধর্ম অবর্তমান হয় তাহলে আর কীভাবে তাকে নিছক দেহেরই ধর্ম বলা যাবে? পক্ষান্তরে, এজাতীয় ধর্মকে দেহান্যধর্ম—বা দেহ ছাড়া অন্য কিছুর ধর্ম, অর্থাৎ আরো সহজ কথায়, আত্মার ধর্ম—বলে মানতে আমরা বাধ্য।

এই যুক্তি মনে রেখে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মগুলির কথা বিচার করা যাক। যদি দেখা যায়, দেহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এই ধর্মগুলি অবর্তমান হয় তাহলে এগুলিকে কিছুতেই নিছক দেহধর্ম বলার সুযোগ থাকে না। অথচ বাস্তবে এই ব্যাপারই দেখা যায়—দেখা যায় দেহ আছে অথচ এই ধর্মগুলি নেই। কোথায় দেখা যায়? মৃতদেহের দৃষ্টান্তে। মৃতদেহও দেহ। তাই মৃতদেহেও নিছক দেহধর্ম বর্তমান। যেমন, রূপ: মৃতদেহ থেকে রূপ বলে ধর্মটি উপে যায় না। কিন্তু প্রাণ, চৈতন্য, চেষ্টা ইত্যাদি? অবশ্যই ভারতীয় দর্শনে বোকা-হাবা বলে চার্বাকদের রকমারি গালিগালাজ দেবার প্রথা ছিলো। কিন্তু তাই বলে কি এমনই হাবা যে ওরা বলবে, মৃতদেহেও প্রাণ, চৈতন্য ইত্যাদির পরিচয়

আছে ? চার্বাকদের অতি-বড়ো সমালোচকেরাও ওঁদের ঘাড়ে এ-হেন অসম্ভব কোনো কথা চাপিয়ে দেননি। মড়াটা যে প্রাণহীন, চৈতন্যহীন ইত্যাদি—এই ব্যাপারটা এমনই প্রকট যে চার্বাকের মতো আকাট বোকাও তা যেন স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু একথা স্বীকার করলে আরো স্বীকার করতেই হবে যে প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতি নিছক দেহধর্ম হতে পারে না। লাসটা তো রয়েছে ; কিন্তু তার মধ্যে কি প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মের লেশমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় ? নিশ্চয়ই নয়। তা সত্ত্বেও কী করে চার্বাকেরা আত্মা বাদ দিয়ে প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতিকে নিছক দেহধর্ম বলে কল্পনা করতে পারেন ?

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ যেন একেবারে মোক্ষম যুক্তি—চার্বাকের বিরুদ্ধে এমনই যেন এক শক্তিশেল যে পুরো গন্ধমাদন মাথায় বয়ে এনেও চার্বাক-পক্ষকে বাঁচানোর উপায় নেই। হয়তো এই কারণেই অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উৎসাহে মূলত এই যুক্তিই প্রয়োগ করেছেন। সকলের প্রকাশভঙ্গি অবশ্য সমান নয় : কারুর লেখা কঠিন, কারুর লেখা তুলনায় সহজ ; কারুর লেখায় এই যুক্তির সঙ্গে আরো নানা কথা জুড়ে দিয়ে পুরো আলোচনা অনেক বেশি কঠিন-কঠোর করবার প্রয়াস করেছেন, কারুর লেখায় সে-চেষ্টার পরিচয় তুলনায় কম। কিন্তু মূল যুক্তিটা একই। এখানে আমাদের পক্ষে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি উক্তি উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই ; দরকারও নেই। চার্বাকপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে খুচরো-খাচরা তর্ক-বিতর্ক তুলেও আলোচনা পল্লবিত করা যেতে পারে ; কিন্তু সে চেষ্টাও করবো না। যেমন ধরুন, চার্বাক-পক্ষ থেকে অনায়াসে বলা যেতে পারে, দেহ এবং মৃতদেহ এক নয়। নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক আত্মবাদীর আচরণ থেকেই তার প্রকাশ : যে-গুরুজনকে আজ তিনি অতি ভক্তিভরে প্রণাম করছেন তাঁরই মৃতদেহ আগামীকাল এমনই অপবিত্র হবে যে ছুঁলে স্নান করার বিধান। অতএব মৃতদেহর নজির দেখিয়ে দেহমাত্র প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত কতোখানি যুক্তিযুক্ত তা আপনার পক্ষেও নতুন করে ভাবতে হবে। কিংবা, চার্বাকপক্ষ থেকেই তর্ক তুলে বলা যেতে পারে যে মৃতদেহর নজির থেকে দেহমাত্র প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্তে বাধা আছে। যেমন নিছক দেহের একটা ধর্ম বা লক্ষণ হিসেবে শঙ্কর রূপ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দেহ এবং মৃতদেহর রূপ প্রভৃতি ধর্মও কি সর্বাংশে সমান ?

কিন্তু এখানে এজাতীয় খুচরো যুক্তির তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করবো।

না। দেহাত্মবাদের খণ্ডনে আত্মবাদীরা এজাতীয় খুচরো কিন্তু পাল্টা যুক্তির পাল্টা ফর্দ তৈরি করতে পারেন। সে-সবের জটিলতায় ফাঁসলে আসল বিতর্কটা থেকে অল্পবিস্তর বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা। তাই, এ-জাতীয় আলোচনা না-তুলে এখানে ভারতীয় প্রমাণবিদ্যার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিতর্কটার সোজা ভাষায় পুনর্বিচারের প্রয়াস করবো।

দেহাত্মবাদের আলোচনায় শঙ্কর অবশ্য দেহ এবং চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে ধর্ম-ধর্মী ভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষায় তাকে কারণ-কার্য সম্বন্ধেরই একটা নমুনা বলে ধরা যেতে পারে: পঞ্চভূতে গড়া দেহটি কারণ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম তারই কার্য। একথা মানলে, ভেবে দেখতে হবে ভারতীয় প্রমাণ-বিদ্যার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসারে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মূল পদ্ধতি কী এবং তা খণ্ডনেরই বা মূল শর্ত কী? দার্শনিক পরিভাষা এড়িয়ে সহজ কথায় প্রশ্নটার আলোচনা করার অনুমতি পেলে বলা যায়:

কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রধান শর্ত বলতে দুরকম।

এক: কারণ থাকলে কার্য থাকবে। যেমন, বহ্নি ধূমের কারণ হলে বহ্নি থাকলে ধূম থাকবে।

দুই: কারণ না থাকলে কার্য থাকে না। যেমন, বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের অভাব।

আমাদের প্রমাণ-বিদ্যার পরিভাষায়, প্রথমটিকে বলে "অন্বয়", দ্বিতীয়টিকে "ব্যতিরেক"। এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ খণ্ডনের প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো, "অন্বয়" এবং "ব্যতিরেক" উভয়েরই গলদ দেখানো। এই কথা মনে রেখে দেহাত্মবাদের বিচারে ফেরা যাক। দেহাত্মবাদীর পক্ষে "অন্বয়" হবে: শরীর থাকলে চৈতন্য প্রভৃতি থাকবে। এবং "ব্যতিরেক" হবে: শরীরের অভাবে চৈতন্য প্রভৃতিরও অভাব হবে।

কিন্তু মৃতদেহের নজির থেকে কতোটুকু কথা প্রমাণ হয়? দেহাত্মবাদের পক্ষে শুধু "অন্বয়"টুকুর খণ্ডন: শরীর থাকলেও চৈতন্য প্রভৃতির অভাব হতে পারে। কিন্তু, তাছাড়াও, "ব্যতিরেক"টি খণ্ডন করা দরকার। অর্থাৎ, দেখানো দরকার যে শরীরের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভৃতির পরিচয় সম্ভব। আত্মবাদী মহলে এই দ্বিতীয় কথাটি প্রমাণ করবার উৎসাহ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। তার কারণ হয়তো এই যে তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়, বা অন্তত

সহজবুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য হওয়া কঠিন। দেহ নেই অথচ শুধু চৈতন্য আছে—এহেন ঘটনার নজির দেখানো তেমন সোজা নয়। আত্মবাদীদের পক্ষ থেকে হয়তো দাবি করা হবে যে দেহের মায়া কাটিয়ে আত্মা মোক্ষলাভ করলে চৈতন্য থাকে, কিন্তু শরীর থাকে না। কিন্তু ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। কেননা মোক্ষ-লাভের কথাটা মেনে নিলেও—বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও—মুক্ত আত্মার অবস্থাটা আসলে কীরকম, এ-বিষয়ে আত্মবাদীদের মধ্যেও মতের মিল নেই। যেমন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে, মুক্ত আত্মা চৈতন্যস্বরূপ; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা তা মানেন না। তাঁদের মতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ জড়বস্তুর মতোই; তাতে চৈতন্যর কোনো পরিচয় নেই। শুধুমাত্র দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় বা বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগের ফলে আত্মাতে চৈতন্যর উদ্ভব হয়। আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে হিরিয়ান্না (Hiriyanna) মন্তব্য করেছেন, এ-হেন মতের সঙ্গে চার্বাকমতের আসল তফাৎটা একেবারে আকাশ পাতাল মনে করা ভুল হবে; পক্ষান্তরে সন্দেহ হয় মতটা বরং চার্বাকমতেরই কাছ-ঘেঁষা। আমরা একটু পরেই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা খুঁটিয়ে আলোচনা করবো। আপাতত মন্তব্য শুধু এই যে, দেহের অনুপস্থিতিতেও চৈতন্যর পরিচয় পাওয়া যায়—এই দাবির পক্ষে সুনিশ্চিত প্রমাণ দেখাতে না-পারলে ভারতীয় প্রমাণ বিদ্যার প্রথা অনুসারেই দেহাত্মবাদের খণ্ডন সর্বাঙ্গীণ বা সম্পূর্ণ হয় না। মৃতদেহর নজির থেকে বড়ো জোর এটুকুই প্রমাণ হতে পারে যে দেহ বর্তমান থাকলেও চৈতন্যর অভাব সম্ভব। তার বেশি কিছু নয়। অতএব, জীবদেহ ও মৃতদেহকে দেহ-অর্থে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে স্বীকার করলেও শুধুমাত্র তারই নজির থেকে দেহাত্ম-বাদের পূর্ণাঙ্গ খণ্ডন হয় না। অন্তত ভারতীয় ন্যায়বিদ্যার নিরিখে নয়। কিংবা, দাবাড়ে ভাষায়, শুধু মড়ার নজিরের চাল দিয়ে দেহাত্মবাদকে মাৎ করে দেওয়া সম্ভব নয়।

৭॥ স্মৃতির নজির

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে আরো নানা যুক্তির মধ্যে একটি যুক্তি তুলনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে জয়ন্তভট্ট, উদয়নাচার্য প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকেরা যুক্তিটির তুলনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

তার্কিক হিসেবে এঁদের কোনোমতেই তুচ্ছ ভাবা যায় না। তাই এঁরা যে-যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাও সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্যই এঁদের লেখা সহজপাঠ্য নয়; রচনার উৎকর্ষ সাধনে এঁরা যে-সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন সাধারণ পাঠকের জন্যে তার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার প্রয়াসে আমাদের আলোচনাও কিছুটা বিস্তৃত হবার কথা। তাই তাঁদের লেখা ব্যাখ্যা-মূলকভাবে উদ্ধৃত করার বদলে আসল যুক্তিটির সাধ্যমতো সহজ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

যুক্তিটির মূল কথা হলো স্মৃতির সাক্ষ্য। একথা সকলেই মানবেন যে বাল্যকালের অভিজ্ঞতার যৌবনে—এবং যৌবনের অভিজ্ঞতার বার্ধক্যকালে—স্মরণ হয়। কিন্তু বাল্যদেহ, যৌবনের দেহ ও বৃদ্ধদেহ অবশ্যই এক নয়। দেহ হিসেবে এগুলির মধ্যে এমনই মৌলিক পার্থক্য যে বরং এগুলির প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দেহ বলে বিবেচিত হবার কথা। দ্বিতীয়ত, একের অভিজ্ঞতা অপরের পক্ষে স্মরণ করার প্রশ্ন ওঠে না: দেবদত্ত নামের ব্যক্তিটির অভিজ্ঞতা যজ্ঞদত্ত নামে অপর কেউ কি স্মরণ করতে পারে?

এই দুটি কথা মনে রাখলে স্বীকার করতেই হবে যে নিছক দেহকে স্মরণ-কর্তা বলে স্বীকার করা অসম্ভব। অথচ, স্মৃতি বলে ঘটনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে, স্মৃতির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হিসেবে মানতেই হবে যে স্মরণকর্তা অর্থে শুধু দেহকেই সত্য বলা সম্ভব নয়। দেহ ছাড়াও বাড়তি কিছু স্বীকার করতে হবে। সেই বাড়তি কিছুটিকে আত্মা বলে মানো। কেননা, দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল হলেও আত্মা একই থাকে। বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত আত্মাও বদলাতে থাকে—এমনতরো দাবি করা যাবে না। অবশ্যই সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা নিত্য আত্মা বলে কিছু মানতেন না। তাঁদের মত তাই নৈরাত্ম্যবাদ বলে প্রসিদ্ধ। এই কারণে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নিত্য আত্মায় বিশ্বাসী নৈয়ায়িক প্রভৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ধুমাধুম তর্ক আছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখানে সে-তর্ক বিচারের প্রয়োজন নেই। নিত্য আত্মা মানুন আর নাই মানুন—এবং নিত্য আত্মা অস্বীকার করেও স্মৃতির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কিনা, কিংবা নৈরাত্ম্য-বাদী বৌদ্ধরা স্মৃতির কী ব্যাখ্যা দিতেন—বর্তমানে সে-আলোচনায় বিক্ষিপ্ত হবার কারণ নেই। নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধরা আর যাই হোন দেহাত্মবাদী ছিলেন না।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা চার্বাকদের নিয়ে—তাঁদের দেহাত্মবাদ নিয়ে। এবং স্মৃতির সাক্ষ্য যে অন্তত দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড়ো অন্তরায়, সেটুকু কথা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ, নিত্য আত্মা মানুন বা নাই মানুন, জয়ন্তভট্ট বা উদয়নাচার্য প্রভৃতির যুক্তি থেকে অন্তত আপাতদৃষ্টিতে এটুকু মনে হয় যে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা একটা খুব মোক্ষম নিদর্শন দিয়েছেন।

চার্বাকেরা এ-তর্কের কী জবাব দেবেন ?

সত্যি বলতে কী—অন্তত আমি যেটুকু বুঝেছি—প্রাচীন কালের সাধারণ পটভূমিতে এই তর্কের কোনো উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। তার কারণ, স্মৃতি বলে ঘটনাটির পর্যাপ্ত কোনো ব্যাখ্যা প্রাচীনকালে ও এমনকি মধ্যযুগেও কারুর জানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে এই তর্কের সম্মুখীন হয়ে চার্বাকপক্ষ থেকে একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া বা দেহাত্মবাদ বর্জন করারও কারণ নেই।

কথাটার একটু ব্যাখ্যা করবার সুযোগ চাই। তার জন্যে প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অধুনালভ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় আবার ফিরতে হবে।

প্রাচীন দার্শনিকদের কাছে বিজ্ঞানের তথ্যসম্ভার প্রত্যাশা করার অবশ্যই কোনো কারণ নেই। তবুও প্রাচীন দর্শনের বিচারে একটি প্রশ্ন অবান্তর হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক থেকে প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও নিশ্চয়ই প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে, কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি—বা অন্তত কোনো অস্পষ্ট আভাস—খুঁজে পাওয়া যায় কি ? যদি যায়, তাহলে স্বীকার করতে হবে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় যার মধ্যে এই রকম ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ছিলো তার অন্তত ঐতিহাসিক মূল্য উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

কথাটা বলার বিশেষ কারণ আছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মৃতি বলে ঘটনাটির রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস শুধু আজকের ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রয়াস চলেছে এবং এমনকি বিজ্ঞানীমহলেও এই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘ যুগ ধরে গবেষণার ফলে আজকের পরিস্থিতিটা অন্য রকম। স্মৃতির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া না-গেলেও অন্তত মোটের উপর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। যে-ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে তার পরিচয়

দেবার সুযোগ এখানে নেই ; কেননা ব্যাখ্যাটা সহজ-সরল মোটেই নয়, তাই ছোট করে উল্লেখ করবার চেষ্টা করাও নিষ্ফল। উৎসাহী পাঠকেরা এ-বিষয়ে অল্পায়াসেই প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান পাবেন। কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কথা এই যে সে-গ্রন্থ মূলতই শরীরবিদ্যা বিষয়ের হবে। অর্থাৎ, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে যেটা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কথা তা এই যে আজকের বিজ্ঞান স্মৃতির ব্যাখ্যায় যতোটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেয়েছে তার মূলে শরীর বা দেহ প্রসঙ্গেই গভীরতর জ্ঞান। দেহকে বাদ দিয়ে নয়, দেহকে আরো ভালো করে বুঝেই আজ স্মৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যার দিকে অগ্রগতি।

তাহলে প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথায় আমরা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি পেতে পারি? দেহাত্মবাদের মধ্যে, না তার বিরুদ্ধমত আত্মবাদের মধ্যে? ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকদের পক্ষে স্মৃতির রহস্য কতোটুকু জানা ছিলো, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে লাভ নেই। সমস্যাটা নিয়ে তাঁরা একান্তই মাথা ঘামিয়েছিলেন কিনা, তাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবার কথা নয় যে তাঁদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই বিজ্ঞানের বীজ খুঁজে পাবার কথা। লেনিন (V.I. Lenin) বারবার বলেছেন—এবং বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণও করেছেন—বিজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-বিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ *Materialism and Empirio-criticism* সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরে অবশ্যই অনাদৃত। কিন্তু এখানে সে-আলোচনা মুলতুবি রাখা যাক। পরে "দর্শন ও রাজনীতি" নিয়ে কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করবো।

৮॥ উপসংহার

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশিষ্ট যুক্তি আলোচনা করা গেলো। এছাড়াও অবশ্য নানা সম্প্রদায়ের নানা দার্শনিক নানান যুক্তি তুলেছেন। তার মধ্যে এমন যুক্তিও আছে যে বুঝতে প্রায় হিমশিম খেতে হয়—অনেক সাধনা করে দার্শনিক বিচারের কলাকৌশলের পটুতায় রীতিমতো পাকা হলে তবে বোঝা সম্ভব। কিন্তু অতোশতোয় আমাদের আপাতত দরকার নেই।

কয়েকটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ যুক্তির সাধ্যমতো সহজ পরিচয়ই আমাদের উদ্দেশ্যর পক্ষে পর্যাপ্ত হবার কথা। এবং এজাতীয় কিছু নমুনা বিচার করে আমরা দেখবার চেষ্টা করলাম, দেহাত্মবাদ খণ্ডন সহজসাধ্য নয়। মাধবাচার্য বলেছিলেন, "দুরুচ্ছেদং হি চার্বাকস্য চেষ্টিতম্"—চার্বাকদের চেষ্টা উচ্ছেদ করা চারটিখানি কথা নয়। কথাটার উদ্দেশ্য অবশ্য তারিফ নয়, বরং কিছুটা পেঁচিয়ে গাল দেওয়া। কেননা মাধবের পুরো বক্তব্যটা হলো, খাও-দাও-ফুর্তি করো-জাতীয় কথা তো ইতর জনগণের মন টানবেই; তা উচ্ছেদ করা কি সোজা কথা? কিন্তু গাল-মন্দর এরকম কায়দা ছাড়াও বিচার-বিবেচনার দিক থেকেও হয়তো একই কথা বলা যায়: চার্বাকমত খণ্ডন করা মুখের কথা নয়। নিরপেক্ষ বিচারে বরং মনে হয় মতটির স্বকীয় শক্তির জন্যেই তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, মতটির মধ্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে-ভাবেই হোক-না-কেন—একটা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিরও ইংগিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের—বিশেষত আজকের দিনের—বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন কালের দর্শনের তুলনা করতে যাওয়া নিশ্চয়ই নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান যে-দিকে এগুতে পেরেছে এবং এগিয়েছে প্রাচীন কালের বিবিধ ও বিচিত্র মতামতের মধ্যে সেই দিক্-নির্ণয়ের কোথাও কোনো আভাসমাত্র থাকলেও ব্যাপারটা উপেক্ষা করার কথা নয়। আমাদের বিচারে চার্বাক প্রসঙ্গে যেটুকু খবর টিঁকে আছে তার মধ্যেই সে-আভাস খোঁজা নিরর্থক নয়, যদিও ঐতিহাসিকভাবে সে-আভাস অনিবার্যভাবেই দুর্বল হতে বাধ্য। তাছাড়া, আর একটা কথা তো বারবারই চোখে পড়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশ একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে বাধা পেয়েছিলো। তবুও যে-পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিলো তাও নেহাত অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। চার্বাক প্রসঙ্গে একথাও ভোলা ঠিক নয় যে এই অগ্রগতির মূলে প্রকৃত মতাদর্শগত যে-ভিত্তি তার সঙ্গেও চার্বাকমতের অন্তত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এ-বিষয়ে কিছু নিদর্শন আগে দেখেছি; আরো কিছু নিদর্শন পরে দেখবো।

কিন্তু তাই বলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা অতি-সরল চিত্র রচনা কোনো কাজের কথা নয়। চার্বাকদর্শন খণ্ডনের অনেক প্রয়াস সত্ত্বেও মতটির সারাংশ উপেক্ষণীয় না-হলেও সাধারণভাবে ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির বিচারে চার্বাক নিয়ে অত্যুক্তির প্রলোভনও বর্জন করা দরকার। এই প্রসঙ্গে প্রধানত দুটি মন্তব্য করতে চাই। প্রথমত, চার্বাক

সংক্রান্ত যেটুকু জানা আছে তার ভিত্তিতে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে মতটা অবশ্যই বস্তুবাদ। বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত বলতে ভাববাদ। বিজ্ঞানের—বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রবণতার দিক থেকে—বস্তুবাদই শ্রেয়। কিন্তু বস্তুবাদেরও ইতিহাস আছে, ক্রমোন্নতি আছে। যেমন, য়ুরোপীয় ইতিহাসে আদি-দার্শনিক আইয়োনিয়ানরা (Ionians) বস্তুবাদী ছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের যুগে দিদারো (Diderot) প্রমুখরাও বস্তুবাদী ছিলেন, মার্কস্-পূর্ব দার্শনিকদের মধ্যে ভগ্‌ট্‌ (Karl Vogt : 1817-1895), মোলেশট্ (Jacob Moleschott : 1822-1893) প্রভৃতি দার্শনিকেরাও বস্তুবাদী ছিলেন, ফয়ারবাখ্‌-ও (L. A. Feuerbach : 1804-1872) বস্তুবাদী ছিলেন। কিন্তু বস্তুবাদী ছিলেন বলেই এঁদের সকলের প্রতি মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর মনোভাব সমান নয়। এঙ্গেলস্-এর রচনায় প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে উৎসাহের অভাব নেই ; ফরাসী বস্তুবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা সুবিদিত ; ফয়ারবাখ্‌-এর বস্তুবাদ বিচার-বিশ্লেষণের পরীক্ষায় মার্জিত হয়ে মার্কস্-এঙ্গেলস্‌কে প্রেরণা দিয়েছিলো। কিন্তু ভগ্‌ট্‌, মোলেশট্ প্রভৃতির বস্তুবাদ তাঁদের বিচারে এমনই যান্ত্রিক ও নিকৃষ্ট যে মার্কসীয় রচনায় তার কঠিন সমালোচনা। অতএব, অন্তত মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর বিচারে, বস্তুবাদমাত্রই গ্রহণযোগ্য নয় ; রকমফের অনুসারে বস্তুবাদের মূল্যেও তারতম্য আছে।

অবশ্য, চার্বাক সংক্রান্ত যেটুকু কথা আমাদের জানা আছে তার উপর নির্ভর করে মন্তব্যর সুযোগ আছে যে ভারতীয় ইতিহাসে এই নামের সঙ্গে সংযুক্ত বস্তুবাদের প্রকৃত গুরুত্ব—বা এমনকি বৈপ্লবিক ভূমিকা—স্বীকার্য। বিশেষত ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে শুধু দার্শনিক বিচারের মানদণ্ডে নয়, এই গুরুত্বের অন্যান্য দিকও অনুমেয় : ভারতীয় ইতিহাসে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যতোটা বিকাশ হয়েছিলো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারও উপযুক্ত জমি প্রস্তুতের কাজেও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিলো এবং ভারতীয় দর্শনে চার্বাকমত ছাড়া আর কোনো দর্শনে নির্ভেজাল বস্তুবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে অনুমানের সুযোগ থাকে যে ভারতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে চার্বাক নাম উল্লেখ করে কোনো ঋণের প্রমাণ না-থাকলেও চার্বাক বা চার্বাক ঘেঁষা কোনো মতাদর্শের উপর প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত ছিলো। কিন্তু এবিষয়ে পরে তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস করবো।

বর্তমানে অন্য একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। চার্বাক বস্তুবাদী ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদের একমাত্র নিদর্শন বলতে চার্বাকমত নয়।

বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী সর্বাস্তিবাদীদের নিজস্ব কোনো মূল রচনা এখনো আমরা পাইনি; তিব্বতী অনুবাদে কিছু টিঁকে থাকলেও ভারতীয় বিদ্বান মহলে তার পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ আজো হয় নি। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকদের রচনায় সর্বাস্তিবাদের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে দর্শনটিকে বস্তুবাদ-গোত্রীয় বলে বিবেচনা করার বাধা নেই। এমনকি মনে করা যেতে পারে যে তদুপরি মূলত অনিত্যবাদ বা নিয়ত পরিবর্তনবাদ স্বীকৃত বলেই সর্বাস্তিবাদের মধ্যে কোনো অর্থে 'ডায়লেকটিকাল' (dialectical) বস্তুবাদের কাছাকাছি কোনো মতের আভাস খোঁজা অবান্তর নয়, কেননা নিয়ত পরিবর্তনই ডায়লেকটিক্‌স্‌-এর মূল কথা।

সাংখ্যদর্শনের আদিরূপ প্রসঙ্গেও অনেক প্রশ্ন থাকে। ভারতীয় ঐতিহ্যেই একথা স্বীকৃত যে "কালার্কভক্ষিত সাংখ্যর কলামাত্র" আজ অবশিষ্ট আছে। অতএব 'সাংখ্যকারিকা' এবং আরো ঢের পরের 'সাংখ্য-সূত্র' থেকে সাংখ্য-দর্শনের যে-রূপ পাওয়া যায় তাকেই সাংখ্যদর্শনের আদিরূপ মনে করা ভুল হবে। দর্শনটির অধুনালভ্য সংস্করণে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুই তত্ত্ব স্বীকৃত। প্রকৃতি প্রাপ্তই অচেতন পদার্থ—চলতি কথায় যাকে বলে ম্যাটার (matter)। এবং এই প্রকৃতি থেকেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। শঙ্করাচার্যর মতো চরম ভাববাদী দার্শনিক মতটি বিস্তৃতভাবে খণ্ডনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং তাঁর লেখায় "অচেতন প্রধান কারণবাদ" অর্থেই মতটি খণ্ডনের বিশেষ প্রয়াস। শুধু তাই হলে মতটিকে একরকমের বস্তুবাদ-জাতীয় দর্শন মনে করার সুযোগ থাকে। কিন্তু সাংখ্যমতের যে-পরিচয় আজ ব্যাপক তাতে অচেতন প্রকৃতি ছাড়াও পুরুষ নামে এক চেতন পদার্থ স্বীকৃত, যদিও তার বর্ণনা "উদাসীন ও অপ্রধান"। সাংখ্যদর্শনে এই পুরুষ-এর গুরুত্ব স্বীকৃত হলে অবশ্যই তাকে বস্তুবাদ-গোত্রীয় বলা যাবে না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং সুখলালজী সাংভি-র মতো একালের মহাপণ্ডিতেরা দাবি করেছেন, বিশেষত 'চরক-সংহিতা'য় সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীনতর কোনো সংস্করণের পরিচয় বর্তমান, এবং সেই সংস্করণে প্রকৃতি থেকেই পুরুষের উৎপত্তি—অতএব অচেতন-পদার্থ থেকেই চেতন-পদার্থর উৎপত্তি। এই দাবি স্বীকৃত হলে আরো স্বীকার করতে হবে, দর্শনটির আদিরূপ

বস্তুবাদ-গোত্রীয় হওয়া অসম্ভব নয়। গ্রন্থান্তরে (*Lokayata*) বিস্তৃতভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এ-হেন কোনো অর্থই শঙ্করের বুদ্ধিস্থ ছিলো বলেই হয়তো শঙ্করাচার্য সাংখ্য-খণ্ডনে অতো বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রাণবস্তু অবশ্যই পরমাণুবাদ। পরমাণুবাদ যে বস্তুবাদ-গোত্রীয়ই এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কম। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীসে চরম ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো (Plato) পরমাণুবাদী ডেমোক্রাইটস-এর (Democritus) রচনাবলী পোড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন এবং জর্জ টমসন-এর (George Thomson) মতো গ্রীক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন যে প্লেটোর বাসনা অন্তত বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছিলো বলেই ডেমোক্রাইটাস-এর স্বীয় রচনা আজ দুষ্প্রাপ্য।

অবশ্যই ন্যায়-বৈশেষিককে বস্তুবাদ-গোত্রীয় দর্শন বলতে গেলে প্রবল আপত্তি উঠবে। তার একটা বড়ো কারণ এই যে, গোতমের 'ন্যায়-সূত্র' এবং বাৎস্যায়ন-ভাষ্য থেকে শুরু করে উদয়নের 'আত্মতত্ত্ববিবেক' পর্যন্ত ন্যায়দর্শনের প্রায় সমস্ত গ্রন্থে 'আত্মা'র অস্তিত্ব প্রমাণে পরম উৎসাহের পরিচয়। কথাটা সত্যি; কিন্তু পুরো সত্যকে বুঝতে গেলে আরো একটি প্রশ্ন এখানে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

ন্যায়মতে 'আত্মা' বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে? আত্মা কি সত্যিই চেতন পদার্থ? ন্যায়মতে চৈতন্য আত্মার নিত্যগুণ না জন্যগুণ? অর্থাৎ, আত্মা কি স্বয়ং-চেতন, না, কোনোরকম বিশিষ্ট পরিবেশে আত্মার মধ্যে চৈতন্য বলে গুণের জন্ম বা উদ্ভব বা আবির্ভাব হয়? উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন, আত্মার স্বরূপ বলতে জড়বস্তুই; তার মধ্যে চৈতন্যর পরিচয় নেই। শুধুমাত্র একরকম বিশেষ অবস্থা-ফেরে আত্মার মধ্যে চৈতন্য বলে গুণটি ফুটে ওঠে। কী রকম অবস্থা? প্রথমত, আত্মার সঙ্গে দেহর সংযোগ; দ্বিতীয়ত, দেহর মাধ্যমে অন্তঃ-ইন্দ্রিয়র সংযোগ; তৃতীয়ত, অন্তঃ-ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে বহিঃ-ইন্দ্রিয়গুলির (অর্থাৎ দর্শন-ইন্দ্রিয়, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) সংযোগ; চতুর্থত, বহিঃ-ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে বিষয় বা সোজা কথায় বাহ্যবস্তুর সংযোগ। এই সংযোগ-পরম্পরার অভাবে আত্মা তার স্বীয় স্বভাব অনুসারে যে জড়বস্তু সেই জড়বস্তুই থেকে যায়—মাটির ঢেলা বা কাঠের টুকরোর মতোই।

মতটা অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হয়। আত্মা যদি স্বভাবতই জড়বস্তু হয় তাহলে চার্বাকমত খণ্ডন নিয়ে অমন মাতামাতি কেন? বিশেষত মনে

রাখা দরকার যে ন্যায়মতে বহিঃ-ইন্দ্রিয় এবং বিষয় বা বাহ্যবস্তুর উপাদান বলতে পঞ্চভূতই। তাহলে পঞ্চভূত ছাড়া ন্যায়মতে চৈতন্যই সম্ভব নয়। আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে হিরিয়ান্না তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন তুলেছেন: তাহলে চার্বাকদের সঙ্গে সত্যিকারের তফাৎটা কোথায়? প্রাচীনদের মধ্যেও সংশয় দেখা দিয়েছিলো। কেননা, ন্যায়মতে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করলে দেহাদির সঙ্গে আত্মার আর কোনো সম্পর্কই থাকে না: জড় আত্মা জড়াবস্থাতেই ফিরে যায়—কাঠের টুকরো বা মাটির ঢেলার মতোই। যাঁরা মোক্ষ বা মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা বলছেন: অমন মুক্তিতে আমাদের এতোটুকুও আকর্ষণ নেই; মৃত্যুর পর বরং শেয়াল হয়ে জন্মে বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরবো, কিন্তু কাঠের টুকরো বা লোহার ঢেলার মতো একটা জড়পিণ্ডর সামিল হয় মুক্তিলাভ করে কী হবে?

পরমাণুবাদী ন্যায়-বৈশেষিকদের আত্মা সংক্রান্ত এই মতটি আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। দেহাত্মবাদ খণ্ডন করে অনেক রকম বাগ্‌বিস্তার করলেও ভূতচৈতন্যবাদের সঙ্গে তাঁদের মতের আসল তফাৎটা এমন কিছু আকাশ-পাতাল নয়। তার বদলে বরং পরমাণুবাদীদের সঙ্গে বস্তুবাদী চার্বাকদের এক রকম দার্শনিক আত্মীয়তাই অনুমেয়, যদিও ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে অনেকরকম ভিত্তিহীন ধারণার পিছনে আজ তা আড়াল পড়েছে।

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাকদের বিরুদ্ধে অজস্র গালমন্দর নজির থাকলেও বস্তুবাদের প্রতিনিধি হিসেবে আসলে তাঁরা একান্তই নিঃসঙ্গ ছিলেন না। কিংবা, যা একই কথা, তাঁদের একেবারে একঘরে করে রাখার প্রচলিত যে-প্রথা তা অন্তত দার্শনিক বিচারের দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। কথাটার আরো প্রমাণ হিসেবে এবারে যে-নজির দেবো তা অনেকের কাছে একেবারে অসম্ভব বা আজগুবি বলেই মনে হতে পারে।

কিসের নজির? বৈদান্তিক মহলে বস্তুবাদের নজির! এমনতরো কথা যতো অসম্ভব বলেই মনে হোক না কেন, নজিরটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা পাঠকেরা তা বিবেচনা করবেন।

প্রথমত বেদান্ত বলতে ঠিক কী বোঝায় তা মনে রাখা দরকার। বেদ-এর অন্ত, তাই বেদান্ত। অর্থাৎ চলতি কথায়, বেদের শেষভাগ। নামান্তরে তাইই উপনিষদ্ বলে খ্যাত, কেন না বৈদিক ঐতিহ্যের দাবি অনুসারেই

উপনিষদ্-সাহিত্য বেদের শেষভাগ। এখন এই উপনিষদ্-সাহিত্যেরই এখানে-ওখানে বস্তুবাদের উল্লেখ যে আছে সে কথা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রায় সকলের মতেই উল্লেখগুলো পূর্বপক্ষ মাত্র। অর্থাৎ, প্রচলিত মতে উপনিষদ্-এর দার্শনিক সারাংশ বলতে ভাববাদই, যদিও ঠিক কোন্ ধরণের ভাববাদ তা নিয়ে পরবর্তীকালের উপনিষদ্-অনুগামী বা বৈদান্তিকদের মধ্যেই অনেক তর্কবিতর্ক আছে। তাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব। কিন্তু যে-অর্থেই ভাববাদ হোক-না-কেন, তার সমর্থনে বস্তুবাদ খণ্ডন ও বর্জনের প্রয়োজন। অর্থাৎ উপনিষদে বস্তুবাদের উল্লেখ অর্থাৎ পূর্বপক্ষই।

এই হলো প্রচলিত মত। তারই পুনরুল্লেখ বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তার বদলে এখানে দেখাতে চাই যে উপনিষদেরই অনেক প্রখ্যাত ঋষির মতকে সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করলে বোঝা যায় যে তাঁর মতের সারাংশ বস্তুবাদ বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। ঋষিটির নাম উদ্দালক আরুণি। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর একটি পুরো অধ্যায়ে তাঁর মত বর্ণিত হয়েছে। সে-মতের সারমর্ম যে আসলে বস্তুবাদই—এই দাবি খুব একটা অভিনব নয়। ইতিপূর্বে জ্যাকবি (H. Jacobi)—এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ওয়ালটার রুবেন (Walter Ruben) —বিচারমূলকভাবেও বিষয়টি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমাদের আধুনিক বিদ্বানেরা উপনিষদ্-এর প্রথাগত ব্যাখ্যায় এমনই অভ্যস্ত যে জ্যাকবি ও রুবেন-এর মতো দিক্‌পাল ভারততত্ত্ববিদ্‌দের বিচারকে একান্ত অনাদরের কুক্ষিতে গোপন রাখা ছাড়া তাঁদের যেন গত্যন্তর নেই। মোটের উপর তাই জ্যাকবি ও রুবেন-এর বিচার বিশেষ সুবিদিত নয়। সেই কুক্ষি থেকে ওঁদের বিচার বার করবার আগে আমি ভারতীয় দর্শনের অপর একটি সাক্ষ্য থেকে শুরু করার চেষ্টা করবো।

প্রখ্যাত নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকমতের একটা যুক্তির উল্লেখ করেছেন। যুক্তিটির সারাংশ সংক্ষেপে দেখা যাক :

অন্নপানাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট হলে চেতনার উৎকর্ষ দেখা যায় ; কিন্তু শরীরে পুষ্টির অভাব হলে চেতনাও ক্ষুণ্ণ হয়। তাছাড়া ব্রাহ্মীঘৃত খেলে চেতনা বা জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু অন্নাদিই বলুন বা ব্রাহ্মীঘৃতই বলুন—এগুলি তো নেহাতই

ভূতবস্তু। তাহলে মানতেই হবে, ভূতবস্তুর আধিক্য থাকলে চৈতন্য বাড়ে, ভূতবস্তুর অভাব ঘটলে চৈতন্য কমে। অতএব চৈতন্য ও ভূতবস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই কথা তো নিছক ভূতচৈতন্যবাদীর কথাই।

কী যুক্তি দিয়ে জয়ন্তভট্ট এই যুক্তি খণ্ডন করছেন, বর্তমান আলোচনায় তা প্রধান প্রশ্ন নয়। তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, চার্বাকের ভূতচৈতন্যবাদের সমর্থনে এ-হেন যুক্তি জয়ন্তভট্ট কোথা থেকে পেলেন? ব্রাহ্মীঘৃতর কথাটা যে আয়ুর্বেদ থেকে পাওয়া এ-বিষয়ে হয়তো মতান্তর হবে না। কিন্তু গোটা যুক্তিটার কাঠামোর মধ্যে তা তো একটা দৃষ্টান্তমাত্র। আসল প্রশ্ন হলো ওই গোটা যুক্তিটার কাঠামো নিয়ে। অন্ন প্রভৃতি নিছক ভূতবস্তুর বর্তমানতায় চৈতন্য বাড়ে, অবর্তমানতায় চৈতন্য কমে। অতএব ভূতবস্তুই চৈতন্যর আসল কারণ।

এ-হেন কোনো যুক্তি জয়ন্তভট্ট অধুনালুপ্ত চার্বাকদেরই কোনো রচনা থেকে সংকলন করেছিলেন, তা দাবি করতে যাওয়া কল্পনা-প্রাবল্যেরই পরিচায়ক হবে। যুক্তিটা কি তাহলে তিনি নিছক নিজের মাথা খাটিয়ে উদ্ভাবন করেছিলেন? এমনতরো দাবি করারও সত্যিই কোনো কারণ নেই। কেননা, উপনিষদ্-সাহিত্যেই উদ্দালক আরুণির মত প্রসঙ্গে যুক্তিটার অন্তত সারাংশ বর্তমান। আরো বড়ো কথা হলো, উদ্দালক পরীক্ষামূলকভাবে যুক্তিটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো বিষয় প্রমাণ করার এর চেয়ে প্রাচীন কোনো নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। সেদিক থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে উদ্দালকের প্রাপ্য সম্মান তিনি এখনো পাননি। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় প্রচলিত পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিকতা অবশ্যই তার একটা কারণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় বিদ্বানদের পক্ষে উদ্দালককে নিছক আত্মবাদী বা ভাববাদী বলে ধরে নেবার সুদীর্ঘ প্রথাও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আপাতত আলোচনা থাক। উদ্দালকের কথায় ফেরা যাক। আমাদের বর্তমান আলোচনায় উদ্দালকের দার্শনিক মত পুরোটা উদ্ধৃত করারও দরকার নেই। যেটুকু প্রাসঙ্গিক শুধু সেটুকুরই পরিচয় দেবো।

অন্যান্য নানা দার্শনিকের মতের মতোই 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এ উদ্দালকের

বক্তব্যটি একটা আখ্যানের রূপে প্রকাশিত। ছেলে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দেবার আখ্যান। উপদেশের মূল কথা হলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে 'নিছক সৎ' বলেই উল্লেখ করতে হবে। এই "সৎ" থেকে পর্যায়ক্রমে আগুন, জল এবং অন্নর উৎপত্তি। আগুনের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে "বাক্", জলের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে প্রাণ এবং অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে মন উৎপন্ন হয়। শেষ কথাটা—অর্থাৎ নিছক অন্ন থেকে কীভাবে "মন" উৎপন্ন হতে পারে—সে-বিষয়ে ছেলে উদ্দালক একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার অনুরোধ জানালেন। ব্যাখ্যা হিসেবে উদ্দালক একটা পরীক্ষা করে কথাটার প্রমাণ দিলেন। ছেলেকে তিনি বললেন, পনেরো দিন অন্নভক্ষণ বন্ধ রাখো, কিন্তু জল পান কোরো, কেননা জল থেকেই প্রাণের উৎপত্তি বলে এই পনেরো দিন জল পান করলে প্রাণসংশয় হবে না। ছেলে পনেরো দিন অন্নভক্ষণ বন্ধ রাখলেন, কিন্তু জল পান করে প্রাণরক্ষা করলেন। তারপর উদ্দালক বললেন, বারো বছর ধরে গুরুর কাছে যে-বেদ মুখস্থ করেছো তা আবৃত্তি করে শোনাও। শ্বেতকেতু চেষ্টা করেও বিফল হলেন; বললেন, কিছুই মনে পড়ছে না। পিতা বললেন, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি; পনেরো দিন কিছু খাওনি বলে তোমার মনের এই অবস্থা—উপনিষদের ভাষায় 'মন' অন্নাভাবে (সাময়িকভাবে) লুপ্ত হয়েছে। এবার ফিরে গিয়ে পনেরো দিন ধরে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে আবার এসো। শ্বেতকেতু তাইই করলেন। উদ্দালক বললেন, এবার আবার বেদ আবৃত্তি করে শোনাও। এবার দেখা গেলো, ছেলের বেদ মনে পড়ছে; আবৃত্তি করতে কোনো অসুবিধে হলো না। উদ্দালক বললেন, তাহলে তো দেখতেই পাচ্ছো, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি!

একেবারে যাকে বলে হাতে-নাতে প্রমাণের আয়োজন। অন্ন-র বর্তমানতায় মনও বর্তমান; অন্ন-র অবর্তমানতায় মন বিলুপ্ত হয়। তাহলে 'মন' বলে যা উল্লেখ করা হয় তা অন্ন থেকেই উৎপন্ন!

মনে রাখতে হবে, উপনিষদ্-সাহিত্যের রচনাকাল আজ থেকে অন্তত হাজার আড়াই বছর আগেকার ব্যাপার। তখন সবে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে; দার্শনিক পরিভাষা মার্জিত হতে তখনো বাকি। তাই পরের যুগে 'চৈতন্য', 'মন', 'স্মৃতি' প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যে-পার্থক্য করার আয়োজন, উপনিষদের যুগে তা প্রত্যাশা করা ইতিহাস-বোধের পরিচায়ক হবে না। তখন

'মন' শব্দ দিয়েই সাধারণভাবে চেতনা প্রভৃতি সবকিছুই বোঝা হতো। অতএব, জয়ন্তভট্টর লেখার সঙ্গে এদিক থেকে অনেকটাই তফাৎ থাকবার কথা। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ বর্ণনার সঙ্গে উদ্দালকের প্রকাশ-ভঙ্গি হুবহু একই হবার কথা নয়। কিন্তু মূল যুক্তিটা যে একই—এবিষয়ে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নেই।

জ্যাকবি ও রুবেন যে-মূল যুক্তি দেখিয়ে উদ্দালককে বস্তুবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তার মূল কথাটাও এই প্রসঙ্গে দেখা দরকার। উপনিষদ্-এর অন্যান্য প্রখ্যাত দার্শনিকেরা পরম সত্য বা জগতের আদিকারণ হিসেবে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্যের কোথাওই উদ্দালকের মুখে "ব্রহ্ম" শব্দ নেই। তার বদলে তিনি "সৎ এব" বা "নিছক সৎ" শব্দ ব্যবহার করেছেন। জ্যাকবি, রুবেন প্রমুখের দাবি হলো, এই "সৎ"-কে সাংখ্য-দর্শনের "প্রকৃতি" বা "প্রধান"-এর মতোই স্বয়ং-অচেতন বস্তু অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ফলে উদ্দালকের মতে স্বয়ং-অচেতন বস্তুই জগৎকারণ; তা থেকেই চৈতন্য প্রভৃতির উৎপত্তি। অর্থাৎ বস্তুবাদই।

বলাই বাহুল্য, বেদান্ত বা উপনিষদ্-এর কোনো ব্যাখ্যাকারই একথা মানেন নি এবং তাঁদের কারুর পক্ষেই কথাটা মানা সম্ভব নয়। বেদান্তমতের ব্যাখ্যাকার শঙ্কর এবং রামানুজ পারস্পরিক মতপার্থক্য ভুলে জোর গলায় এবং একই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, উদ্দালকের "সৎ"-কে কিছুতেই অচেতন পদার্থ বলে মানা যায় না। তাঁদের প্রতিটি যুক্তির মূল্য সমান নয় এবং এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু চরম যুক্তি হিসেবে উভয়েই যা বলেছেন সে-বিষয়ে অন্তত একটা মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুক্তিটা হলো: পুত্র শ্বেতকেতু মোক্ষলাভের আশায় উদ্দালকের কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করেছিলেন; কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভের কোনো পথ অসম্ভব বলেই পিতার পক্ষে পুত্রকে অচেতন কোনো পদার্থের উপদেশ দিয়ে বিভ্রান্ত করা তো বঞ্চনারই সামিল হবে। নিজের ছেলেকে কেউ এইভাবে ঠকাতে পারে নাকি?

আধুনিক বৈদান্তিক মহলে এ-হেন যুক্তি কম-বেশি বাহবা পেলেও যুক্তিটা নিয়ে কিছুটা মুস্কিল আছে। সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্যে কোথাও বলা হয় নি যে মোক্ষলাভের আশায় শ্বেতকেতু উদ্দালকের উপদেশ চেয়েছিলেন। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর উপাখ্যানটা থেকে বরং উল্টো কথাই অনুমান হয়: গুরুগৃহে বারো

বছর বেদ পড়ে বিদ্যার অভিমান নিয়ে ছেলে বাড়ি ফিরলে উদ্দালক তাকে দেখাতে চান সে-অভিমান আসলে অন্তঃসারশূন্য, কেননা অতোদিন ধরে বেদ পড়া সত্ত্বেও প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব ছেলের মাথায় ঢোকেনি। এবং 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এ কোথাও এমন ইংগিতমাত্রও নেই যে উদ্দালক-বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্বর জ্ঞানের বা সম্যক্ উপলব্ধি থেকেই মোক্ষ বা মুক্তিলাভ সম্ভব। অন্য কোনো উপনিষদ্ এও উদ্দালকের নামের সঙ্গে মোক্ষ বা মুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্যই, উদ্দালকের মতে যেহেতু আদিম বা পরম সত্য "নিছক সৎ" এবং এই সৎ থেকেই যেহেতু দেহ-বাক্-প্রাণ-মন—মানুষের সবকিছুরই উদ্ভব, সেইহেতু শেষ পর্যন্ত মানুষ ওই সৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা ছেলের মাথায় ভালো করে ঢোকাবার জন্যে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন : তুমি আসলে ওই সৎ-ই : "তৎ ত্বম্ অসি"। চলতি কথায় আজকাল যাকে বলি একটা ফর্মুলার মতোই। পরবর্তীকালের বৈদান্তিকেরা এই ফর্মুলার "তৎ" বলতে আত্মা-মাত্র—এ-জাতীয় ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে ফর্মুলাটাকে ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদসূচক একটা মস্ত নজির ("মহাবাক্য") হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা কষ্টকল্পনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে গ্রহণ করলেও উপনিষদ্-এর বাস্তব সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালকের মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত ; তার মধ্যে আত্মার কথা কোথাও নেই। উপনিষদ্-সাহিত্যের অন্যত্র বরং উল্টো কথাই চোখে পড়ে। উদ্দালককে প্রশ্ন করা হলো : "আত্মা বলতে আপনি কী বোঝেন ?" উদ্দালক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আমার কাছে এই পৃথিবীই আত্মা।" (ছান্দোগ্য ৫।১৭।১)। এ-হেন পৃথিবী-সর্বস্ব দার্শনিকটিকে যেন-তেন-প্রকারে ভাববাদীদের দলে ভেড়াবার জন্যে শঙ্কর-রামানুজ অনেক প্রয়াস করেছেন ; কিন্তু অন্তত উপনিষদ্-এর কোনো সাক্ষ্য থেকেই তা স্বীকার করার সম্ভাবনা নেই।

উপনিষদ্-বহির্ভূত কোনো সাক্ষ্য থেকেও নয়। পরবর্তীকালের বৈদান্তিকেরা উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতুকে মূলতই মোক্ষ-অভিলাষী বলে বর্ণনা করলেও, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার কোনো মিল হয় না। কেননা, 'কামসূত্র'-র দাবি অনুসারে এই শ্বেতকেতুই কামশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা। কামশাস্ত্র আর যাই হোক মোক্ষশাস্ত্র নয়। তাই পরবর্তীকালের বৈদান্তিকদের

দাবি মানতে গেলে আরো মানতে হবে যে পিতার কাছে মোক্ষধর্মের উপদেশ পেয়েও পুত্র কিন্তু নেহাতই বিপথগামী হয়েছিলেন ! এমনতরো কথা হজম করা সোজা নয়। কিন্তু হজমের চেষ্টা করার দরকার নেই। কেন না, উদ্দালক শ্বেতকেতুকে সত্যিই মোক্ষধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন—এ-হেন দাবিটাই কাল্পনিক। বরং বেণীমাধব বড়ুয়া দেখাবার চেষ্টা করেছেন, 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্'-এর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয়, স্বয়ং উদ্দালকেরও কামশাস্ত্রে আগ্রহ ছিলো। কেননা 'বৃহদারণ্যক'-এর এই অংশে উদ্দালক প্রজনন-সমর্থ কোনো একরকম মণ্ড প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পক্ষে সে-আলোচনায় প্রবেশ করার সুযোগ নেই, দরকারও নেই।

তাহলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের পরিচায়ক বলতে শুধুমাত্র চার্বাকই নয়। উপনিষদ্-এর প্রখ্যাত দার্শনিক উদ্দালক আরুণি থেকে শুরু করে বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ, সাংখ্যর আদিরূপ, ন্যায়-বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ প্রভৃতিকেও বিশুদ্ধ বস্তুবাদ আখ্যা দেওয়া যাক আর না-ই যাক, অন্তত বস্তুবাদ-ঘেঁষা দার্শনিক মত বলে গ্রহণ করার নানা কারণ আছে। চার্বাক-প্রসঙ্গে অধুনা-লভ্য বাস্তব তথ্য এমনই কম যে অন্যান্য বস্তুবাদী বা বস্তুবাদ-ঘেঁষা মতামতের সঙ্গে চার্বাক-মতের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ সত্যিই সংকীর্ণ। তবে এটুকু অনুমানে বোধহয় বাধা নেই যে উত্তরকালে বিশেষত ন্যায়-বৈশেষিকদের পরমাণুবাদের সমর্থনে অনেক দিক্পাল দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিলো বলেই দার্শনিক মত হিসেবে তা তুলনায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিলো। কিন্তু, এই উৎকর্ষের খাতিরে ন্যায়-বৈশেষিকদের পক্ষে অনেকাংশে মাথা নোয়াবারও দরকার হয়েছিলো ; প্রসঙ্গ-বিশেষে ভাববাদের সঙ্গে কমবেশি আপোসও করতে হয়েছিলো। পরে "দর্শন ও রাজনীতি" সংক্রান্ত আলোচনায় তার কিছু নজির দেখাবার চেষ্টা করবো।

চার্বাকমত উত্তরকালে দার্শনিক বিচারের দিক থেকে হয়তো সে-উৎকর্ষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তার কারণ বোধহয় এই যে, চার্বাকপক্ষ থেকে কোথাও কোনোরকম আপোসের আভাসই পাওয়া যায় না। চার্বাকমত হিসেবে যেটুকু আমাদের কাছে টিঁকে আছে তা থেকে অনায়াসেই অনুমান হয় বস্তুবাদ হিসেবে তা সম্পূর্ণ আপোস-হীন। ফলে দার্শনিক উৎকর্ষের দিক থেকে তা

সুযোগ-বঞ্চিত হলেও বস্তুবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার দিক থেকে ভারতীয় ইতিহাসে চার্বাকমত অতুলনীয়। চার্বাক শাস্ত্রবচন বলে ব্যাপারটাকেই স্রেফ ধোঁকাবাজী বলে ঘোষণা করে ধর্মের নামে লোকবঞ্চনা এবং শ্রেণীশোষণের পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলো ; দেহাতীত আত্মার কথা নস্যাৎ করে পরলোক পরজন্ম—এবং তার তত্ত্বগত ভিত্তি কর্মফলবাদ—একেবারে বরবাদ করতে চেয়েছিলো। ফলে সাবেকী ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভোগ জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ প্রদর্শন করেছিলো। চতুর্ভূতমাত্রর তত্ত্বকে দার্শনিক উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হোক-আর-নাই-হোক, সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় ইতিহাসে চার্বাকমতের বৈপ্লবিক ভূমিকা অবশ্যই অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ইতিহাসে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যতোটা বিকাশ তারও তত্ত্বগত ভিত্তি হিসাবে চার্বাকমতের মধ্যেই বিবিধ উপাদান পাওয়া যায়।

আজকের দিনে সমাজনীতি-রাজনীতির চাহিদার তাগিদে—এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের তাগিদেও—প্রাচীন বস্তুবাদের এজাতীয় উপাদানগুলিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় অবশ্যই এসেছে। সেইসঙ্গে দার্শনিক মত হিসেবে সেকালের বস্তুবাদকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবার তাগিদও। সেই তাগিদ আজ আমাদের কোন্ দার্শনিক মতের দিকে আকৃষ্ট করে ?

প্রশ্নটির পুরো উত্তরের জন্যে বর্তমান বই-এর চরম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বভাববাদ

১ ॥ প্রাথমিক কথা

ইতিপূর্বে—দেহাত্মবাদের আলোচনায়—"স্বভাব" শব্দের উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গটা সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাক। চার্বাকমতে আগুন বাতাস জল মাটি বলে চৈতন্যহীন ভূতবস্তুরই কোনো একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কী করে হয়? আত্মপক্ষ সমর্থনে চার্বাক অবশ্যই দাবি করবেন এ জাতীয় বিশেষ পরিণামের ব্যাখ্যায় ভূতবস্তুগুলি ছাড়া আর কিছু মানার দরকার নেই, কেননা ভূতবস্তুগুলির "স্বভাব"ই ওই—অবস্থাবিশেষে তা দেহাকারে পরিণত হয়। কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, এইভাবে চার্বাকপক্ষ সমর্থন করার পক্ষে সত্যিই কি কোনো প্রমাণ আছে? কিংবা, যা একই কথা, চার্বাক কি বাস্তবিকই "স্বভাব" বলে কিছু মানতেন? বর্তমান পরিচ্ছেদে দেখাবার চেষ্টা করবো, আমাদের দাবিটা সত্যিই কাল্পনিক নয়; প্রাচীন নজির থেকেই প্রমাণ হয় যে, চার্বাক বস্তুত স্বভাববাদী ছিলেন।

২ ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে স্বভাববাদের সবচেয়ে পুরোনো নজির বলতে 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'। উপনিষদ্‌টির নাম অবশ্য আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত ঠেকতে বাধ্য। সোজা কথায় "সাদা খচ্চর"; উপনিষদ্‌টির মধ্যেও ঋষি নিজেকে এই নামেই উল্লেখ করেছেন (৬।২১)।

পরবর্তীকালের অধ্যাত্মবাদীদের কাছেও নামটা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তাই, শঙ্করানন্দ এর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন : শ্বেত মানে বিশুদ্ধ এবং ঔপচারিক অর্থে অশ্ব মানে ইন্দ্রিয়। 'বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়'। কিন্তু মুসকিল হলো, গ্রন্থ এবং তার প্রবক্তা ঋষিটির নাম শ্বেত-অশ্বতর এবং অশ্ব ও অশ্বতর এক নয়। একালে রাধাকৃষ্ণণও বুঝেছেন, ব্যাপারটা বেশ একটু গোলমেলে ; ফলে নামটার মানে করেছেন, 'সাদা খচ্চরের মালিক'। কিন্তু ব্যাকরণের পরোয়া করলে এমন মানে দাঁড় করানো কঠিন। এবং যদিই বা দাঁড় করানো যায় তাহলেও সাদা খচ্চরের মালিকানাটা এমন কিছু আহা-মরি ব্যাপার হবে না যে তা থেকে নিজের নাম এবং তাঁরই নামে প্রচলিত উপনিষদ্‌টির নামকরণ করে কেউ খুব একটা অধ্যাত্ম-গৌরব অনুভব করতে পারেন।

পক্ষান্তরে আমাদের ধারণা, নৃতত্ত্ববিদ্‌রা যাকে প্রাচীন 'টোটেম বিশ্বাস' বলেন, নামটার পিছনে তার কোনো ইংগিত থাকা অসম্ভব নয় ; কেননা এহেন বিশ্বাসের মূল কথাই হলো গাছগাছড়া বা জন্তুজানোয়ার থেকে মানবদলের নামকরণ—দলের সবাই নিজেকে তারই বংশধর বলে কল্পনা করতো। টোটেম বিশ্বাস অবশ্যই আদিম সমাজের পরিচায়ক ; কিন্তু বিশেষত আমাদের দেশে তার রেশ দীর্ঘযুগ ধরে টিঁকে থেকেছে। আজো আছে।

কিন্তু উপনিষদ্‌টির নামকরণের কারণ যাই হোক-না-কেন, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে গ্রন্থটির গুরুত্ব বড়ো কম নয়। কেননা এই উপনিষদেই বোধহয় সর্বপ্রথম বিশিষ্ট দার্শনিক মত হিসেবে 'স্বভাব' বা "স্বভাববাদে"র উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদ্‌টির প্রথম দুটি শ্লোকেই পাওয়া যায়, যদিও শ্লোক দুটির আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা—অতএব মতভেদ—আছে। কিন্তু অতোশতো সূক্ষ্ম বিচারে আমাদের আপাতত দরকার নেই ; মোদ্দা অর্থটাই যথেষ্ট :

"পরম সত্য (উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম) নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে প্রশ্ন উঠলো : পরম সত্য (বা ব্রহ্ম) আসলে কী ? কী থেকে আমাদের জন্ম, কিসের উপর নির্ভর করে আমরা বাঁচি এবং শেষ পর্যন্ত কিসে ফিরে যাই ? আমাদের সুখদুঃখের আসল কারণ কী ?"

এই হলো প্রথম শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, এইসব প্রশ্ন নিয়ে সেকালে রকমারি মত চালু ছিলো। তার তালিকাটা খুব চিত্তাকর্ষক। একটা মতে, 'কাল'ই (বা হয়তো 'মহাকাল'—চলতি কথায় যাকে বলে Time) পরম সত্য। অর্থাৎ, 'কাল' থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি; 'কালে'ই সবকিছুর স্থিতি; 'কালে'র মধ্যেই সব কিছু আবার বিলীন হয়। মতটাকে তাই 'কালবাদ' বলার প্রথা আছে। আধুনিক বিদ্বানেরা বলছেন, 'অথর্ববেদ' থেকেই এ জাতীয় মতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এককালে একদল চিন্তাশীলের মধ্যে—বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহলে—মতটা বেশ চালু ছিলো।

দ্বিতীয় মতে, 'স্বভাব'ই পরম সত্য। আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিলয়ের মূলে এই 'স্বভাব' ছাড়া আর কিছু নেই। মতটাকে তাই 'স্বভাববাদ' বলা হয়।

তৃতীয় মতে, 'ভূতবস্তুই' পরম সত্য। মতটা অবশ্যই চার্বাকদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, কেননা প্রাচীনকালে আর কেউ নিছক ভূতবস্তুকে একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। চতুর্থ ও পঞ্চম মতে 'নিয়তি' এবং 'যদৃচ্ছা' (অর্থাৎ আকস্মিকত্বই বা কারণহীনতাই) পরম সত্য। পরে বিশেষ করে এই 'যদৃচ্ছাবাদ'-এর কথা তুলতে হবে।

এর পর উপনিষদ্-এ 'যোনি' এবং 'পুরুষ' শব্দর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দ দুটি নিয়ে বিদ্বান্‌দের মধ্যে কিছুটা বিতর্ক আছে। কেউ বলেন 'কারণ' অর্থে যোনি শব্দটাকে উপরোক্ত মতগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। অপর মতে "যোনি" বলতে স্বতন্ত্র মত উল্লিখিত। যোনি শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবশ্যই নারীর জননাঙ্গ; সেদিক থেকে জন্ম বা উৎপত্তি-সূচক মনে করে কারণ অর্থে প্রয়োগ অসম্ভব নয়। অপরে বলেন, এখানে স্বতন্ত্র একটি কারণ অর্থে যোনি শব্দের প্রয়োগ। সে-অর্থ গ্রহণ করলে হয়তো তন্ত্রমতের কোনো আদিম সংস্করণের আভাস পাওয়া যেতে পারে। আবার কেউ বলছেন, স্বতন্ত্র পরম সত্য হিসেবে এখানে সাংখ্যমতের কোনো আদি-সংস্করণের নির্দেশ অসম্ভব নয়, কেননা সাংখ্যমতে যে 'প্রকৃতি' জগৎকারণ তা নারীরূপেই কল্পিত।

এ-হেন ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে কিন্তু সাংখ্যদর্শনের আদিরূপ হিসেবে যার আভাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের পরবর্তী সংস্করণের মিল থাকে না। কেননা এই "যোনিবাদ" অনুসারে নিছক প্রকৃতি বা প্রকৃতিমাত্রই জগৎকারণ,

কেননা উপনিষদ্‌কার এখানে স্বতন্ত্রভাবে ‘পুরুষ’-এর কথা—বা ‘পুরুষবাদ’—উল্লেখ করেছেন। ‘ঋগ্বেদ’ থেকেই অবশ্য ‘পুরুষ’-কে আদি কারণ বলে ঘোষণা করার প্রথা আমাদের জানা আছে (‘পুরুষসূক্ত’), যদিও কিছু পরবর্তীকালে উপনিষদের চরম ভাববাদীরা বিশুদ্ধ আত্মা বা চিন্ময় পরব্রহ্মেরই প্রতিশব্দ হিসেবেও ‘পুরুষ’ শব্দ গ্রহণ করতে চেয়েছেন। যেমন ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ্’-এ আছে :‘…এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং যিনি অধ্যাত্ম, শরীরাবস্থিত, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও (মধু)। এই পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।’ (২।৫।১)

কিন্তু এ-আলোচনা আমাদের পক্ষে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। ‘শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্’-এ “যোনি” ও “পুরুষ” শব্দ ব্যবহারের পিছনে উপনিষদকারের বুদ্ধিস্থ আসলে কী ছিলো, সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আলোচ্য উপনিষদ্‌টির প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বরই প্রকৃত জগৎকারণ। কিন্তু এই প্রতিপাদ্য-বিষয় ব্যাখ্যা করার আগে সেকালে প্রচলিত কয়েকটি বিরুদ্ধ মত বর্জনার্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সেকালে মতগুলির বিশেষ প্রভাব না-মানলে এই উল্লেখের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাই অনুমান করা যায়, যে ওই সুদূর প্রাচীনকালেই মতগুলি বিশেষ প্রভাবশীল ছিলো।

৩॥ ভূতবাদ ও স্বভাববাদ

এগুলির মধ্যে আমাদের আলোচনায় বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলতে দুটি মত। “স্বভাববাদ” ও “ভূতবাদ”। “ভূতবাদ” বলতে চার্বাকমত—বা তারই খুব নিকটাত্মীয় কোনো প্রাচীন বস্তুবাদ—বলে গ্রহণ করায় বোধহয় বিশেষ কোনো আপত্তির আশঙ্কা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, “স্বভাববাদ”-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? স্বভাববাদ প্রসঙ্গে ‘শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্’-এর সাক্ষ্যই যদি আমাদের একমাত্র সম্বল হতো তাহলে অবশ্য ভূতবাদ ও স্বভাববাদকে আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মানতে বাধ্য হতাম, কেননা উপনিষদ্‌টিতে স্বতন্ত্রভাবেই মত দুটি উল্লিখিত হয়েছে। এ-জাতীয় পার্থক্য স্বীকার করলে স্বভাববাদকে চার্বাক বা লোকায়ত মতের পরিচায়ক বলে মনে করায় বাধা হয়। কেননা, ভূতবাদই লোকায়ত বা চার্বাকমতের প্রাণবস্তু।

কিন্তু আমরা অচিরেই দেখবো, তুলনায় কিছু পরবর্তীকালের নজির থেকে অবধারিতভাবেই প্রমাণ হয় যে, ভূতবাদী চার্বাক স্বভাববাদীও ছিলেন ; বস্তুত স্বভাববাদ না-মানলে চার্বাকের ভূতবাদ বা চরম বস্তুবাদ প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। উপনিষদে চার্বাক তো দূরের কথা লোকায়ত নামেরই কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রখর বস্তুবাদের বা ভূতবাদের বিস্তর নজির আছে। এই ভূতবাদের সঙ্গে স্বভাববাদের অনিবার্য আত্মীয়তার কথা 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এ উপলব্ধ হোক-আর-নাই-হোক, পরবর্তী সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত তারই নজির মনে রেখে গোপীনাথ কবিরাজ মন্তব্য করেছেন, "মনে হয় চরম স্বভাববাদের প্রতিনিধি বলতে সুপ্রাচীন ভারতের একদল একেবারে স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন ; আদিতে এঁদেরই লোকায়ত বলে উল্লেখ করাব প্রথা ছিলো, কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরাই অনেক ব্যাপকভাবে চার্বাক নামে পরিচিত হন। তাঁদের মতের আদিরূপটির বৈশিষ্ট্য বলতে কট্টর বস্তুবাদ, অদৃষ্টে (অর্থাৎ কর্মফলে) অবিশ্বাস, আপসহীন যুক্তিবাদ—বা হয়তো বিতণ্ডাও।" বিতণ্ডা বলতে বোঝায় বৃথাতর্ক বা শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক। বুদ্ধঘোষ অবশ্য লোকায়তিকদের ঘাড়ে বিতণ্ডাবাদের অপবাদটা চাপিয়েছিলেন। কিন্তু তার যাথার্থ্য বড়ো জোর সংশয়-সাপেক্ষ। কিন্তু বর্তমানে সে-বিতর্ক না-তুলেও নিশ্চয়ই মন্তব্য করা যায় 'শ্বেতাশ্বর উপনিষদ্'-এর উক্তি সত্ত্বেও অন্তত কিছুদিনের মধ্যেই স্বভাববাদকে লোকায়ত বা চার্বাক বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করায় বাধা নেই। 'মহাভারত'-এ তো সরাসরি বলা হয়েছে, "স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ"—যাঁরা শুধু ভূতবস্তু বিষয়েই চিন্তা করেন (অর্থাৎ শুধু ভূতবস্তুকেই মানেন) তাঁরা স্বভাববাদী। 'বৃহৎ-সংহিতা'-র ব্যাখ্যায় ভট্ট উৎপল বলছেন, "অন্যেরা, অর্থাৎ লোকায়তিকেরা স্বভাবকেই জগৎকারণ বলে গ্রহণ করেন ; স্বভাব জন্যই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি, স্বভাববশতই তার বিলোপ।" অগ্নিচিৎ পুরুষোত্তমও চার্বাক প্রসঙ্গে মোটের উপর একই কথা বলেছেন। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ'-তে চার্বাকমতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য বলছেন :

"[চার্বাক দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে :] তোমরা যদি 'অদৃষ্ট' (অর্থাৎ পূর্বকর্মের ফল ধর্ম-অধর্ম) না মানো তাহলে পৃথিবীর এতো বৈচিত্র্য তো আকস্মিক (অর্থাৎ অকারণ) বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। [চার্বাকেরা কিন্তু বলবেন], এমনতরো কথা (বা আপত্তি) ঠিক নয়, [কেননা জগৎ-

বৈচিত্র্যের) ব্যাখ্যার জন্য 'স্বভাব' স্বীকার করাই পর্যাপ্ত। [এই প্রসঙ্গে মাধব চার্বাকদের লোকগাথা উদ্ধৃত করেন :]

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

[—অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বাতাস সমস্পর্শ (গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়)। এতো বৈচিত্র্য কার সৃষ্টি ? (কারুরই নয় ;) স্বভাবের জন্যই এগুলি ওই-রকম।]"

হরিভদ্রর লেখা 'ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়' ব্যাখ্যায় গুণরত্ন স্বভাববাদের আরো কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি প্রামাণিক লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। কিছুটা স্বাধীন তর্জমায় এখানে তা উল্লেখ করা যাক :

"স্বভাববাদীরা নিম্নোক্ত দাবি করবেন। স্বভাব বলতে বোঝায় বস্তুর স্বীয় বা স্বকীয় পরিণাম। স্বভাব জন্যই সবকিছুর উৎপত্তি। যেমন, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, পট নয়। তেমনি তন্তু বা সুতো থেকে শুধু পটই তৈরি হয়। [শুধুমাত্র মাটি থেকেই ঘট তৈরি হয়, কাপড় বোনা যায় না ; তেমনি শুধুমাত্র সুতো থেকেই কাপড় তৈরি হয়, ঘট হয় না। অতএব, মাটির স্বভাবই এমন এবং সুতোরও স্বভাবই এমন যে প্রথমটি থেকে শুধু ঘট এবং দ্বিতীয়টি থেকে শুধু পট তৈরি হয় ; অন্যথা তো মাটি থেকেও পট এবং সুতো থেকেও ঘট তৈরি হতে পারতো।] স্বভাব বাদ দিয়ে এজাতীয় পরিণাম-নিয়মের কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। অতএব, সবকিছুই স্বভাবের পরিণাম বলে মানতে হবে। [এ-বিষয়ে লোকগাথা আছে :]

কণ্টককে কে তীক্ষ্ণ করলো ?
মৃগ-পক্ষীদের এতো বৈচিত্র্যই বা কার সৃষ্টি ?
এ সবই স্বভাব থেকে উৎপন্ন ;
এগুলি কারুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিণাম নয়॥

খেজুর গাছের কাঁটা তীক্ষ্ণ,
কোনোটা ঋজু, কোনোটা বাঁকা।

কিন্তু (গাছটার) ফল গোলাকার।
এসব আবার কার সৃষ্টি—বলতে পারো ?

"অন্যান্য পরিণামের কথা না-হয় বাদই দেওয়া গেলো। এমনকি স্বভাব ছাড়া মুগডালও (মুদ্গ) সেদ্ধ হয় না। রান্নার পাত্র, চুল্লির আগুন, ফোটাবার সময় (কাল) প্রভৃতি সমস্ত আয়োজন-উপকরণ সত্ত্বেও কাঁকরের মুগডাল ('কঙ্কটুকমুদ্গ' ? ডালের মতো দেখতে কাঁকর) সেদ্ধ সম্ভব নয়। অতএব, যার অভাবে কিছুর উৎপত্তি হয় না এবং যার উপস্থিতিতে উৎপত্তি হয়—উভয় দিক থেকেই স্বভাবকেই কারণ বলে মানতে হবে। [অর্থাৎ, স্বভাবই কারণ ; কেননা স্বভাব থাকলে ঘটনাটা ঘটে, না থাকলে ঘটে না : মুগডালের স্বভাবই এমন যে তা সিদ্ধ হয়, (ডালের মতো দেখতে) কাঁকরের স্বভাবই এমন যে তা সেদ্ধ হয় না।] এতএব, মুগডাল যে সেদ্ধ হয় তারও কারণ স্বভাব। তাই স্বীকার করতে হবে, সব ঘটনারই কারণ বলতে 'স্বভাব'।"

৪ ॥ স্বভাব : প্রাকৃতিক নিয়ম ?

তাহলে অন্তত কালক্রমে লোকায়ত বা চার্বাকমতে স্বভাবই সব ঘটনার কারণ বলে স্বীকৃত। এককালে এই স্বভাবের ব্যাখ্যায় কিছু প্রামাণিক লোকগাথাও প্রচলিত ছিলো। এবং ঈশ্বরবাদ ছাড়াও কর্মফলবাদের পক্ষ থেকে নানা দার্শনিক স্বভাববাদ খণ্ডন করার সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছেন। তবুও, স্বভাববাদ প্রসঙ্গে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। গ্রন্থান্তরে আমি তার প্রয়াস করেছি। এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাটার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

সাধারণত, স্বভাব শব্দের ইংরেজি করা হয় "নেচার", Nature। যে-কোনো জাগতিক ঘটনার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যায় তার জাগতিক কারণটুকুই পর্যাপ্ত। তার জন্যে অতি-প্রাকৃত বা প্রকৃতি-বহির্ভূত আর কিছু মানবার প্রশ্ন ওঠে না। ঈশ্বর নয়, অতীত কর্মের ফল হিসেবে ধর্মাধর্ম (বা পারিভাষিক অর্থে "অদৃষ্ট") —এসব কিছুই নয়। আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলবার সুযোগ দিলে হয়তো দাবি করা যেতে পারে যে, স্বভাব বলতে আমাদের প্রাচীন বস্তুবাদীরা "প্রাকৃতিক নিয়ম" বা অন্তত তারই খুব কাছাকাছি একটি ধারণা অবলম্বন করতে

চেয়েছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানে আজকাল আমরা যাকে বলি "প্রাকৃতিক নিয়ম" বা "ল অব্ নেচার" (Law of Nature)। অবশ্যই সুপ্রাচীন কালের দার্শনিকদের কাছে থেকে এই ধারণার আধুনিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রত্যাশা করা ঐতিহাসিক-ভাবে অবাস্তব হবে। কিন্তু এই ধারণারই প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস স্বভাববাদের মধ্যে খোঁজবার চেষ্টা অত্যুক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রাচীন ধ্যানধারণার মধ্যে আধুনিক--এবং অনেক সময় অতি-আধুনিক—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসন্ধান অবশ্যই অচল। কখনো বা তার ফলে রকমারি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। মহেশ যোগী নামে স্বয়ং-ঘোষিত জনৈক "মহর্ষি"-প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত "বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়" (খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে মনে হয়, তার প্রধান কেন্দ্র সুইজারল্যাণ্ড) থেকে শুরু করে এই রকম প্রয়াসের ভূরিভূরি নজির অনায়াসে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু দরকার নেই। এখানে অন্য একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এজাতীয় প্রয়াস অনেক সময় হুঙ্কারজনক পর্যায়ে পৌঁছুলেও তারই বিপরীত একরকম আশঙ্কার কথা উপেক্ষা করা ঐতিহাসিক বিচারের অন্তরায় হতে পারে। অর্থাৎ, প্রাচীন কালের চিন্তার মধ্যেও যেখানে যতোটুকু বিজ্ঞান-চেতনার প্রতিশ্রুতি ছিলো সেটুকুকেও সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। স্বভাববাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা "ল অব্ নেচার" একেবারে আধুনিক অর্থে অবশ্যই প্রত্যাশিত নয়; কিন্তু তারই যতোটুকু প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস স্বভাব-বাদের মধ্যে অনুমিত হয় তাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা কোনো কাজের কথা নয়। বরং একরকম যেন পাল্টা-ভুল। একটা ভুল—এবং তা যতো বড়ো ভুলই হোক-না-কেন—সংশোধন করার জন্য পাল্টা-ভুলের পথ ধরা যুক্তিযুক্ত নয়। স্বভাব-বাদের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা এই রকম একটা পাল্টা-ভুল বলেই মনে হয়।

৫॥ স্বভাব ও যদৃচ্ছা

এজাতীয় বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার নজির হিসেবে এখানে আরো একটু আলোচনা অবান্তর হবে না। সেকালের মতো একালের কোনো কোনো লেখক "স্বভাববাদ"-কে কিছুটা খেলো করবার উৎসাহে "যদৃচ্ছাবাদ" বলে আর

একটা প্রাচীন মতের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য দেখাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, এঁদের বিচারে "স্বভাববাদ"-ও যা, "যদৃচ্ছাবাদ"-ও তাই। যদৃচ্ছাবাদের মূল কথা কিন্তু কার্যকারণবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নেহাতই অহেতুক, অকারণ; অঘটনের সামিল। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো কারণ খুঁজতে যাওয়া বেকুবির পরিচায়ক হবে। অর্থাৎ, যদৃচ্ছাবাদ সম্পূর্ণ অর্থে বিজ্ঞান-বিরোধী, কেননা বিজ্ঞানের একটা মূল উদ্দেশ্যই হলো, প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সন্ধান। নিউটন যদি ভাবতেন, ফলটা মাটির দিকে অকারণেই বা এমনিই পড়েছে—তাহলে আর এ নিয়ে তাঁর কোন জিজ্ঞাসা জাগতো না। বিজ্ঞানও হতো না।

কিন্তু স্বভাববাদকে এইভাবে "যদৃচ্ছাবাদে"র সঙ্গে অভিন্ন মনে করার পিছনে না-আছে কোনো যুক্তি, না-কোনো নির্ভরযোগ্য বা প্রামাণ্য তথ্য। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এর যে উদ্ধৃতি থেকে বর্তমান আলোচনা শুরু করেছি, তার দিকে ফিরে তাকালেই বোঝা যাবে উপনিষদ্‌কার "স্বভাববাদ" ও "যদৃচ্ছাবাদ"—এই দুটি মতকে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থেই উল্লেখ করেছেন। তুলনায় পরবর্তীকালের নানা দার্শনিকও তাইই করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই, দরকারও নেই। শুধু একটা নমুনা আমাদের আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। স্বভাববাদের সঙ্গে যদৃচ্ছাবাদের মূল পার্থক্য দেখাবার উদ্দেশ্যে গুণরত্ন দ্বিতীয়টির খুবই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিছুটা স্বাধীন তর্জমায় এখানে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম উল্লেখ করা যায়। গুণরত্ন বলছেন,

"যদৃচ্ছা বলতে বোঝায় কোনো রকম পূর্ব-পরিস্থিতি ছাড়াই ঘটনার ব্যাখ্যা-প্রয়াস। প্রশ্ন ওঠে: এ-হেন মতবাদের সমর্থক বলতে কে বা কারা? উত্তর: কার্যকারণবাদকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে যাঁরা সব কিছুকেই একেবারে অকারণ বলে মনে করেন, তাঁরা। তাঁদের মূল যুক্তি হলো, কার্যকারণবাদ মানবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কেননা তার পক্ষে কোনোরকম প্রমাণ নেই। যেমন, পদ্মবনেও শালুকফুল ফোটে, গোবরের গাদাতেও ফোটে। কিংবা, একটা অগ্নিকুণ্ড থেকে যেমন কোনো কিছুতে আগুন ধরানো যায়, তেমনি চকমকি পাথর ঠুকেও তা সম্ভব হয়। কিংবা, কলাগাছের গুঁড়ি থেকে নতুন কলাগাছ জন্মাতে পারে, আবার বীজ পুঁতেও কলাগাছ ফলানো সম্ভব। ধুঁয়ো থেকেও ধূম উৎপন্ন হয়, কাঠে অগ্নিসংযোগের ফলেও হয়। অতএব, কার্যকারণ বলে কোনো নিয়ত

সম্বন্ধের কথাটা অলীক। মানতেই হবে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিছক অকারণ বা অহেতুক। প্রকৃত বিদ্বানেরা তাই তথাকথিত কার্যকারণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত-গুলিকে কাকতালীয়র মতোই বিবেচনা করেন ; অর্থাৎ কাক উঠে গেলো, আর এদিকে গাছ থেকে তাল পড়লো, দুটো ঘটনার মধ্যে আসলে কোনো রকম সম্বন্ধ না-থাকলেও একটিকে অপরটির কারণ বলে কল্পনা করার সামিল।"

তাহলে, আগুন কেন উষ্ণ? যদৃচ্ছাবাদী বলবেন, ব্যাপারটা নেহাতই অহেতুক ; এর কোনো কারণ খোঁজাই বেকুবি। কাঁটা কেন তীক্ষ্ণ? তারও কোনো কারণ নেই। কারণ খুঁজতে যাওয়াই বেকুবি। এ-হেন মত মানলে আর-যাই-হোক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলে কিছুই হতে পারে না। স্বভাববাদও নয়। কেননা, স্বভাববাদের মূল কথা হলো, প্রতিটি ঘটনারই পর্যাপ্ত কারণ থাকতে বাধ্য ; কিন্তু সেই কারণের সন্ধানে প্রাকৃতিক বিষয় ছেড়ে অতি-প্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত কিছু খুঁজতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাকৃতিক নিয়ম থেকেই প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যাপ্ত কারণ পাওয়ার কথা।

দুটি মতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনা পল্লবিত করার প্রয়োজন নেই। একালের অগ্রণী বিদ্বানেরা তা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করাই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে হিরিয়ান্না মন্তব্য করেছেন (কিছুটা ব্যাখ্যামূলক স্বাধীন তর্জমা) :

"কিন্তু এখানে তার মধ্যে দুটির (অর্থাৎ দুটি নাস্তিকমতের) পার্থক্য করা ভালো ; কেননা ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি বিষয় প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় তা কাজে লাগবে। তার মধ্যে একটি হলো 'আপতনবাদ' (*accidentalism*) ; দার্শনিক পরিভাষায় 'যদৃচ্ছাবাদ' বা 'অনিমিত্তবাদ'। অপরটি হলো 'প্রকৃতি-সর্বস্ববাদ' (*naturalism*) বা 'স্বভাববাদ'। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এ দুটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এবং পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত (যেমন 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি', ১।৫)। প্রথমটি অনুসারে বিশ্বপ্রকৃতি বিশৃঙ্খলার রাজ্য ; তার মধ্যে যেটুকুবা নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পাওয়া যায় তা নেহাতই আকস্মিক ঘটনামাত্র। দ্বিতীয় মতে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয়স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত ('মহাভারত', ১২।২২২।২৭ : 'স্বভাব-ভাবিনো ভাবান্')। প্রথমটি কার্যকারণ-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। দ্বিতীয়টি কার্যকারণভাবকে বিশ্বজনীন নিয়ম বলে মানে ;

কিন্তু এই মতে সমস্ত পরিবর্তন যে-বস্তুতে পরিদৃষ্ট হয় তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতি বস্তুই অনুপম ; এবং তার পুরো ইতিহাসটাই এই অনুপমতার দ্বারা পূর্বনিয়ন্ত্রিত। অতএব স্বভাববাদ অনুসারে যে-জগতে আমাদের বাস সেই জগৎ মোটেই নিয়মহীন নয় ; কেবল সেই নিয়মের নিয়ন্তা বলতে প্রকৃতিবাহ্য কিছু কল্পনা করা চলবে না। জগৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রিত ; অনিয়ন্ত্রিত নয়। অতএব অন্য মতটির সঙ্গে এই মতের পার্থক্য হলো, এই মতে যাবতীয় ঘটনা অমোঘ নিয়মের অনুবর্তী ; কিন্তু ওই অমোঘ নিয়ম বস্তুস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত—বাহ্য কোনো কর্তার আয়ত্তাধীন নয়। এ-বিষয়ে আমরা অন্ধ বলেই কল্পনা করি যে, প্রকৃতিতে নিয়ম বলে কিছু নেই বা আমরা স্বেচ্ছায় যা-খুশি করতে পারি। উভয় মতের মধ্যে মিল শুধু এইটুকুই যে উভয়ই জগৎনিয়ন্তা কোনো ঐশ্বরিক শক্তি অস্বীকার করে। তাছাড়া, দুটি মতের কোনোটিই শাস্ত্রবচন বা ঈশ্বর-আম্নাত বলে ঘোষণা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করে না। [হিরিয়ান্না অবশ্য এখানে খানিকটা হাল্কাভাবেই চার্বাকমতের পিছনে যদৃচ্ছাবাদের প্রভাব কল্পনা করেছেন ; কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে সে-জাতীয় কল্পনা বর্জনের যুক্তি দেখিয়েছি। যাই হোক, তিনি আর যদৃচ্ছাবাদ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি : পরন্তু একটু পরেই তিনি স্বভাববাদের সঙ্গেই লোকায়তমতের সম্পর্ক প্রদর্শন করেছেন।]

"এককালে স্বভাববাদ নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রচলিত ছিলো, কেননা শঙ্কর ('ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য', ১।১।২) প্রভৃতি পুরোনো কালের দার্শনিকদের রচনায় আমরা তার উল্লেখ পাই। 'মহাভারত'-এর নানা প্রসঙ্গে মতটির পরিচয় আছে (১২।১৭৯, ২২২ ও ২২৪)। মতটি প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো তার বস্তুতান্ত্রিকতা (*positivistic character*)। "অদৃষ্টবাদ"-এর বা প্রকৃতি-অতীত বিষয়ের সঙ্গে স্বভাববাদের ঐকান্তিক বিরোধ থেকেই তা সুস্পষ্ট। এদিক থেকে একদিকে 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ'-এর প্রকৃতাতীত বিশ্বাসের সঙ্গে স্বভাববাদের যে-রকম বিরোধ সেই রকমই বিরোধ 'উপনিষদ্'-এর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে। মনে হয় 'লোকায়ত' (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোক সংক্রান্ত দর্শন) বলতে আদিতে স্বভাববাদের এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই বোঝাতো, যদিও পরবর্তী সাহিত্যে লোকায়ত শব্দটিই সাধারণভাবে প্রচলিত। মতটির আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলতে দেহান্তরগামী আত্মার অস্বীকৃতি, যদিও অবশ্য এমন কথা অনুমানের সুযোগ আছে যে যতোদিন দেহে প্রাণ বর্তমান ততোদিন পর্যন্ত কোনো এক অর্থে আত্মার বর্তমানতা স্বীকার

করায় স্বভাববাদের পক্ষে হয়তো বাধা ছিলো না। কিন্তু মতটির সঙ্গে প্রধান বিরোধ বলতে অধ্যাত্মবাদেরই, কেননা অধ্যাত্মবাদের মূল কথাই হলো ভূত-অতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস। যে-সব তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের এই আলোচনা ; তার মধ্যে 'মহাভারত'-এর একটি উক্তি হলো, "মৃত্যুতেই জীবের পরম পরিসমাপ্তি"। আসলে, স্বভাববাদের বিশেষ প্রবণতা বলতে প্রকৃতি-অতীত বস্তু অস্বীকারই। এইভাবে স্থায়ী আত্মা অস্বীকার করার ফলে সাধারণত কর্মফল বলতে যা বোঝায় তাও স্বভাববাদে অস্বীকৃত। বস্তুজগতের মূল উপাদান এক বা একাধিক—এবিষয়ে স্বভাববাদীর মত সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়, কেননা মহাকাব্যে দু'রকম মতেরই ইংগিত পাওয়া যায়। যেমন, মহাকাব্যের এক জায়গায় উক্ত হয়েছে, জীবদেহ অবশ্যই পঞ্চভূতের পরিণাম ; অন্যত্র মোটের উপর একই কথা—স্বভাববাদীর মতে পঞ্চভূতই পরম সত্য। কিন্তু আবার প্রসঙ্গান্তরে উক্ত হয়েছে স্বভাববাদ অনুসারে জগৎ-বৈচিত্র্যের মূলে একই বস্তু।"

প্রাচীন সাহিত্যে বিবিধ প্রসঙ্গে ছড়ানো স্বভাববাদ-সংক্রান্ত নানা মন্তব্যে নানা রকম ঝোঁক থাকার ফলে আমাদের কাছে আজ মতবাদটি প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর অস্পষ্টতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবুও কিন্তু দুটি কথা জোর দিয়ে বলার সুযোগ আছে।

এক ॥ প্রাচীন লোকায়ত ও চার্বাকমতে জগৎ-বৈচিত্র্যের কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খোঁজা নিষ্ফল, কেননা স্বভাববাদের মধ্যেই তার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে লোকায়ত ছাড়া আর কোনো দর্শনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বভাববাদ স্বীকৃত কিনা—এ প্রশ্ন স্বতন্ত্র। একটু পরেই তা তোলা যাবে।

দুই ॥ মতটি খুব প্রাচীন বলেই ভারতীয় দর্শনে এ সম্বন্ধে যে-সব কথা পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে আধুনিক কোনো মতের সঙ্গে তার তুলনা হয়তো সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কিন্তু অত্যুক্তির আশঙ্কা এড়িয়েও বোধহয় দাবি করা যেতে পারে যে আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানে "প্রাকৃতিক নিয়ম" বলতে যা বোঝায় স্বভাববাদের মধ্যেই তার অন্তত প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস খোঁজা নিষ্ফল নয়।

৬ ॥ প্রকৃতির নিয়ম ও আধুনিক বিজ্ঞান

এইখানে প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। আশা করি তার জন্য আত্মপ্রচারের অপবাদ কুড়োতে হবে না। ঋগ্বেদে 'ঋত' এবং প্রাচীন চীনের 'তাওবাদ'-এ 'তাও' (tao) বলে দুটি সুপ্রাচীন শব্দর পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় শব্দেরই আক্ষরিক অর্থ 'পথ' বা হয়তো 'নিয়ম'—কিন্তু শুধু প্রকৃতির পথ নয়, মানব-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের পথও! অনেকদিন আগে—তিন দশক আগে—উভয় ধারণা তুলনা করে আমি ইংরেজিতে একটি নিবন্ধ রচনা করি। আমার সিদ্ধান্ত মোটের উপর এই ছিলো যে, ধারণা দুটির উৎস সন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা আদিম সাম্যসমাজের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হবো—যে-সমাজে প্রাকৃতিক সম্পর্কের নিয়ম এবং সামাজিক সম্পর্কের নিয়ম অনেকাংশে একসূত্রে বাঁধা।

আমার মতো অর্বাচীনের রচনা হলেও রচনাটি জোসেফ নীড্‌হামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি স্বীয় মহাগ্রন্থে (*Science and Civilisation in China*) নিবন্ধটির বক্তব্য উল্লেখপূর্বক সমর্থন করেন। অবশ্যই আমার কাছে তা মহাসম্মানের মতো। পরে স্বীয় গ্রন্থান্তরে আমি একই যুক্তির জের টেনে আরো দেখাতে চাই, পরবর্তী ভারতীয় দর্শনে 'স্বভাব' শব্দ ওই একই ধারণার উত্তরাধিকার বহন করছে, যদিও তা আর আদিম অর্থে নয়: পরবর্তীকালের 'স্বভাব'কে আধুনিক বিজ্ঞানের 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এর যেন একরকম পূর্বপুরুষ বলা যায়।

ব্যক্তিগত পত্রে জোসেফ নীড্‌হাম মন্তব্য করেন, এই দাবি সংশোধন-সাপেক্ষ। তাঁর একটা প্রধান যুক্তি এই ছিলো, আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাসে 'প্রকৃতির নিয়ম' বলে ধারণাটি শুরুতে একেশ্বরবাদের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত ছিলো যে, ভারতীয় চিন্তায় তার তুলনা খোঁজা বৃথা। এ-বিষয়ে স্বীয় মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াও 'হব্‌হাউস লেকচার' (Hobhouse Lecture) এবং আরো পরে 'হ্যাটফিল্ড কলেজ অব্‌ টেকনোলজি লেকচার'-এ (Hatfield College of Technology Lecture) তিনি সমস্যাটির আরো গভীরে প্রবেশ করতে চান। তাঁর বিদ্যার অবিশ্বাস্য প্রসার এবং চিন্তার গভীরতা বাদ দিয়ে মূল যুক্তিটির কংকালমাত্র বর্ণনার অধিকার পেলে বক্তব্যটি এইভাবে বলা যেতে

পারে। আধুনিক য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের আদিপর্বে 'প্রকৃতির নিয়ম' বলে ধারণাটি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গরূপেই প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম সর্বশক্তিমান একেশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ ছাড়া কিছু নয়। এমনকি নিউটনের (Newton) যুগেও নয়। এ-বিষয়ে নিউটনের ছড়া তখনকার বিজ্ঞানীদের মুখেমুখে ঘুরেছে:

> **Praise the Lord, for he hath spoken,**
> **Worlds his mighty voice obeyed ;**
> **Laws, which never shall be broken,**
> **For their guidance he hath made.**

কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় এ-হেন একেশ্বরবাদ কোথায়? বরং 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্' থেকে তো বোঝা যায়, কোনো একরকম প্রাচীন একেশ্বরবাদ সংরক্ষণের উৎসাহেই 'স্বভাববাদ' খণ্ডনের আয়োজন। পক্ষান্তরে, নীড্‌হাম দেখাতে চেয়েছেন, আদিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা পরিকল্পিত হলেও পরবর্তীকালে তার যে ধর্মনিরপেক্ষ রূপ বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে তার জন্যে য়ুরোপীয় ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব ও কলাকৌশলের অগ্রগতি মূলতই দায়ী। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে শিল্পবিপ্লবের নজিরই বা কোথায়?

বলাই বাহুল্য, তাঁর রচনা পাঠ করে আমার জ্ঞানগম্যিতে আকাশপাতাল তফাত হয়েছে—সামনে একটা সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত খুলে যাবার মতো। তবুও ভারতীয় দর্শনে 'স্বভাববাদ' প্রসঙ্গে আমার মূল বোধ শোধরাতে পারিনি: অন্তত এদেশে প্রাচীনকাল থেকে 'প্রকৃতির নিয়ম' সংক্রান্ত একটা ধারণা যেন দর্শনের আঙিনায় অন্তত প্রবেশের পথ খুঁজছিলো। কিন্তু তা একেশ্বরবাদের অঙ্গ হিসেবে নয়; তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে।

সম্প্রতি 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও কলাকৌশলের ইতিহাস' প্রসঙ্গে গবেষণার সুযোগ আমার হয়েছে। এবং এই প্রসঙ্গে শিক্ষালাভের জন্য স্বয়ং নীড্‌হামের কাছেও কিছুদিন কাটাতে পেরেছিলাম। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের সাক্ষ্যগুলি তাঁর সামনে তুলনায় বিস্তৃতভাবে পেশ করবার চেষ্টা করেছিলাম। নিজে অসামান্য বিজ্ঞানী বলেই তাঁর মনও অবিশ্বাস্য অর্থেই মুক্ত। ফলে আমার গবেষণাপ্রসূত বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় তিনি নিজে যে-মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন, তাতে স্বভাববাদ প্রসঙ্গে আমার মূল বক্তব্য উড়িয়ে দেবার

বদলে তিনি গঠনমূলকভাবেই পুনর্বিবেচনা করেছেন। জীবনে এতোখানি সম্মান যে পেতে পারি আগে তা কল্পনাও করতে পারতাম না। আশা করি আমার ভারতে বিজ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিষয়ে আরো কিছুটা বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস করে গুরুঋণ যৎসামান্য শোধ করবার সুযোগ পাবো।

৭। সাংখ্যদর্শন ও স্বভাববাদ

কিন্তু ভারতীয় দর্শনে স্বভাববাদের আলোচনা এখনো বাকি আছে। এ পর্যন্ত মূলতই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে মতটা চার্বাক-সম্মত। এবার খুবই সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করবো, শুধু চার্বাকই নয়। চার্বাকদের বিরুদ্ধে যিনি যতোই গালমন্দ করুন না কেন, আমার সীমিত বিদ্যার নির্ভরে মনে হয়েছে, চার্বাকদর্শন সংক্রান্ত প্রচলিত মতের সীমারেখা পেরিয়েও সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরাও স্বভাববাদের প্রভাব মেনেছেন।

সাংখ্যদর্শনের কথা থেকে আলোচনা শুরু করা যাক।

'মহাভারত'-এর ব্যাখ্যায় (শান্তি ২৩২।২১) নীলকণ্ঠ বলছেন, "স্বভাব ইতি পরিণামবাদিনাং সাংখ্যানাম্"—পরিণামবাদী সাংখ্যমতে "স্বভাব" স্বীকৃত। 'সাংখ্যকারিকা'র ভাষ্যে গৌড়পাদও মন্তব্য করেছেন, "সাংখ্যানাং স্বভাবো নাম কশ্চিৎ কারণমস্তি"—সাংখ্যদর্শনের অনুগামীদের মতে "স্বভাব" নামের একরকম কারণ আছে। হয়তো এজাতীয় নজিরের উপর নির্ভর করেই টি. ই. হিউম (T. E. Hume) 'শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্'-এর তর্জমা প্রসঙ্গে স্বভাববাদকে সাংখ্যবাদীর মত বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমর্থনে শঙ্করাচার্যের উক্তি অনায়াসে উদ্ধৃত করা যায়। সাংখ্য-খণ্ডনে তিনি বারবার মতটিতে স্বভাববাদের উপর নির্ভরতা প্রদর্শন করেছেন।

এজাতীয় নজিরগুলির গুরুত্ব স্বীকার করলে অনুমানের সুযোগ থাকে, পরবর্তীকালে সাংখ্যদর্শনে 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান' হিসেবে উল্লিখিত আদিম অচেতন কারণটির সঙ্গে 'পুরুষ' নামে এক চেতন তত্ত্ব সংযোজিত হলেও দর্শনটির আদিরূপে হয়তো তা ছিলো না: অচেতন প্রধান থেকে স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই জগৎ-উৎপত্তি। এই কারণেই কি পরবর্তী সাংখ্যে 'পুরুষ' সংযোজিত হলেও তা

'উদাসীন এবং অপ্রধানে'র চেয়ে বেশি মর্যাদা পায়নি? যদি তাইই হয়, তাহলে সুখলালজী এবং সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আদি-সাংখ্যকেও কোনো একরকম প্রাচীন বস্তুবাদ বলে অনুমান করার সুযোগ আরো জোরদার হয়। জৈন দার্শনিক শীলাঙ্ক তো সরাসরি এই কথাই বলেছেন। সেদিক থেকে আরো বলা যেতে পারে, বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে চার্বাক বা লোকায়ত একান্তই নিঃসঙ্গ নয়। সম্ভাবনাটি নিয়ে বিদ্বানেরা আশা করি আরো গভীর বিবেচনা করতে সম্মত হবেন। প্রথাবিরুদ্ধ হলেও এবং প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী হলেও আদিসাংখ্য নিয়ে গবেষণার সুযোগটাই অস্বীকার করা মুক্ত মনের পরিচায়ক হবে না, বিশেষত ভারতীয় ঐতিহ্যেই যখন একথা স্বীকৃত যে সাংখ্যর আদিরূপ অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার 'কলামাত্র' আজ অবশিষ্ট।

৮। স্বভাববাদ ও ন্যায়সূত্র

কিন্তু এবার যে-কথা বলার চেষ্টা করবো তাতে হয়তো আধুনিক বিদ্বানদের সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা। দেখাবার চেষ্টা করবো, এমনকি 'ন্যায়-সূত্র'-তেও স্বভাববাদের স্বীকৃতি সন্ধান একেবারে অসম্ভব কথা নয়।

প্রথমে, এ-বিষয়ে 'ন্যায়-সূত্র'র নজিরটুকু উল্লেখ করা যাক।

'ন্যায়-সূত্র'-তে পরপর তিনটি সূত্র আছে এবং একথা সর্ববাদিসম্মত যে সূত্র তিনটি মিলে একটি 'প্রকরণ'—অর্থাৎ, সহজ কথায়, একটা আলোচনার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয়।

এই কথা মনে রেখে প্রথমে সূত্র তিনটির সাধ্যমতো সরলার্থ দেখা যাক:

৪।১।২২॥ ভাববস্তুগুলির [অর্থাৎ, পৃথিবীতে বর্তমান বস্তুগুলির] নিমিত্তকারণ [অর্থাৎ, কর্তা অর্থে কারণ] নেই; কেননা কণ্টকের তৈক্ষ্ণ্য দর্শন [থেকেই তা বোঝা যায়]।

৪।১।২৩॥ নিমিত্ত অন্য, নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান অন্য; কিন্তু তাই বলেই নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান হয় না। [বুঝতে অবশ্যই অসুবিধে হয়, কেননা এমনই সাঁটে লেখা যে প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু যুক্তিটা এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে 'নিমিত্তকারণের অভাব' স্বীকারও

এক অর্থে তাকেই নিমিত্তকারণের স্থান দেওয়া ; তাই নিমিত্তকারণ অস্বীকার করলেও এক অর্থে নিমিত্তকারণকেই স্বীকার করা হয়— নিমিত্তকারণ মাত্রই নির্মূল হয় না।]

৪।১।২৪ ॥ [পূর্বসূত্রের যুক্তি] অসিদ্ধ ; কেননা নিমিত্ত এবং অনিমিত্ত-র অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

এমনই সাঁটে লেখা যে আলোচনার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা সহজসাধ্য অবশ্যই নয়। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তর্কটা জগতে বিদ্যমান বস্তুর বা ভাবপদার্থের 'নিমিত্তকারণ' নিয়ে। 'নিমিত্তকারণ' মানে কী? সোজা কথায় বলা যায়, উপাদান-অতিরিক্ত কর্তাকে নিমিত্তকারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ; কিন্তু শুধু মৃত্তিকা থাকলেই তো ঘট হয় না ; তাছাড়াও কুম্ভকার বলে কারণ মানতে হবে। এই দৃষ্টান্তে কুম্ভকারই ঘটের নিমিত্তকারণ।

তাহলে 'ন্যায়-সূত্র'র এই তিনটি সূত্রে আসল তর্কটা জাগতিক বস্তুগুলির কোনো নিমিত্তকারণ আছে কিনা—তাই নিয়ে। এগুলির উপাদান-কারণ তো সুবিদিত : ভারতীয় দর্শনে আগুন-বাতাস-জল-মাটি—এই চতুর্ভূত, কিন্তু অনেক সময় তার সঙ্গে 'আকাশ' ধরে পঞ্চভূতকেই জগতের উপাদান-কারণ বলে স্বীকার করা হয়। অন্তত নৈয়ায়িকরা তা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ-ছাড়াও জাগতিক বস্তুর নিমিত্তকারণ হিসাবে ঈশ্বর জাতীয় কিছু মানবার দরকার আছে কি? যদি না-থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে, শুধু চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতের 'স্বভাব' থেকেই সমস্ত জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি। অতএব আসল তর্ক হলো : স্বভাববাদ-বনাম-নিমিত্তকারণবাদ নিয়ে—যে-নিমিত্তকারণ বলতে ঈশ্বর, অদৃষ্ট, প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়।

তর্কের এই বিষয়বস্তু মনে রেখে এবার সূত্র তিনটির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা যাক। আগেই বলেছি, এই তিনটি সূত্র মিলে একটা গোটা প্রকরণ—অর্থাৎ একই মূল বিষয়ের আলোচনা। 'ন্যায়-সূত্র'-তে এই প্রকরণটির আগে এবং পরেও স্বতন্ত্র বিষয়ের আলোচনা।

কিন্তু এই তিনটি সূত্র মিলে যদি একটা গোটা প্রকরণ হয় তখন তার শেষ সূত্রটিকে (৪।১।২৪) সিদ্ধান্তসূত্র বলে স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ 'ন্যায়-সূত্র'কারের প্রকৃত বক্তব্য এই সূত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সিদ্ধান্ত স্থাপনের

জন্যে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের প্রয়োজন। পূর্বপক্ষ বলতে এখানে কী? নিশ্চয়ই তা অব্যবহিত পূর্বসূত্রের (৪।১।২৩) মধ্যেই খুঁজতে হবে। সেটি অবশ্যই এমন সাঁটে লেখা যে তার সরল অর্থ নির্ণয় দুষ্কর। কিন্তু আগে-পরের সূত্রর সঙ্গে মিলিয়ে মনে হয়, তার তাৎপর্য এই যে, "নিমিত্তকারণের অভাব"টাই এক অর্থে "নিমিত্তকারণেরই স্বীকৃতি"। এ-জাতীয় যুক্তিই সিদ্ধান্তসূত্রে খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে স্বীকার ও অস্বীকার মোটেই এক কথা নয়; অতএব পূর্বপক্ষের এই যুক্তি কিছুতেই ধোপে টেঁকে না। .

কিন্তু কথা হলো, পূর্বপক্ষের এই যুক্তির মূল্য যাই হোক-না-কেন, কোন্ মতের বিরুদ্ধে তা পূর্বপক্ষ? সিদ্ধান্তসূত্রে (৪।১।২৪) অবশ্য তার পুনরুল্লেখ নেই। এবং নেই বলেই, পূর্বপক্ষর (৪।১।২৩) ঠিক আগের সূত্রটিতে—৪।১।২২ সূত্রে—তা অন্বেষণ করা ছাড়া উপায় কী? অর্থাৎ ৪।১।২২-এর সূত্রটিতেই 'ন্যায়-সূত্র'কারের প্রকৃত অভীষ্ট মতটি খুঁজতে হবে। কিন্তু সে-অনুসন্ধানের ফলে আমরা কী মত পাই? জাগতিক বস্তুর বা ভাবপদার্থের নিমিত্তকারণ বলে কিছু স্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না। শুধুমাত্র উপাদান-কারণের স্বীকৃতিই জাগতিক বস্তুগুলির পর্যাপ্ত কারণ। কিন্তু এ-হেন কথা কে বলতে পারেন? যাঁর মতে উপাদান-কারণের "স্বভাব" থেকেই সমস্ত জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি। সোজা কথায়, স্বভাববাদ। পাছে কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয় এই জন্যেই ৪।১।২২ সূত্রে কি 'ন্যায়-সূত্র'কার স্বভাববাদের প্রসিদ্ধ নজির 'কণ্টকের তীক্ষ্ণতা'র উল্লেখ করেছেন?

আমাদের এই ব্যাখ্যা অবশ্যই কোনো ন্যায়মতাবলম্বীর কাছেই গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু অগ্রাহ্য করতে হলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি স্বীকার করতে হবে। ৪।১।২২ সূত্রটাও—যেখানে নিমিত্তকারণ অস্বীকার করে স্বভাববাদেরই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট—আসলে একটা পূর্বপক্ষ সূত্র। কিন্তু তা হতে পারে না। কেননা, ঠিক পরের সূত্রটিতে—অর্থাৎ প্রকৃত পূর্বপক্ষ সূত্রটিতে—এই মতেরই খণ্ডন-প্রয়াস সুস্পষ্ট। অতএব, আলোচ্য তিনটি সূত্রর মধ্যে প্রথমটিই সূত্রকারের প্রকৃত অভীষ্ট মতের পরিচায়ক।

তাহলে, পরবর্তীকালের নৈয়ায়িকরা যে-যাই বলুন না কেন, ন্যায়দর্শনের প্রাচীনতম নিদর্শনে স্বভাববাদের স্বীকৃতি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অতএব স্বভাববাদের সমর্থনে চার্বাক একেবারে নিঃসঙ্গ নন। সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের আদিরূপেও তারই ইঙ্গিত। এই কারণেই কি 'অর্থশাস্ত্র'-তে লোকায়ত, সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে "যোগ" দর্শনকে আন্বীক্ষিকী নাম দিয়ে সমগোত্রীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে?

৯॥ উপসংহার : স্বগত সংশয়

এইখানে সবিনয়ে কয়েকটি কথা স্বীকার করার প্রয়োজন আছে।

ন্যায়দর্শনকে বহুলাংশে চার্বাকের সমগোত্রীয় দর্শন হিসেবে প্রমাণ করার উৎসাহে 'ন্যায়-সূত্র'-র যে তিনটি সূত্রর সাধ্যমতো যুক্তি-তর্কমূলক আলোচনার প্রয়াস করেছি, তার প্রকৃত তাৎপর্য আমার নিজের সীমাবদ্ধ বিদ্যার কাছেও সর্বাংশে সংশয়াতীত নয়। প্রথমত, সেকাল বা একালের কোনো নৈয়ায়িকই উপরোক্ত তাৎপর্য মানেন নি এবং মানবেনও না। এবং তার প্রকৃত কারণ শুধুই যে তাঁদের সংস্কারের ঘোর—এতোবড়ো কোনো দাবি আমার মতো অর্বাচীনের মুখে নেহাতই বাচালতা হবে। কিন্তু আত্ম-সংশয়ের কারণ শুধুমাত্র এই ভয় নয়। আসলে সূত্র তিনটি এমনই সংক্ষিপ্ত যে তার পর্যাপ্ত বিচার সহজসাধ্য নয় এবং শুধুমাত্র তারই নজির থেকে সামগ্রিকভাবে ন্যায়দর্শনকে একেবারে সরাসরি ও সর্বাংশে স্বভাববাদী বলে ঘোষণা করাও অতি-বড়ো দুঃসাহসের পরিচায়ক হবে। তবুও কেন এই চেষ্টাই করেছি এ-বিষয়ে কিছুটা কৈফিয়ৎ থেকে শুরু করি। পরে আত্ম-সংশয়টুকুর ব্যাখ্যা করবো।

গ্রন্থবিচারের দিক থেকে আমাদের মূল যুক্তিটা কী? তিনটি সূত্র মিলে পুরো প্রকরণ; তাই তৃতীয় সূত্রটিকেই সিদ্ধান্ত-সূত্র বলে মনে করার কারণ আছে। এই তৃতীয় সূত্রে দ্বিতীয়টির খণ্ডন। অতএব, দ্বিতীয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল্য যাই হোক-না-কেন—কিংবা, তা নেহাতই অসার যুক্তির একরকম পালোয়ানী বলে প্রতীত হোক-না-কেন—এটিকে পূর্বপক্ষ-সূত্র বলে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ? কোন্ মতের বিরুদ্ধে আপত্তি? স্বভাবতই মনে হয়েছে, প্রথম সূত্রোক্ত মতের বিরুদ্ধে আপত্তি। সেই আপত্তি খণ্ডন করেই যখন তৃতীয় সূত্রটির অবতারণা, তখন সরলার্থ হিসেবে প্রথম সূত্রটিতেই 'ন্যায়-সূত্র'-কারের অভীষ্ট মতের সন্ধান খোঁজা অযৌক্তিক

হবে না। সরলার্থ—এবং বিশেষত কণ্টকের তীক্ষ্ণতার নজির থেকে—আরো অনুমানের প্রলোভন হয়েছে যে এই প্রথম সূত্রে স্বভাববাদেরই পরিচয়।

এ জাতীয় প্রলোভনের আরো একটা কারণ আছে। সমগ্র 'ন্যায়-সূত্র'-র আর কোথাও স্বভাববাদের উল্লেখমাত্রও নেই। অথচ সামগ্রিকভাবে ন্যায়-দর্শনে কার্যকারণবাদের গুরুত্ব সুবিদিত। তাই 'ন্যায়-সূত্র'কারের মতো প্রাচীন লেখক কার্যকারণবাদ সংক্রান্ত অমন প্রসিদ্ধ একটা প্রাচীন মতকে একেবারে অবজ্ঞা করেছিলেন—এ-হেন সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের কাছেও হয়তো এমনতরো কোনো একটা প্রশ্ন উঠেছিলো। কেননা তাঁর মতে সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে ('ন্যায়-সূত্র', ৩।২।৬১-৬২) "শরীরাদি সৃষ্টি কারণহীন নয়, পক্ষান্তরে তা অদৃষ্ট বা পূর্ব-জন্মের কর্মফলের কার্য"—এই মত ব্যক্ত করেই স্বভাববাদেরও প্রতিষেধ করেছেন ; তাই পুনরুক্তি-পরিহারের খাতিরে এখানে আর স্বতন্ত্রভবে স্বভাববাদ খণ্ডন করেননি। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য সূত্রগুলির সরলার্থ থেকে অন্তত সরলমনের পাঠকের কাছে বাৎস্যায়নের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়া কঠিন।

মোদ্দা ব্যাপারটা নিয়ে তাই বেশ একটু জটিলতা আছে।

বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে ফণিভূষণ তর্কবাগীশও আমাদের আলোচ্য তিনটি সূত্রের মধ্যে প্রথমটিকে (অর্থাৎ সূত্র ৪।২।২২-কে) পূর্বপক্ষ সূত্র বলে বর্ণনা করেছেন ; অর্থাৎ এই সূত্রেও খণ্ডনার্থে উল্লিখিত একটা মতের পরিচয়। কিন্তু পরপর এইভাবে দুটি পূর্বপক্ষ সূত্রর উল্লেখ খুব স্বাভাবিক নয়, বিশেষত যখন ঠিক পরের সূত্রে (৪।২।২৩) ওই ৪।২।২২ সূত্রের উক্ত মতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি। কিন্তু না-হয় ধরেই নেওয়া গেলো যে ওই ৪।২।২২ সূত্রটিও পূর্বপক্ষ। তবুও প্রশ্ন ওঠে, পূর্বপক্ষ হিসেবে মতটা আসলে কী? প্রচলিত উত্তর হলো : যদৃচ্ছাবাদ। অর্থাৎ, অহেতুবাদ বা আকস্মিকবাদ—সামগ্রিকভাবেই জাগতিক বস্তুর কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদৃচ্ছাবাদের প্রকৃত নিদর্শন হিসেবে 'কণ্টকতৈক্ষ্ণ্য' প্রভৃতির নজির ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া ভার ; অথচ স্বভাববাদের নজির হিসেবে তার ভূরিভূরি নজির আছে।

তবুও 'বৃদ্ধসম্মতি' যুক্তিতে না-হয় ধরেই নেওয়া গেলো যে, এই সূত্রে পূর্বপক্ষ হিসেবে যদৃচ্ছাবাদেরই নিদর্শন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গেই আরো মনে রাখা দরকার : যদৃচ্ছাবাদের খণ্ডন দুটি বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব এবং প্রয়োজনও। এক :

চরম অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিকোণ। অর্থাৎ জগৎ কারণহীন নয়; কেননা ঈশ্বর, 'অদৃষ্ট' (কর্মফল) প্রভৃতিই জগৎকারণ। দুই: চরম বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ। অর্থাৎ জগৎ কারণহীন নয়, কেননা চতুর্ভূতের স্বভাবই তার পর্যাপ্ত কারণ। অতএব যদৃচ্ছাবাদের খণ্ডন অর্থে গ্রহণ করলেও এই সূত্রটিতে স্বভাববাদের সমর্থন অসম্ভব নয়; কণ্টক-তৈক্ষ্ণ্যর নজির থেকে এ-জাতীয় অনুমানের সুযোগ আরো যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। তাহলে, পুরো প্রকরণটির মানে দাঁড়ায়: স্বভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বভাববাদের অভিব্যক্তি, তারপর তার বিরুদ্ধে একটা ভূয়ো আপত্তি এবং পরিশেষে সেই ভূয়ো আপত্তির নিরসন। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত স্বভাববাদই গ্রহণ।

আমরা মোটামুটি এই রকম একটা মানে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি।

তবুও সমস্যা থাকে এবং সেই সমস্যা নিয়েই আত্মজিজ্ঞাসা।

সমস্যাটা হলো, ৪।২।২২ সূত্রে উক্ত 'অনিমিত্ততঃ' শব্দ নিয়ে। যদৃচ্ছাবাদের বিরুদ্ধে—এবং, আমাদের যুক্তি অনুসারে, স্বভাববাদের সমর্থনে—সূত্রটিকে গ্রহণ করলে এখানে 'নিমিত্ত' শব্দকে সাধারণভাবে 'কারণ' অর্থে গ্রহণ করতে হবে; ন্যায়-বৈশেষিকরা পারিভাষিক অর্থে 'উপাদান-কারণে'র সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে 'নিমিত্তকারণ' হিসেবে যা বলেছেন সেই অর্থে নয়। যেমন, ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ কুম্ভকার। হয়তো, সাধারণভাবে এখানে 'নিমিত্ত' শব্দকে কারণ অর্থে গ্রহণ করাতেও বাৎস্যায়ন থেকে ফণিভূষণ পর্যন্ত কারুরই আপত্তি থাকবে না; কেননা যদৃচ্ছাবাদ সাধারণভাবে 'কারণ' স্বীকৃতিরই বিরুদ্ধে একটা মত।

কিন্তু খট্‌কাটা লাগে স্বভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই। স্বভাববাদীরাও কি সব-অর্থে 'নিমিত্তকারণ' অস্বীকার করে পার পাবেন? ঈশ্বর, অদৃষ্ট প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অর্থে 'নিমিত্তকারণ' বলে কিছু না-মানলেও সাধারণভাবে ও সর্বত্র 'নিমিত্তকারণ'-মাত্রই অস্বীকার করা অসম্ভব; চার্বাক যদি তা করে থাকেন তাহলে সেটা তাঁর দার্শনিক দুর্বলতারই পরিচায়ক হবে। মৃত্তিকাই ঘটের কারণ; কিন্তু এই কারণ বলতে ঐকান্তিক অর্থে 'নিমিত্তকারণে'র নিষেধ করে শুধুমাত্র 'স্বভাব' মানাই পর্যাপ্ত হবে না। কেননা, নিছক স্বভাব ছাড়া নিমিত্তকারণ হিসেব সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলে তো মাটি থাকলেই ঘট হবার কথা। কিন্তু তা হয় না। নিমিত্তকারণ হিসেবে কুম্ভকারও মানতেই হবে।

তন্তুর নিছক স্বভাবকেই বস্ত্রের পর্যাপ্ত কারণ বলা যায় না। কেননা সুতো থাকলেই কাপড় হয় না; সুতো থেকে কাপড় বোনবার জন্যে তাঁতী বলে নিমিত্তকারণও মানা দরকার। তবুও অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে এই নিমিত্তকারণও স্বভাব-নিরপেক্ষ নয়; পক্ষান্তরে স্বভাব-সাপেক্ষই। তা না-হলে তো মাটি থেকেই তাঁতী কাপড় বুনতে পারতো বা সুতো থেকেই কুমোর ঘট গড়তে পারতো।

চার্বাক প্রসঙ্গে আমাদের যেটুকু তথ্যের সম্বল তা থেকে অনুমানের সুযোগ নেই যে, এ-হেন পার্থিব অর্থে নিমিত্তকারণ বলে চার্বাক কিছু স্বীকার করতেন। যদি না করে থাকেন তাহলে তা প্রাচীন বস্তুবাদের একটা উল্লেখযোগ্য দুর্বলতারই পরিচায়ক হবে। পক্ষান্তরে ঈশ্বরবাদী অর্থে নিমিত্তকারণ স্বীকারটা বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে যতোই অগ্রাহ্যের হোক-না-কেন, 'নিমিত্তকারণ' নামে জাগতিক অর্থেও তা স্বীকার করে ন্যায়-বৈশেষিকেরা দার্শনিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। তদুপরি—আমাদের ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ 'ন্যায়-সূত্র'-র আলোচ্য অংশে যদি তাঁরা সত্যিই স্বভাববাদও মেনে থাকেন—তাহলে অন্তত এইদিক থেকে তাঁদের বস্তুবাদও উন্নত পর্যায়ের বলে স্বীকৃত হবার কথা। অবশ্য, ঈশ্বর অদৃষ্ট আপ্তবাক্য প্রভৃতির স্বীকৃতি বস্তুবাদসম্মত নয়। কিন্তু এই-সব কথা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের অন্তত আদিরূপটির পক্ষে কতোখানি অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো তা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। পরে, 'দর্শন ও রাজনীতি' প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আমরা তার কিছুটা নমুনা দেখাবার চেষ্টা করবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ

১ ॥ প্রাথমিক কথা

ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত গ্রন্থে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার কথা সাধারণত তোলাই হয় না। একথার বোধহয় একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গে বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বন্ধুমহলেই দার্শনিক হিসেবে যাঁদের প্রসিদ্ধি তাঁদের মধ্যেও অনেককে এই নিয়ে ভুরু কুঁচকোতে দেখেছি। ভাবখানা যেন এই যে, ধান ভানতে আবার শিবের গীত কেন? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে, নেহাত দাসগুপ্তর মতো মহা-পণ্ডিতের লেখা বলে পরিচ্ছেদটি সম্বন্ধে খুব একটা বিরূপ মন্তব্য অনেকেই এড়িয়ে যান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ক'জন এই আলোচনা মর্যাদা দিয়ে পড়েছেন—বা ছাত্রছাত্রীকে পড়বার উপদেশ দিয়েছেন—তা জানি না। সংশয় হয়, অনেকেই পড়েননি। এছাড়া, ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য বই থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে খুঁজেপেতে বড়োজোর দুচারটে খুচরো মন্তব্য পাওয়া যেতে পারে।

এমনকি একথাও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কথাটাই অনেকাংশে অনাদৃত। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি প্রসঙ্গে অবশ্য দেশ-বিদেশের নানা পণ্ডিত অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁদের রচনার মূল্যও বড়ো কম নয়। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার—অতএব দর্শনের—মূল স্রোতের সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণার সম্পর্ক সন্ধানের প্রয়াসটা খুবই সীমাবদ্ধ। এদিক থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এবং হয়তো মেঘনাদ সাহা—ছাড়া এই প্রসঙ্গে বড়ো কোনো নাম অন্তত চট করে মনে পড়ে না।

অথচ, প্রসঙ্গটা অবান্তর নয়। দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বাদ দিযে বিশুদ্ধ দর্শন বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান—উভয় চর্চাই অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থাকে। অন্তত আজকের দিনে একথা আর উপেক্ষণীয় নয়।

তাই চার্বাক প্রসঙ্গেও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্কের আলোচনা অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পক্ষান্তরে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে চার্বাকের সম্পর্ক কী—এই প্রশ্ন বাদ দিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকার আশঙ্কা।

কিন্তু সে-আলোচনায় এগুনার আগে বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা দরকার।

২॥ দর্শন : বিজ্ঞান ও প্রতিবিজ্ঞান

অন্ধকার সম্বন্ধে যার কোনো ধারণাই নেই তার পক্ষে আলোকে আলো হিসেবে বোঝা সম্ভব নয়। ঘুরিয়ে বললে আরো বলা যায়, আলো সম্বন্ধে যার কোনো ধারণাই নেই তার পক্ষে অন্ধকারকে অন্ধকার বলে সনাক্ত করাও অসম্ভব।

দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান ও প্রতিবিজ্ঞান প্রসঙ্গেও অনেকটা একই কথা। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলো ও অন্ধকারের সঙ্গে কোন্‌টা তুলনীয়, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের বিস্তর অবকাশ আছে। কিংবা, যা একই কথা, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে কোন্ মত বিজ্ঞান-চেতনার পুষ্টি জুগিয়েছে ? কোন্ মত বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে ?

প্রশ্নটার উত্তর অবশ্যই সহজ নয়। তার আগে কয়েকটি প্রাথমিক বিষয়ে কিছু কথা বলে রাখা ভালো।

আমাদের দেশে আলোচনা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে 'বৃদ্ধসম্মতি' বলে একটা কথা আছে। তাৎপর্য এই যে পূর্বগামী প্রগাঢ় বিদ্বান্‌দের অনুসরণ। আমরাও বর্তমানে এই পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়াস করবো।

৩॥ প্রফুল্লচন্দ্র রায় : ভারতে বিজ্ঞান-চেতনার অবক্ষয়

আধুনিক বিদ্বান্‌দের মধ্যে এখানে প্রথমেই প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস নিয়ে তাঁর আগে কেউ গবেষণা ও গ্রন্থরচনা করেছেন বলে জানা নেই—অন্তত ইংরেজী ভাষায় তো নয়ই। দু'খণ্ডে

প্রকাশিত তাঁর 'হিন্দু রসায়ন-বিজ্ঞানের ইতিহাস' (*History of Hindu Chemistry*) আজো আমাদের এক অমূল্য সম্পদ, যদিও রসায়ন-বিজ্ঞান বা কেমিস্ট্রি বলতে তাঁর সামনে যা বোঝাতো আজকের পরিস্থিতির তুলনায় তা প্রাক্‌-ইতিহাসের সামিল হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্রর বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২/৩ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৯ সালে। [তার ঢের পরে—১৯২৩ সালে—রুশ বিজ্ঞানী চেরবাট্‌স্কয় (T. Stcherbatsky) রুশ ভাষায় প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশ করেন।] ১৯০২/৩ সালের কেমিস্ট্রির পরিস্থিতিতে আকাশ-পাতাল তফাত হলেও প্রফুল্লচন্দ্রর রচনায় সাধারণভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টি সত্যিই কতো গভীর ছিলো, তারই একটা নমুনা এখানে উল্লেখ করবো।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতে প্রকৃতিবিজ্ঞানে অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে তার অবক্ষয়ের কারণ কী? কেননা, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে এদেশে প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা বাধা পেয়ে অবরুদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস-চর্চা যদি শুধু অলস কৌতূহল নিবৃত্তির বিষয় না-হয় তাহলে প্রফুল্লচন্দ্রর এই প্রশ্নটির গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম: কিসের বাধায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়েছিল—কিংবা, বিজ্ঞান-চেতনার অবক্ষয়ের আসল কারণ কী—তা সনাক্ত করতে পারলে পরই সে বাধা উত্তীর্ণ হবার আশা। অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চা-ইতিহাসের এই অতীতকে চিনতে পারার উপরই বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অন্তত বহুলাংশে নির্ভরশীল।

প্রশ্নটি বিচার করে প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে বিজ্ঞানচেতনার অবক্ষয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে মোট দ্বিবিধ কারণের উল্লেখ করেছেন।

এক: সামাজিক।

দুই: মতাদর্শগত।

আমরা পরে দেখাবার চেষ্টা করবো, স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র আলোচনা না-করলেও এই দ্বিবিধ উপাদানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু, তার আগে, তিনি যেটুকু আলোচনা করেছেন তারই পরিচয় দেখা যাক।

প্রথমত, সামাজিক কারণ। এ-বিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্যটা সংক্ষেপে ও সহজে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—বা চলতি কথায় যাকে বলি জাতিভেদ প্রথা—দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে হাতের

কাজ ও মাথার কাজের মধ্যে শুধু যে গভীর খাদ গড়ে উঠলো তাইই নয়, যারা হাতের কাজ করে সমাজে তাদের মর্যাদা প্রায় শূন্যর কোঠায় পৌছুলো। কারিগর শ্রেণী নেহাতই নীচু জাতের মানুষ বনে গেলো। অথচ, তাদেরই সঙ্গে প্রকৃতির সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক, কায়িক শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে তাদেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। কিংবা জনৈক আধুনিক ব্যাখ্যাকারের ভাষায়, প্রকৃতিকে জেরা করে তার অন্তর্নিহিত রহস্য আবিষ্কার করবার কলাকৌশল আসলে তাদেরই হাতে। কিন্তু বর্ণাশ্রম সমাজে তারা নিতান্তই ইতরজন—একেবারে নীচু শ্রেণীর লোক। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলেই তাদের অভিজ্ঞতাটা মুখে-মুখে এবং অনুকরণ মাধ্যমে শুধুমাত্র কলাকৌশল হিসাবে বংশপরম্পরায় চলে আসতে লাগলো। শিক্ষিত সমাজের বিদ্যাবুদ্ধির বা পুঁথিপত্রের আঙিনায় তার প্রবেশ অধিকার বন্ধ হলো।

এইভাবে নিছক কলাকৌশলের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কিছুই যে লাভ হয়নি, তা নয়। ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা প্রায়ই বিস্ময়জনক—কামার-কুমোর থেকে স্বর্ণকার-মণিকার পর্যন্ত অনেকের ক্ষেত্রেই বিষয়টি সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দক্ষতা অর্জনের জন্যে অসম্ভব মূল্য চোকাতে হয়েছে। কেননা, বিদ্বান্-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলেই তাদের অভিজ্ঞতা বিদগ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো পুষ্টি যোগাতে পারেনি। তারই ফলে বিদগ্ধ সমাজের একচেটিয়া ধ্যানধারণা ক্রমশই শীর্ণকায় ও প্রাণশক্তিবিহীন হয়ে পড়তে লাগলো। তারই চরম পরিণাম বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে যে-কথা বলেছেন তাইই মনে পড়ে: পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র—এজাতীয় সমস্যা নিয়ে অন্তহীন বৃথাতর্ক। বিজ্ঞান বলতে যদি প্রকৃতিকে জানার—এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে আয়ত্তে আনবার—প্রয়াসই হয়, তাহলে বর্ণাশ্রম সমাজে তার অপমৃত্যু অনিবার্য।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজে অবশ্য ঠিক এই ভাষায় তাঁর বক্তব্যটা বলেননি। কিন্তু আসল বক্তব্যটা এইই। তার ব্যাখ্যায় আমরা হয়তো অনেকখানি অত্যাধুনিক ভাষা ব্যবহার করেছি। কিন্তু তাঁর লেখা পড়তে পড়তে একটি বিষয়ের উল্লেখ আজ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত না-করে পারে না। তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, এ-হেন দুর্ভোগ শুধু আমাদের দেশের ইতিহাসেই চোখে পড়ে না। প্রাচীন য়ুরোপীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মূলত একই ব্যাপার। প্রাচীন গ্রীস

ও রোম-এ দাসপ্রথার শিকড় যতোই দৃঢ় হয়েছে ততোই ক্ষীণপ্রাণ হয়েছে বিজ্ঞান চেতনা।

১৯০২/৩ সালে লেখা কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানীর রচনায় এজাতীয় মন্তব্য পড়লে চমকে উঠতে হয়; কেননা বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের আগে য়ুরোপে বিজ্ঞানচর্চার কোনো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই আলোচনা চোখে পড়ে না। বিংশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থ দশক থেকে য়ুরোপে বিশিষ্ট তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠী প্রথম দেখাতে চান, বিজ্ঞানের উত্থানপতনের পূর্ণব্যাখ্যা শুধু বিজ্ঞানচর্চার গণ্ডীটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে বোঝা যাবে না; বিজ্ঞান-বহির্ভূত সামাজিক পরিস্থিতিতে তার প্রকৃত কারণ অনুমেয়। এর প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রফুল্লচন্দ্র মূলত একই কথা প্রমাণের প্রয়াস করেন। বিজ্ঞানে গভীর অন্তর্দৃষ্টি না-থাকলে একথা বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু, আপত্তি উঠবে, ধান ভানতে আবার শিবের গীত? উত্তরে বলবো, অন্তত ভারততত্ত্বের দিক থেকে ব্যাপারটাকে অমন তাচ্ছিল্য করার কারণ নেই। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই ঘটনার কোনো-এক-রকম সম্পর্ক উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, চার্বাকদর্শনই নামান্তরে লোকায়ত বলে খ্যাত। এবং শঙ্কর থেকে মাধব পর্যন্ত অনেকেই বলছেন, ইতর জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এই বস্তুবাদী দর্শনটির নাম লোকায়ত। ইতর কারিগর প্রভৃতির ধ্যানধারণাই যদি লোকায়ত দর্শনের প্রাণবস্তু হয় এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছেদই যদি বিজ্ঞানচেতনার বিকাশে অমন বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে অন্তত অনুমানের সুযোগ থাকে যে লোকায়তিক ধ্যানধারণার সঙ্গে বিজ্ঞান-চেতনার কোনো একরকম সম্পর্কের কথা নেহাত কাল্পনিক বলে বাতিল করাও বাড়াবাড়ি হবে।

তাহলে, এই দিক থেকেই আমরা দার্শনিক আলোচনার আঙিনায় অগ্রসর হতে পারি। এবং সেখানেই প্রফুল্লচন্দ্রর বিশ্লেষণের দুঃসাহসিক তাৎপর্যটাও চোখে পড়বে।

আগেই বলেছি, ভারতে বিজ্ঞান-চেতনার অবক্ষয়ের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র মতাদর্শের প্রসঙ্গ তুলেছেন; অর্থাৎ তাঁকে দর্শনের আঙিনায় প্রবেশ করতে হয়েছে। বলাই বাহুল্য, দার্শনিক হিসেবে—বা ভারতীয় দর্শনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে—তাঁর আসল খ্যাতি নয়। তবুও তাঁর পঠন-পাঠনের ব্যাপকতা অতি-

প্রসিদ্ধ। ভারতীয় দর্শনের অনেক গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর অবশ্যই সম্যক পরিচয় ছিলো এবং তারই ভিত্তিতে তিনি অনুভব করেন, আমাদের সাবেক-কালের দর্শনের মধ্যে কোনাটি বিজ্ঞান-চেতনার সহায়ক ছিলো, কোনোটি বা আবার বিজ্ঞান-বিকাশের পথরোধ করতে চেয়েছে।

এই আলোচনায় প্রবিষ্ট হয়ে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-চেতনার অবক্ষয়ের জন্য যে দার্শনিক মতকে—বা দেশে যে-মতের প্রবল-প্রতাপকে—বিশেষ করে দায়ী করেছেন তা শঙ্করাচার্য প্রচারিত মায়াবাদ।

মুক্তমনে এবং সহজসরল ভাষায় বোঝবার চেষ্টা করলে প্রফুল্লচন্দ্রের মূল যুক্তিটা এমন কিছু দুরূহ নয়, কিন্তু ভারতের জমিতে দাঁড়িয়ে দেশের একটা পরম দুর্ভোগের জন্যে শঙ্করকে দায়ী করার জন্যে অনেকখানি বুকের পাটারও প্রয়োজন। ক্ষীণকায় কিন্তু বিজ্ঞান-বিহ্বল আচার্যর সে-পাটা ছিলো, যদিও তাঁরই কাছে দীক্ষা পেয়ে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী-বিশেষ রীতিমতো কিছু হটতে চেয়েছেন।

প্রথমে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করে তারপর প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করবো। উদ্ধৃত করার কারণ আছে। পরবর্তীকালে তাঁর বক্তব্য অনেকাংশে চেপে যাবার চেষ্টা হয়েছে।

ভারতে বিজ্ঞান চেতনার অবক্ষয়ের জন্যে শঙ্করের মায়াবাদের প্রবল প্রতাপকে দায়ী করা কেন? তার মোদ্দা ব্যাখ্যাটা এমনই সহজ যে বোঝবার জন্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারেরও দরকার পড়ে না। শঙ্করমতে পরিদৃশ্যমান তামাম বিশ্বপ্রকৃতি আসলে মায়া বা মিথ্যা। তবুও দেখি কেন? শঙ্করমতে ও কিছু নয়। অজ্ঞানের ঘোরে দড়িতে সাপ দেখার মতো, মরুভূমিতে মরীচিকা বা জল দেখার মতো, স্বপ্নে প্রমোদ-কানন দেখার মতো। কথাগুলো মানলে এই বিশ্বপ্রকৃতিরই নিয়মকানুন গভীর থেকে গভীরতর ভাবে জানবার—এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে আয়ত্তে এনে মানুষের সুখসমৃদ্ধি বাড়াবার—সমস্ত চেষ্টাই একরকম তামাসার মতো হয়ে দাঁড়ায়। ছায়াবাজির মতো। সোজা কথায় বিজ্ঞান বলে ব্যাপারটাই একরকম বেকুবী ছাড়া আর কী হতে পারে?

অথচ এই দর্শনেরই তারিফ করে দেশ-বিদেশে যতো বই লেখা হয়েছে—এবং এখনো হচ্ছে—তা দিয়ে কতো মালগাড়ি বোঝাই হবার কথা, তার হিসেব কে করে? দর্শনটির পক্ষে এমনই প্রচার-অভিযান যে শঙ্করের নাম শুনলেই অজ্ঞ

লোকের মনে ভয়ভক্তি সম্বলিত এমন এক ভাবের উদয় হয় যে বিজ্ঞান-চেতনার দিক থেকে দর্শনটির প্রভাব নিয়ে চিন্তারই সুযোগ যেন থাকে না। প্রফুল্লচন্দ্রের ছিলো। কিন্তু তাঁরই প্রিয় শিষ্য প্রিয়দারঞ্জন রায় বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন। কিছুদিন আগে প্রফুল্লচন্দ্রর 'হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস' বইটির এক পরিমার্জিত নবসংস্করণ প্রকাশিত হয়। সাম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে প্রিয়দারঞ্জন রায়ের উপর। গ্রন্থের নামকরণে কিছুটা রদবদল করলেও সম্পাদক ঘোষণা করেন, প্রফুল্লচন্দ্রর গ্রন্থটির সারাংশ এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু এই নবসংস্করণটি প্রস্তুতের সময় শঙ্করের মায়াবাদ প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রকৃত বক্তব্য বজায় রাখা তিনি নিরাপদ বোধ করেননি। অতএব তিনি পুরো বক্তব্যটাই স্রেফ ছাঁটাই করে দিয়েছেন। এ-হেন অধিকার কোথা থেকে পাওয়া যায়, জানি না। এটুকু জানি, সম্পাদনা-দায়িত্বের স্বীকৃত মান থেকে নিশ্চয়ই নয়। বিশেষত এই কারণে নয় যে, প্রফুল্লচন্দ্রের বইটি চলতি কথায় যাকে বলে 'ক্লাসিক'। সম্পাদক তার সঙ্গে সহস্র পাদটীকা জুড়ে দিতে পারেন; স্বতন্ত্র ভূমিকা বা পরিশিষ্ট সংযোজন করেও স্বীয় মত ব্যক্ত করতে পারেন; কিন্তু মূল গ্রন্থকারের কোনো যুগান্তকারী মন্তব্যর উপর বেপরোয়া কাঁচি চালাতে পারেন না।

অথচ, আজকের পাঠকরের এমনই দুর্ভাগ্য যে, প্রফুল্লচন্দ্রের মূল বইটি একান্তই দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। বিজ্ঞান-চেতনার দিক থেকে শঙ্করমতের পরিণাম প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য অনেকেরই জানা নেই, জানা সহজও নয়। এই কারণে—ইংরেজীতে হলেও—সে-মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা অবান্তর হবে না। তিনি বলছেন :

The Vedanta philosophy, as modified and expounded by Samkara, which teaches the unreality of the material world, is also to a large extent responsible for bringing the study of physical science into disrepute. Samkara is unsparing in his stricture on Kanada and his system. One or two extracts from Samkara's commentary on the *Vedanta-Sutras*, will make the point clear : [Observed Samkara :] 'It thus appears that the atomic doctrine is supported by very weak arguments only, is opposed to those scriptural passages

which declare the Lord to be the general cause, and is not accepted by any of the authorities taking their stand on scripture like Manu and others. Hence it is to be altogether discarded by highminded men who have a regard for their own spiritual welfare…'

প্রফুল্লচন্দ্রের মন্তব্য আরো কিছুটা উদ্ধৃত করবো। কিন্তু তার আগে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করে নেওয়া ভালো।

প্রথমত, এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র কণাদের পরমাণুবাদ—সাধারণত বৈশেষিক দর্শন নামে যার পরিচয়—এবং তার বিরুদ্ধে শঙ্করের অভিযোগ উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ করে পরমাণুবাদের কথা কেন? কেননা, য়ুরোপের যে-চিন্তা-পরিবেশে স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র প্রকৃতিবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছিলেন তাতে ডালটন-এর (Dalton) পরমাণুবাদের জয়জয়কার। পরবর্তী গবেষণার ফলে অবশ্য পরম-অণু বা পরমাণুর পরমাণুত্ব কতোটা বজায় থেকেছে, তা অন্য কথা। আজকের দিনের 'পার্টিক্‌ল্‌ ফিসিক্‌স্‌'-এর (Particle Physics) সঙ্গে যাঁর পরিচয় তাঁর কাছে বিষয়টি অবশ্যই সুবিদিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই সব ব্যাপার প্রফুল্লচন্দ্রের অনেক পরেকার। অতএব তাঁর পক্ষে সাবেক-কালের ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনার প্রকৃষ্ট পরিচয়—বা অন্তত প্রতিশ্রুতি—দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক। এবং তিনি নিশ্চয়ই তা দেখতে চেয়েছিলেন। এ-হেন পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে শঙ্করের জেহাদটা তাই তাঁর কাছে প্রতিবিজ্ঞানের—বা বিজ্ঞানবিরোধিতার—এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে শঙ্করের জেহাদটার আসল কথা কী? শঙ্কর অবশ্য কণাদের যুক্তি-দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা অনেক-টাই নেহাত প্রথাগত রচনাকৌশলের মতো। আসল কথাটা এই যে, শঙ্কর নিজে যুক্তিতর্কের পরোয়া বড়ো একটা করতেন না। তাঁর মতে যুক্তির স্বীয় গুরুত্ব বা প্রতিষ্ঠা নেই; নেহাত শাস্ত্রের অনুগামী হয়ে—অর্থাৎ শাস্ত্রমতই সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে—যুক্তির যেটুকু প্রয়োগ, শুধুমাত্র সেটুকু পর্যন্তই তার মূল্য। কিন্তু স্বাধীন যুক্তির—শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তির—একেবারে কোনো মূল্যই নেই। কারণ চরম প্রমাণ বলতে শাস্ত্রবাক্য এবং শাস্ত্র-অনুগামীদের উক্তি। শাস্ত্র-অনুগামী বলতে অবশ্যই মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারের অনুগামী। তাই

পরমাণুবাদের সমর্থনে কণাদ প্রভৃতি বৈশেষিকেরা যদি হাজারো রকম এবং অতি-প্রবল যুক্তির নিদর্শন দেখাতেন তাহলেও শঙ্করের দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোনো ইতর-বিশেষ হতো না। তাই নেহাত কথার কথা হিসেবে কণাদের যুক্তি-দুর্বলতার কথা উল্লেখ করলেও পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে শঙ্করের আসল আপত্তিটা অন্য। পরমাণুবাদটা আসলে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রানুগামী মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদেরও বক্তব্য-বিরুদ্ধ। মতটা তাই অত্যন্ত পরিত্যাজ্য। বিষের মতো।

য়ুরোপের ইতিহাসেও মধ্যযুগে মোটের উপর একইভাবে শাস্ত্রবচনের দোহাই দেখিয়ে বিজ্ঞানের বিকাশ অবরোধ করার আয়োজন ছিলো। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের মতো বিজ্ঞান-বিভোর মানুষটির কাছে পুরো ব্যাপারটাই লজ্জাকর-জনক। তাই তিনি মন্তব্য করছেন :

Among a people ridden by caste and hide-bound by the authorities and injunctions of the Vedas, Puranas and Smritis and having their intellect thus cramped and paralysed, no Boyle could arise to lay down such sound principles for guidance as···

এর পর বয়েল (Boyle) থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে প্রফুল্লচন্দ্র দেখাচ্ছেন যে শাস্ত্রবচনের বাধা অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার সাক্ষ্য মেনে চলেই প্রকৃতিবিজ্ঞান মানবকল্যাণের পথ উন্মুক্ত করতে পারে।

তাহলে, মায়াবাদ-প্রতিশ্রুত মোক্ষর মায়া কাটিয়ে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষানির্ভর প্রকৃতিবিজ্ঞানের পথই মানবমুক্তির আসল পথ। অন্তত প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের এই পথেরই পথিক হতে বলেন। অবশ্যই জানি, অতি-আধুনিককালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আতঙ্কেই সারা দুনিয়া যেন থরথর করে কাঁপছে। অবশ্য আতঙ্কটা ঠিক কিসের—প্রকৃতিবিজ্ঞানের, না, মুনাফা-মুগ্ধ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যে-ভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞানের আবিষ্কার অপব্যবহারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তার—এ-প্রশ্নও দিনের পর দিন আর চাপা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানীমহলেও নয়। কেননা পরমাণুর অভ্যন্তরে নিহিত যে-শক্তি আজ পৃথিবীকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে সেই শক্তির সুব্যবহারই

আবার আনন্দমুখর নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম। তাই বিজ্ঞানের গবেষণা আজ আর শুধু গবেষণাগারের মধ্যেই আবদ্ধ নয়; সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতির সঙ্গেও গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ-বিচার পরে তোলা যায়। আপাতত মন্তব্য শুধু এই যে, প্রফুল্লচন্দ্রর যুগে এ-জাতীয় সমস্যা ওঠেনি। যে-চিন্তাপরিবেশে তাঁর নিজের বিজ্ঞান-সাধনা সেখানে মানবমুক্তির আশায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপরই অসীম আস্থা। এই আশাভঙ্গের সত্যিই কোনো কারণ আছে কিনা—আজকের দিনে অনেকেই সে-প্রশ্ন তুলেছেন এবং নেতিবাচক উত্তরে উপনীত হয়েছেন। মুনাফা-লোভী দানবটির কবল-মুক্ত করতে পারলে এই বিজ্ঞানই পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনবে। কিন্তু তার জন্যে অনেক সংগ্রাম দরকার—রাজনীতির সংগ্রামও। কিন্তু আপাতত আলোচনা বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে, কিংবা, আরো ভেঙে বলতে হয়, বিজ্ঞানের মতাদর্শগত ভিত্তি নিয়ে।

প্রাচীন কালের চার্বাক এই ভিত্তি কোনো পথনির্দেশ দিয়েছেন কি?

৪॥ চার্বাক বনাম মায়াবাদ

আলোচনা শুরু করেছিলাম, আলো আর অন্ধকার নিয়ে। অন্ধকার সম্বন্ধে যার কোনো ধারণাই নেই তার পক্ষে আলোকে আলো বলে চেনবারও কোনো উপায় নেই। এই কারণেই মায়াবাদ নিয়ে কিছুটা বিচারের দরকার পড়েছিলো। বুদ্ধসম্মতির যুক্তি অনুসরণ করে বিজ্ঞান বনাম মায়াবাদ প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের বিচার উদ্ধৃত করা গেলো। চার্বাকমত ও তার পরিণাম প্রসঙ্গে এই আলোচনার দরকারও ছিলো। কথাটার আর একটু ব্যাখ্যা অবান্তর হবে না।

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকমতের ঐকান্তিক বিপরীত বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তা শঙ্করমত। চলতি নাম মায়াবাদ। আলো আর অন্ধকারের মতোই পরিপূর্ণ অর্থে বিপরীত। কতোটা বিপরীত? ব্যাখ্যা করতে গেলে কিছুটা পুনরুক্তি অনিবার্য। কিন্তু ব্যাখ্যার দরকার আছে। তাই কিছুটা পুনরুক্তিরও।

প্রাকৃতজনের পরিভাষায় যাকে বলে মাটির পৃথিবী, চার্বাকমতে তাইই একমাত্র সত্য। শঙ্করমতে ওসব নেহাতই ঝুটো ব্যাপার। ভূতবস্তু তো বটেই। তামাম বিশ্ব দুনিয়াই।

চার্বাকমতে দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই। আত্মা শব্দ যদি রাখতেই চাও তাহলে ওই দেহকেই আত্মা বলো। শঙ্করমতে আত্মাই একমাত্র সত্য : পাপের পরিণামে এবং অজ্ঞানের ঘোরেই দেহর কল্পনা। এই কল্পনা কাটিয়ে চিন্ময় আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধিই মোক্ষ ; মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। চার্বাকমতে পুরুষার্থ বলে যদি কিছুতে সত্যিই অভিরুচি থাকে তাহলে পেট-পুরে খেয়ে দেয়ে দেহটিরই পরিচর্চা করো। মোক্ষ তো দূরের কথা ; পাপ-পুণ্য, পরকাল-পরলোক—এইসব বলে যুগের পর যুগ ধরে যা কিছু প্রচার করা হয়েছে তা নেহাতই লোক-ঠকানো জীবিকার উপায়।

শঙ্করমতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। চোখে-দেখা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ তো দূরের কথা, এমনকি অনুমান, যুক্তি-তর্ক—সবকিছুই বর্জন করতে হবে। তবেই বিশুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের ফানুসে চড়ে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছোনো যাবে। শঙ্করের প্রধান বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে শুরুতেই তাঁর উপদেশ : প্রমাণ-প্রমেয় বলে যা কিছুর কথা বলা হয় তা সবই একেবারে বরবাদ না-করলে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। চার্বাকমতে প্রমাণ মানতেই হবে এবং আরো মানতে হবে যে প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। মতটাকে খেলো করবার উৎসাহে অনেকে অবশ্য অপব্যাখ্যা করে বলেছেন, চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, 'অর্থশাস্ত্র' থেকে শুরু করে এ-হেন কথার বিরুদ্ধে বহু নজির আছে। প্রত্যক্ষ-পূর্বক অনুমান স্বীকার করায় চার্বাকের পক্ষে কোনো বাধা ছিলো না ; কিন্তু ঈশ্বর আত্মা পরকাল প্রভৃতি একান্তই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে হাজারো যুক্তি বা অনুমান চার্বাক মানতেন না।

চার্বাকের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি থেকে আরো একটা বিষয় আঁচ করা যায়, যদিও আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে কেউই সেকথা তুলেছেন বলে জানা নেই। প্রশ্ন হলো, প্রমাণের প্রামাণ্য কী করে নির্ণয় করা হবে ? কিংবা, সোজা কথায়, কোন্ কথা সত্যি আর কোন্ কথা মিথ্যে তা যাচাই করবার কায়দাটা কী ? লোকগাথাগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়, চার্বকপক্ষ থেকে এই প্রশ্নের শুধু একটাই উত্তর হতে পারে। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় উত্তরটা হলো 'প্রবৃত্তিসামর্থ্য'। সহজ কথায়, বাস্তব কর্মজীবনে সার্থকতা এবং সার্থকতার অভাব থেকেই বোঝা যায়, কোন্ কথা সত্যি আর কোন্ কথা মিথ্যে। শ্রাদ্ধপিণ্ড খেয়ে যদি পরলোকে বসে পেট ভরে তাহলে গ্রামান্তরে যাবার সময়

চাল-চিঁড়ের পুঁটলি বওয়া কেন? তার মানে, ঘরে বসে দূরস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্ন খেয়ে পেট ভরবার সম্ভাবনা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যাচাই করে দেখবে। দেখবে দাবিটা অচল। ব্যবহারজীবনের সাক্ষ্যই সত্য-মিথ্যা নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড। আসলে ন্যায়দর্শনেও মূলত একই কথা। তবে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক পরিভাষায় তার অভিব্যক্তি। 'ন্যায়-সূত্র'র ভাষ্যের ভূমিকাতেই বাৎস্যায়ন তা ঘোষণা করেছেন: জলাশয়ে দেখা জল সত্যি, কেননা তা পান করে বাস্তব জীবনে সত্যিই তৃষ্ণা নিবারণ হয়। কিন্তু মরীচিকায় দেখা জল মিথ্যে, কেননা তা পান করে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। মূলত এই কথাটাই য়ুরোপের সম্প্রদায়-বিশেষের বক্তব্য। তাই ইংরেজীতে তাঁদের কথা হলো: Practice is the criterion of truth। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে নৈয়ায়িকেরা বিশেষত কোন্ মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে একই দাবি করেছেন? চরম ভাববাদীদের মত: বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী শূন্যবাদী এবং বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী মায়াবাদীদের মত। ব্যবহার-জীবনের সাফল্যর কথাটা এঁরা একেবারে উড়িয়ে দিতে চান, কেননা সে-সাক্ষ্যর ফাঁদে পড়লে চরম ভাববাদের আর রক্ষা নেই। ভাববাদের কথা হলো, জলাশয়ের জলও মরীচিকার জলের মতোই শূন্য বা মায়া বা কাল্পনিক ধারণামাত্র। অতএব এদিকে থেকেও, অন্তত প্রামাণিক লোকগাথায় স্বীকৃত কর্মজীবনের সাফল্যকেই সত্যের মাপকাঠি বলে মেনেছেন বলেই চার্বাকের সঙ্গে শঙ্করের মায়াবাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

৫। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলো আর অন্ধকার

ভারতে বৈজ্ঞানিক চেতনার তত্ত্বগত ভিত্তি আলোচনার উদ্দেশ্যে দুটি ঐকান্তিক অর্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের উল্লেখ করা গেলো: চরম বস্তুবাদ ও চরম ভাববাদ। শঙ্করের মায়াবাদ চরম ভাববাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচনা অনুসরণ করে আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানচেতনার সহায় হওয়া তো দূরের কথা, ভারতীয় ইতিহাসে মায়াবাদই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু এই প্রসঙ্গে চার্বাক বা চরম বস্তুবাদের ভূমিকা কী?

প্রশ্নটা তোলা সোজা। কিন্তু উত্তর খোঁজা সহজ কথা নয়। তার একটা মস্ত বড়ো কারণ, ভারতে বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চাই এখনো মোটের উপর শিশুর মতো, সবে যেন হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। অবশ্যই গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ভারতের অবদান নিয়ে দেশবিদেশের নানা বিদ্বান অনেক উচ্চাঙ্গ আলোচনা করেছেন ; কিন্তু তা এখনো বহুলাংশেই বিক্ষিপ্ত। এগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ পটভূমিতে তা বোঝবার আয়োজনের জন্যে অনেক-অনেক গবেষণা এখনো বাকি। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারা বিজ্ঞান সাধনার কতোটা সহায়ক হয়েছিলো তা বিচারের প্রয়াস বড়োজোর প্রাথমিক ও বিতর্ক-কণ্টকিত হতে বাধ্য। তবুও কিছুটা চেষ্টার অন্তত শুরু করা দরকার, এবং সেই প্রসঙ্গেই বিশেষ জোর দিয়েই আরো বলে রাখা দরকার যে, আলোচনার মূল্যটুকু সাময়িক এবং অনেক সংশোধন-সাপক্ষে হওয়া সম্ভব।

বর্তমানে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ ছেড়ে বিশেষত আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য করবো। তার প্রধান কারণ অবশ্যই ব্যক্তিগত। সাধারণ ভাবে আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে আমি গ্রন্থান্তরে কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করেছি। বইটি *Science and Society in Ancient India* নামে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমার মূল বক্তব্যর সমর্থনে যুক্তি ও নজির পেশ করবার চেষ্টা করেছি। তাই আর এখানে নতুন করে সেগুলির পুনরুল্লেখ না-করেও এগুবার চেষ্টা নেহাত অসঙ্গত হবে না।

আরো একটা কারণ আছে। ব্যক্তিগতভাবে যতোটুকু বুঝেছি তার উপর নির্ভর করে মনে হয়েছে ভারতীয় ইতিহাসে আয়ুর্বেদই সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলো, যদিও সামাজিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধতা এমনই প্রবল ছিলো যে তা বহুলাংশে প্রতিশ্রুতিমাত্রই হয়ে রইলো। তবুও প্রতিশ্রুতি হিসেবে তা মহামূল্য বলেই প্রতীত হয়েছে।

এখানে সব কথা আলোচনার সুযোগ অবশ্যই হবে না। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দু'একটা বিষয়ের পুনরুল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে—বিশেষত বস্তুবাদ এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি প্রসঙ্গে দু-চার কথা।

আয়ুর্বেদের আদি-গ্রন্থ বলতে 'চরক-সংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'। উভয় গ্রন্থেই একথা স্বীকৃত যে অনেকের হাত ঘুরে—অনেকভাবে পরিবর্তিত হয়ে—গ্রন্থ

দুটি শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পরবর্তীকালে উভয় সংকলনের মধ্যে হাজারো বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে—তার মধ্যে অজস্র বিষয়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদের মূল প্রতিপাদ্যর কোনো সম্পর্ক নেই। কেন এবং কীভাবে সংযোজিত হয়েছে তা নিয়ে এখনো বিস্তর গবেষণা বাকি। তবুও সংযোজিত যে হয়েছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে উভয় সংকলনের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই তা প্রমাণ করা সম্ভব। তাই 'চরক-সংহিতা' বা 'সুশ্রুত সংহিতা' থেকে যে-কোনো কথা উদ্ধৃত করেই তা প্রকৃত আয়ুর্বেদ-সম্মত বিজ্ঞান বলে ঘোষণা করা নিরাপদ তো নয়ই, অনেক সময় বিশেষ বিভ্রান্তিকর। একথা প্রমাণের জন্যে সংহিতা দুটির গণ্ডী পেরুতে হয় না; তার মধ্যে থেকেই কথাটা প্রমাণ করা যায়।

বর্তমানে, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে আমাদের আলোচনা। এই উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র নিম্নোক্ত বিষয়ে কিছু মন্তব্য করবো. কেননা আমাদের যুক্তি অনুসারে এই বিষয়গুলিই ভারতীয় বস্তুবাদের প্রকৃষ্ট নির্দেশক।

১। শাস্ত্রশাসনের শৃঙ্খলমুক্তি।

২। ভূতবাদ—এমনকি ভূতচৈতন্যবাদ। অতএব আত্মা প্রসঙ্গে ঔদাসীন্য।

৩। প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ।

৪। স্বভাববাদ।

৫। প্রমাণ প্রসঙ্গে প্রবৃত্তিসামর্থ্যবাদ।

আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার না-করেও দাবি করা অত্যুক্তি হবে না যে 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত সংহিতা'য় এগুলির পরিচয় পেলেই আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তিকে বস্তুবাদ-সম্মত বলে ঘোষণা করার সুযোগ থাকে। সে-বস্তুবাদের সঙ্গে চার্বাকের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হোক-আর-নাই হোক, অন্তত চার্বাকের বিরুদ্ধে প্রধানতম অভিযোগটা মোটের উপর প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন হয়, কেননা এই অভিযোগ বলতে মূলতই বস্তুবাদ।

'চরক-সংহিতা'য় একাধিকবার একটি বিষয়ের আলোচনা চোখে পড়ে: "দৈব-ব্যপাশ্রয় ভেষজ" এবং "যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ"-এর মধ্যে পার্থক্য। সোজা কথায়, চিকিৎসা-ব্যবস্থা মূলত দু'রকম। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হলো, মন্ত্র, তাগা-তাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ইত্যাদি। মোটের উপর 'অথর্ববেদ'-এ যে-

চিকিৎসার নির্দেশ। কিন্তু 'চরক-সংহিতা'য় এ-জাতীয় চিকিৎসা-কৌশলের গণ্ডী ছেড়ে "যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজে"র দিকে অগ্রসর হবার আয়োজন। তার লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে, "আহার-ঔষধ-দ্রব্যাণাং যোজনা"। অর্থাৎ, আহার ঔষধ হিসেবে দ্রব্যের ব্যবহার। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বিচারমূলকভাবে দেখিয়েছেন যে 'অথর্ববেদ'-এ ওষধি হিসাবে নানা শিকড়বাকড়ের উল্লেখ থাকলেও তা তাগা-তাবিজ হিসেবে ধারণ করারই নির্দেশ। পক্ষান্তরে, 'চরক-সংহিতা'য় আহার বা ঔষধ হিসেবে সেবনাদির যে-নির্দেশ তার তালিকায় ১৬৫ রকম জীবজন্তুর রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, দুধ, মূত্র ইত্যাদি ছাড়াও প্রায় ৯১০ রকম গাছ-গাছড়ার ছাল-মূল-ফল প্রভৃতির ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে। আহার বা ঔষধ হিসেবে সেবনীয় দ্রব্যর এই বিশাল তালিকা থেকে ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিরাময়-উদ্দেশ্যে গোমাংস জাতীয় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে এবিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার সুযোগ না-থাকলেও অন্তত এটুকু মন্তব্য অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রুতি-স্মৃতির কড়া পাহারাদারি এমনভাবে অবজ্ঞা করার নিদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর কোথাও খোঁজবার চেষ্টা বোধহয় নিষ্ফল হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত ভূতবাদ বা এমনকি ভূতচৈতন্যবাদ। এ-বিষয়ে পাছে কোনো সন্দেহ থাকে যেন তা দূর করার উদ্দেশ্যেই 'চরক-সংহিতা'য় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হয়েছে: "সর্বং দ্রব্যং পাঞ্চভৌতিকম্ অস্মিন্ অর্থে; তৎ চেতনাবৎ, অচেতনং চ" (১।২৬।১০)—এই শাস্ত্রে (অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-এ) সব দ্রব্যই পঞ্চভূতে গড়া; তার মধ্যে কোনোটা চেতনাযুক্ত, কোনোটা বা অচেতন। কিন্তু চৈতন্য-যুক্ত দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? উত্তরে বলা হয়েছে, "সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যম্; নিরিন্দ্রিয়ম্ অচেতনম্" (১।১।৪৮)—ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্রব্যই চেতন; অচেতন বলতে ইন্দ্রিয়হীন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে: ইন্দ্রিয়র উপাদান বলতে আসলে কী? এ-বিষয়ে 'চরক-সংহিতা'য় বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়-গুলিও ভূতবস্তু দিয়ে গড়া। অতএব চেতনপদার্থর নজির থেকেও ভূত-অতিরিক্ত কোনো কিছুর প্রমাণ হয় না। এই মতকে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ বলতে আপনার দ্বিধা থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত সমগোত্রীয় মত বলে অস্বীকার করায় নেহাতই গায়ের জোরের ব্যাপার হবে। আয়ুর্বেদের আকরগ্রন্থ যে

ভূতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এ-বিষয়ে আরো অনেক নজির উদ্ধৃত করা যায়; গ্রন্থান্তরে তা করেছি। এখানে মাত্র আর একটা নজির দেখাবার প্রলোভন হয়। 'সুশ্রুত-সংহিতা' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সংকলনটির রচনাকালে বেদান্ত প্রভৃতি নানা দার্শনিক মত প্রচলিত হয়েছিলো। দার্শনিক গ্রন্থ নয় বলেই এজাতীয় মতের মধ্যে কোন্‌টি দার্শনিক বিচারের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য— এ-প্রশ্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা-বহির্ভূত। তবু একটা প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক মতের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সীমিত উদ্দেশ্যর দিক থেকে কোন্ মতটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয়? 'সুশ্রুত-সংহিতা'র এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর: দার্শনিক বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে যে-মতের মূল্য-যাই-হোক-না-কেন, অন্তত চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতাদর্শগত দাবির দিক থেকে বস্তুবাদই অপরিহার্য: "ভূতেভ্যঃ হি পরং যস্মাৎ নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে" (সুশ্রুত ৩৷১৷১৭): যে-মতে ভূতবস্তুই পরম সত্য তা ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে আর কোনো চিন্তার অবকাশ নেই।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের আলোচনায় এবার প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদের কথা। আয়ুর্বেদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর পদেপদেই নির্ভরতা। রোগীর প্রকৃত রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে কোন দ্রব্য কীভাবে ব্যবহার করলে মানবদেহে আরোগ্যাদি বিষয়ে কী প্রভাব দেখা যায়—'চরক-সংহিতা'র দাবি অনুসারে তা সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত পরিদর্শনের করে তবেই কোনো নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। এ-বিষয়ে দীর্ঘ মন্তব্য ব্যাখ্যা করে উপসংহার হিসেবে উক্ত হয়েছে: "সম্যক্ উপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামঃ চ ইতি"—আমরা সম্যক্‌ভাবে পরিদর্শন করবো এবং তারই নির্ভরে সম্যক্ উপদেশ দেবো (৩৷৩৷৩৬)। অন্যত্র উক্ত হয়েছে, অন্নই হচ্ছে প্রাণীদের প্রাণ, "প্রাণঃ প্রাণভৃতম্ অন্নম্" এবং এ-বিষয়ে চরম প্রমাণ হলো "প্রত্যক্ষফল-দর্শনাৎ", কেননা এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ-ফল দেখা যায় (১৷২৭৷৩)। প্রত্যক্ষফল দর্শনের উপর আয়ুর্বেদে গুরুত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্যে সুশ্রুতের মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি: হাজার যুক্তিতর্কের বিচার করেও প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট কোনো বিষয় অস্বীকার করবার উপায় নেই; যেমন অম্বষ্ঠজাতীয় ফল থেকে চোখে দেখা যায় যে আমাশয় প্রভৃতি রোগে মলরোধ হয়—কিন্তু সহস্র যুক্তি প্রদর্শন করেও এই ফলকে বিরেচক বলা অসম্ভব:

প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-ফলাঃ প্রসিদ্ধাঃ চ স্বভাবতঃ।
ন ওষধীঃ হেতুভিঃ বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন।
সহস্রেন অপি হেতূনাং ন অম্বষ্টাদিঃ বিরেচয়েৎ ॥ (সুশ্রুত ১।৪০।১২-৩)

আরো দেখেছি, 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় প্রত্যক্ষ-পরায়ণতার একটা নজির প্রায় দুঃসাহসের কোঠায় পৌঁছেছে। শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা অবশ্যই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত। কিন্তু শুধু তার উপর নির্ভর করেই শল্যবিদ্যা বা *Surgery* লেখা যায় না। তার জন্যে লাস কাটায় হাত পাকানোও দরকার। কেননা শুধুমাত্র শব-ব্যবচ্ছেদ করেই প্রত্যক্ষভাবে বা স্বচক্ষে দেখা যায়, বইতে যা লেখা আছে তার সঙ্গে নিজে হাতে লাস কেটে স্বচক্ষে দেখে মিলিয়ে নিতে হবে। শল্যবিদ্ বা *Surgeon* হবার এটা অনিবার্য শর্ত। এ-ছাড়া জ্ঞান নিঃসংশয় হবে কী করে ?

তস্মাৎ নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যঃ অঙ্গ-বিনিশ্চয়ঃ ॥
প্রত্যক্ষতঃ হি যৎ দৃষ্টং শাস্ত্র-দৃষ্টং চ যৎ ভবেৎ।
সমাসতঃ তৎ উভয়ং ভূয়ঃ জ্ঞান-বিবর্ধনম্ ॥ (৩।৫।৫৯-৬০)

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। পৃথিবীর ইতিহাসেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খাতিরে নিজে হাতে লাস কাটা বলে ব্যাপারটার বিরুদ্ধে অনেক বাধা ছিলো। সংস্কারে আটকায়। বিশেষত ধর্মসংস্কারে। য়ুরোপে এই ধর্মসংস্কার কাটাতে কতোটা সংগ্রাম করতে হয়েছে তা নিয়ে অন্যেরা আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনা বিশেষ করে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে। তাই মনে রাখা দরকার, প্রত্যক্ষজ্ঞানের খাতিরে এ-হেন একটা নির্দেশ দেওয়া অসামান্য বুকের পাটার পরিচায়ক। ধর্মশাস্ত্রের শাসন অনুসারে লাস ছুঁলেও চান করতে হয়। এমনকি যে-গ্রাম দিয়ে শববহন করা হয় সেই গ্রামকে গ্রামই সাময়িকভাবে অপবিত্র হয়। পবিত্রতা কীভাবে ফেরাতে হবে তারও বিধান আছে। কতো শতাব্দী ধরে এ-হেন সংস্কার দেশে বদ্ধমূল হয়েছে তারও হিসেব জানা নেই। কিন্তু সংস্কারের শেকড়টা কতো দূর গভীরে পৌঁছেছিলো তার একটা নমুনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ খোলার পর শিক্ষার্থীদের শবব্যবচ্ছেদ শেখাবার দরকার স্বভাবতই

অনুভূত হয়। কিন্তু শাস্ত্রর শাসন অগ্রাহ্য করে লাসকাটা ঘরে হিন্দু ছাত্রদের নিয়ে যাওয়াই যেন অসম্ভব ব্যাপার। মধুসূদন গুপ্ত বলে জনৈক ছাত্রকে রাজি করানো গেলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সাহস টি*কবে? নাকি, শেষ মুহূর্তে পিছু হটবে? এনিয়ে তখনো অনেক অনিশ্চয়তা। দুশ্চিন্তায় সারারাত ডেভিড্ হেয়ার-এর (David Hare) চোখে ঘুম নেই! এবং সাহসকে ঠেকো দেবার জন্যে সেদিন কেল্লা থেকে তোপ দাগতে হয়েছিলো। এই তো যেন সেদিনের কথা। ১৮৩৬ সালের কথা। অবশ্য শুনেছি, এখনো আমাদের নামকরা হাসপাতালে লাস ঘরের জন্যে কিছু ডোম নিযুক্ত। লাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার মতো অমন অপবিত্র কাজের জন্যে সমাজের সবচেয়ে নীচু স্তরের মানুষ ছাড়া চলবে কী করে?

এদিক থেকে কিন্তু 'সুশ্রুত-সংহিতা' রীতিমতো বেপরোয়া। শাস্ত্রকারদের প্রচণ্ড চোখ-রাঙানির পরোয়া করেনি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খাতিরে নিজের হাতে লাস কাটা অভ্যাস করতেই হবে। কেন? নিছক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের খাতিরে। তাহলে প্রত্যক্ষর উপর পরম গুরুত্ব দিয়ে ধর্মসংস্কারের দিক থেকে মহাপাতকের পরিচয় দিলেও প্রাচীন কালের চার্বাক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সদরদোর খোলবার জন্যেই করাঘাত করেছিলেন, যদিও এই নিয়ে চার্বাকদের বিরুদ্ধে শিস্তি-খেউড়ের যেন অবধি নেই।

কিন্তু স্বভাববাদ? গ্রন্থান্তরে দেখাবার চেষ্টা করেছি, 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা' থেকে স্বভাববাদের সমর্থনে অনেক উক্তিই উদ্ধৃত করা যায়। যেমন, আয়ুর্বেদ-মতে খাদ্যবিশেষ গুরুপাক বা লঘুপাক। কিন্তু কেন? 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় বলা হয়েছে, এই প্রশ্নের শুধু একটাই জবাব আছে। স্বভাব। "গুরু-লাঘব-চিন্তা ইয়ং স্বভাবং ন অতিবর্ত্ততে" (১।৪৬।৪৪৮)। দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর তর্জমায়: "গুরুত্ব ও লঘুত্ব স্বভাবকে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, অজ্বাল ও জঙ্গল পশুর মাংস কেন লঘু? —তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বভাব।" 'চরক-সংহিতা'-তেও জল, লবণ, প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বিশিষ্ট গুণাগুণের কারণ হিসেবে "স্বভাব"-ই উল্লিখিত হয়েছে (যথা: ১।২৭।৪)। উভয় সংহিতা থেকেই এ-জাতীয় অজস্র নিদর্শন উদ্ধৃত করা যায়।

কিন্তু এখানে তার বদলে অন্য একটি নজির উদ্ধৃত করলো। নজিরটি

বিশেষ চিত্তাকর্ষক। 'চরক-সংহিতা'র শুরুতেই আয়ুর্বেদের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটা উপাখ্যান আছে ; অনুমান হয়, কালক্রমে উপাখ্যানটির সঙ্গে কিছুটা পৌরাণিক কাহিনী যুক্ত হয়েছে। কেননা, তার সারাংশ এই যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উৎসাহী প্রাজ্ঞদের প্রতিনিধি হিসাবে জনৈক ভরদ্বাজকে স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় পাঠানো হলো। ইন্দ্রের কাছ থেকে ভরদ্বাজ আয়ুর্বেদ শিখে এলেন এবং মর্ত্যে তার প্রচার ব্যবস্থা করলেন। এই উপাখ্যানে ইন্দ্রের কথাটা যে প্রক্ষিপ্ত তা নিয়ে আশা করি কেউ তর্ক তুলবেন না, কেননা দেবরাজ হলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশারদ হিসেবে ইন্দ্রের কোনোই প্রসিদ্ধি নেই। কিন্তু ইন্দ্রকে বাদ দিলে বাকি থাকেন ভরদ্বাজ। অবশ্যই আয়ুর্বেদের আদি গুরু হিসেবে ভরদ্বাজ নামের ব্যক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের কোনো ঐতিহাসিক জ্ঞান নেই এবং কোনো-কালে তা পাবার সম্ভাবনাও নেই। বরং অনুমানের সুযোগ আছে যে পরবর্তী-কালে 'চরক-সংহিতা'-তেই তাঁর কথা চেপে যাবার একরকম চেষ্টা হয়েছিলো। তার কারণটা এখানে সংক্ষেপে বলে রাখা যায়। বিজ্ঞানের চাহিদা মেটাবার তাগিদে যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ নানাভাবে শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছিলো বলেই প্রাচীনকাল (এমনকি 'যজুর্বেদ'-এর যুগ) থেকেই শাস্ত্র-কারেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদ্‌গার করেছিলেন ; ফলে পরের যুগে সমাজে কোনোমতে স্বীকৃতি লাভের আশায় অনেকে অনেকভাবে 'চরক-সংহিতা'য় বহু অবান্তর আস্তিকমত প্রক্ষেপের প্রয়াস করেন এবং আয়ুর্বেদের অনেক মূল বক্তব্য কমবেশি শুধরে নিতে চান। এ-জাতীয় তাগিদের ফলেই ভরদ্বাজের কথা সাধ্যমতো চেপে যাবার চেষ্টা হয়েছিলো কিনা—এ-বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ অবশ্যই আছে; কেননা 'চরক-সংহিতা'র অধুনালভ্য সংস্করণের নানা সাক্ষ্য থেকে অবশ্যই বোঝা যায় ভরদ্বাজের স্বীয় বক্তব্য কট্টর নাস্তিকের মতোই ছিলো। তারই একটা নিদর্শন বলতে আপোসহীন স্বভাববাদ।

'চরক-সংহিতা'য় নানান বিতর্কসভার—বা আজকাল যাকে বলে সেমিনার (*Seminar*)—বর্ণনা আছে। তাতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এ-হেন একটা সেমিনারে স্বীয় মত হিসেবে ভরদ্বাজ বলছেন :

ভাবহেতুঃ স্বভবাস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ।
খর-দ্রব-চল-উষ্ণত্বং তেজঃ-অন্তানাং যথা এব হি॥ (১।২৫।২১)

—স্বভাবই ব্যাধি এবং পুরুষের একমাত্র কারণ; যেমন [পৃথিবী থেকে শুরু করে] তেজ পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের গুণ বলতে খর, দ্রব, চল, উষ্ণতা পর্যন্ত সব কিছুরই কারণ বলতে স্বভাব।

পরে অবশ্য 'চরক-সংহিতা'রই একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে শাস্ত্রশাসনের প্রবক্তা-দের তুষ্ট করবার আশায় ভরদ্বাজকে আস্তিক পথে আনবার দীর্ঘ প্রয়াস করা হয়েছে; কিন্তু সেই নজির থেকেই প্রমাণ হয় যে আয়ুর্বেদের এই আদি প্রবক্তাটির নিজস্ব মত বলতে ঘোর নাস্তিকতাই। তারই নমুনা এই স্বভাববাদ। কিন্তু দার্শনিক সাহিত্যে স্বভাববাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা বলতে বস্তুবাদী চার্বাকই। এদিক থেকেও তাই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবাদের আত্মীয়তা স্বীকার করার সুযোগ থাকে।

বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আর একটি দাবি উল্লেখ করেছি: বাস্তব কর্ম-জীবনে একটা কথা খাটে কিনা তা থেকেই প্রমাণ হবে কথাটা সত্যি কিনা। সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের আসল মাপকাঠি বলতে প্রয়োগক্ষেত্রে সাফল্য। 'চরক-সংহিতা'য় প্রায় আগাগোড়া যে এই কথা স্বীকৃত তা নিয়ে বিস্তৃত বিচারের বোধহয় দরকার নেই। নেহাত নমুনা হিসেবে শুধু একটা উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হবে। ডাক্তার ভালো কি মন্দ—কিংবা কতোটা ভালো—তার আলোচনায় বলা হয়েছে:

> স চ এব ভিষজাং শ্রেষ্ঠঃ রোগেভ্যঃ যঃ প্রমোচয়েৎ ॥
> সম্যক্-প্রয়োগং সর্বেষাং সিদ্ধিঃ আখ্যাতি কর্মণাম্।
> সিদ্ধিঃ আখ্যাতি সর্বৈঃ চ গুণৈঃ যুক্তং ভিষকৃতমম্॥ (১।১।১৩৪-৫)।

কথাটা সহজ। বিশদ ব্যাখ্যার দরকার নেই। রোগ বাস্তবিকই সারাতে পারলেন কিনা তা থেকেই বোঝা যাবে ডাক্তার আর তার ডাক্তারি কোন্ দরের। সোজা কথায়, কর্মজীবনে সাফল্য থেকেই বোঝা যায়, কোন্ কথার কতো দৌড়।

তাহলে চার্বাকের প্রতি তাচ্ছিল্য যতো চালুই হোক-না-কেন, মতটা সত্যিই তুচ্ছ নয়। দীর্ঘদিন ধরে তার একটা বিকৃত রূপ প্রচারের চেষ্টা সত্ত্বেও চার্বাকের

মূল দাবিগুলিই প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তির উপাদান। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিশ্রুতি আয়ুর্বেদের আদি রূপটিতে—যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজে। তারই কিছু নমুনা থেকে চার্বাকের বিশিষ্ট দাবিগুলিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা না-তুলে উপায় নেই। চার্বাকের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষের প্রধান কারণ, শাস্ত্রর শাসন একেবারে মিশমার করবার আয়োজন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রধানতম ভিত্তি আত্মা, পরকাল, কর্মফল এবং এই প্রসঙ্গেই শ্রাদ্ধাদি রকমারি ক্রিয়াকর্ম। চার্বাকমতে এ সবই ভণ্ড-ধূর্ত চোরদের আবিষ্কার। উদ্দেশ্য: এই সব রকমারি মিথ্যে কথা দিয়ে সাধারণের মনে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি এবং সে-বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারলে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়। যারা এ-ধরণের কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে ধর্ম শাস্ত্রকারদের আক্রোশটা বোঝা কঠিন নয়। অবশ্য এসব কথা বলতে গেলে বেশ কিছু দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করাও দরকার। চার্বাক পক্ষ থেকে সে-প্রয়াসও হয়েছিলো।

কিন্তু সেই মতেরই সারাংশ মানলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের—যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজের অবস্থাটা কী হবে? মোটের উপর একই রকম হওয়ার কথা। এবং তা হয়েছিলোও। গ্রন্থান্তরে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস করেছি: 'যজুর্বেদ' থেকে শুরু করে মনুস্মৃতির টীকাভাষ্যকার কুল্লূকভট্ট ও মেধাতিথির রচনায় চিকিৎসক ও শল্যবিদদের বিরুদ্ধে অজস্র বিষোদ্গার! চার্বাকদর্শনের মতো আয়ুর্বেদে অবশ্যই শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো জেহাদ নেই; দরকারও ছিলো না। কিন্তু যে-মূল দার্শনিক তত্ত্ব মানলে শাস্ত্রশাসনকে অবজ্ঞা না-করে উপায় নেই তারই উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই অন্তত পরোক্ষভাবে শাস্ত্র-শাসন উপেক্ষিত হতে বাধ্য। আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে ধর্মশাসকদের কটূক্তির অন্তত একটা বড়ো কারণ এইদিক থেকে অনুমানের সুযোগ থাকে।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করতে প্রলোভন হয়। আধুনিক বিদ্বানদের বিচারে ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে বর্ণাশ্রম সমাজের নজির নেই। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা শল্যবিদ্যার বিরুদ্ধেও নয়। পক্ষান্তরে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলে অশ্বিদ্বয় বা নাসত্যদ্বয়ের প্রশংসায় 'ঋগ্বেদ' মুখর। কিন্তু 'যজুর্বেদ'-এর যুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই

সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি ঘৃণাও। ফলে, পৃথিবীর ইতিহাসে যা আর কোথাও চোখে পড়ে না, এমনকি প্রাচীন অশ্বিদ্বয় দেবতা হলেও তাদের জাত গেলো! অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গে 'যজুর্বেদ'-এ ঘোষিত হলো: "অপূতৌ বা ইমৌ"—দেবতা দুটি অপবিত্র। কিন্তু হঠাৎ অপবিত্র হয়ে গেলো কেন? যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে: "মনুষ্যচরৌ ভিষজৌ ইতি"। ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) তর্জমা করেছেন: the practice entails promiscuous, unaristocratic mingling with men। সোজা কথায়, চিকিৎসা-প্রসঙ্গে দেবদ্বয় ইতরজনের সঙ্গে বড়ো বেশি মাখামাখি করেছে!

আবার সেই সাধারণ লোক বা ইতরজনের কথায় ফিরে আসতে হলো। তাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই চার্বাকমত লোকায়ত নামেও প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রকারদের চোখে এদের সঙ্গে মেশামেশিটা বড়ো ভালো ব্যাপার নয়; তার ফলে এমনকি প্রসিদ্ধ দেবতাদেরও জাত যাবার ভয়। এ-হেন শাস্ত্রশাসনের ভয়েই কি ইতর জনগণের সহজাত ধ্যান ধারণার পরিচায়ক বলেই কি লোকায়ত দর্শনের বিরুদ্ধেও এতো বিষোদ্গার? কথাটা মানতে গেলে আরো স্বীকার করতে হবে যে সাধারণভাবে দার্শনিক মহলেও শাস্ত্রশাসনের আতঙ্কটা বড়ো কম ছিলো না। কিন্তু তাহলে সংকীর্ণ অর্থে দর্শন ছেড়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দর্শন ও রাজনীতি

১॥ প্রাথমিক কথা

ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস মেরিমাতার গর্ভধারণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, তাঁদের সঙ্গে হাজার তর্ক তুলেও লাভ নেই। বিশ্বাসটা তাঁদের কাছে এমনই পবিত্র যে তার দেবালয়ে তর্কাতর্কির মতো ম্লেচ্ছ ব্যাপারের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাঁরা মায়াবাদের মতো চরম ভাববাদকে বিশুদ্ধির তুল্য মর্যাদা দিয়ে যুক্তিতর্কের নিষেধ ঘোষণা করেছেন, তাঁদের কথায় ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য কান দেননি; দিলে ভারতীয় দর্শনের পুরো ঐতিহ্যটাই বরবাদ হয়ে যেতো। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে দার্শনিক বিতর্কের ঝড় বয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য আছে।

তবুও সাধারণভাবে দর্শনের বিশুদ্ধি নিয়ে একটা কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত। অনেকেই মনে করেন, দর্শন বলতে নির্মল সত্যের সন্ধান। তার সঙ্গে সমাজ-নীতি বা রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য সম্প্রতিকালে এ-জাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের অনুগামীরা দাবি করেন, অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতির সঙ্গে দর্শনেরও একটা নাড়ির বন্ধন মানতে হবে। কিন্তু এ-হেন দাবির বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান বা প্রোপাগাণ্ডা কম নয়: এঁরা তো মূলতই উগ্রপন্থী রাজনীতিবাজ; দর্শনের ব্যাপারেও এঁরা যদি নাক গলাতে চান তাহলে বিচলিত হবার কারণ নেই। প্রোপাগাণ্ডার খাতিরে ওঁরা তো কতো কথাই না বলে থাকেন! সংগ্রাম আর সংগ্রাম! শ্রেণীসংগ্রাম, মতাদর্শের সংগ্রাম, কতো কী!

প্রোপাগাণ্ডা শব্দটা অবশ্য ভালো নয়। গালাগালির মতো, যদিও হয়তো কিছুটা মার্জিত ভাষার প্রলেপ মাখানো। কিন্তু তা যাই হোক-না-কেন, শব্দটা আপাতত না-হয় স্বীকারই করে নেবো। প্রোপাগাণ্ডা আছে। তবু প্রশ্ন ওঠে: কার বা কাদের তরফে প্রোপাগাণ্ডা? রাজনীতিবাজ বলে যাঁরা অভিযুক্ত? না, তাঁদের বিপক্ষদলের? অনেকেরই বক্তব্য, ওই বিপক্ষদলের। আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আপত্তি উঠবে: ছোটো মুখে বড়ো কথা! বর্তমান লেখক তো সত্যিই তেমন কেউকেটা নয়! মানলাম। আর তাই এমন একজনের উক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করতে চাই যাঁকে অবজ্ঞা করা অন্তত আমাদের দেশে অতিবড়ো কেউকেটার পক্ষেও সোজা কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির ও সমাজনীতির অন্তত অনেক সময় যোগাযোগটা যে অত্যন্ত প্রকট এই কথাটা একবার তাঁর চোখের সামনে একেবারে জলজ্বলে হয়ে ভেসে উঠেছিলো।

২॥ রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা

১৯৩২-এর কথা। বিমানভ্রমণ তখন আজকের মতো নেহাত আখছার ব্যাপার হয়নি। তখনকার পারস্য—বা আজকের ইরান—থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এলো। ঠিক হলো, বিমানপথে যাওয়াই সুবিধার হবে। কবির জীবনে এই হলো বিমানভ্রমণের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা; এর আগে মাত্র লণ্ডন থেকে প্যারিসে যাবার সামান্য একটু আকাশ।

পারস্যের পথে বোগদাদে বিমানপোত কিছুটা বিশ্রামের জন্যে নামলো। "বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে"···

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার দিক থেকে পুরো ব্যাপারটাই যেন অসম্ভবের কোঠায় পৌঁছোবার মতো। মানুষের পক্ষে মানুষের বিরুদ্ধে এ-রকম হত্যার

আয়োজন কী করে সম্ভব হতে পারে! বোঝবার চেষ্টা করলেন। মনে হলো, নিজের নতুন বিমান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি থেকে বোঝবার হয়তো কিনারা করা যায়। মাটির পৃথিবী ছেড়ে মানুষ যতোই উর্ধ্বলোকে উঠে যায় মাটির পৃথিবীর মানুষগুলোর কথা ততোই মুছে যায় চেতনা থেকে। এখন আর বড়ো রকমের খুনখারাপিটার হুঁশ থাকে না! কিন্তু এমনতরো ব্যাপার শুধু বিমান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দার্শনিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রেও মোটের উপর একই ব্যাপার। দার্শনিকের কৌশলেও মানুষকে মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে এমন এক মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়া যায় যেখান থেকে মোটের উপর একইভাবে রাজনীতির চাহিদা মেটানো সম্ভব, সম্ভব নির্বিচারে নরহত্যা। দার্শনিক চিন্তা-চেতনা তাই সবসময় নির্বিকার সত্যান্বেষণ নয়; বরং অনেক সময় রাজনীতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ :

"বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই **ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ** হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। **নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এলো ক্ষীণ হয়ে,** যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব তা হয়ে এল দুই আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। **সেই বিলয়ের ভূমিকায় দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে।** মনে হল, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেননা, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। **যে বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে।** গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও **এই রকমের উড়ো জাহাজ—অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর।** বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক **উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে,**

সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।"

('পারস্যে')

উপরের উদ্ধৃতিতে কিছু মোটা হরফ ব্যবহার করেছি। রবীন্দ্রনাথের লেখায় না থাকলেও আমাদের উৎসাহে করেছি। কথাগুলোর উপর জোর দেবার উৎসাহেই করেছি। মনে হয়েছে তার দরকার ছিলো। পাঠকদের নজর বিশেষভাবে আকর্ষণ করার দরকার। উৎসাহী পাঠক হয়তো একাধিকবার পড়তে পারেন।

৩॥ বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ

একথা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ যে আমার-আপনার মতো কারুর পক্ষেই কথাগুলো এমনভাবে বলবার ক্ষমতা কল্পনাতীত। কিন্তু একথা বলার বোধহয় দরকার আছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বলেই কথাগুলো সহজে উড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও মূঢ়তা হবে। একই কারণে, এই প্রসঙ্গে অনেক কিছু ভাববারও আছে, বোঝবারও আছে।

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের দর্শন প্রসঙ্গে সম্প্রতিকালে নানা বিদ্বান নানা আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে কোনো এক সুসংহত সার্বিক দার্শনিক দৃষ্টির বর্ণনা দিতে চান তাঁদের দুঃসাহস অন্তত আমাকে অবাক করে। সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতিতে তাঁর চিন্তা-চেতনা অনড়-অচল হয়ে থাকেনি; রবীন্দ্রদর্শন বলে অবিচল কিছুর সন্ধানে মুগ্ধ হবার কারণ নেই। কথাটা এই কারণে বলছি যে সুবিশাল রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে উপরোক্ত কথার বিপরীত খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। হয়তো নিজেই তার অল্প-বিস্তর তালিকা তৈরি করতে পারি; তবে অসামান্য শ্রম ও বিদ্যার সাক্ষ্য নিয়ে পম্পা মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' তো হাতের নাগালেই রয়েছে।

অব্যবস্থিতচিত্ত বলে গাল পাড়ার সাহস থাকে তো পাড়ুন; প্রাণ-পরিবর্তনের ছন্দে বাঁধা বলে উচ্ছ্বাস করতে চান তো করুন। বর্তমান উদ্দেশ্য এ-জাতীয় কোনো মূল্যায়নের প্রয়াস নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তির সঙ্গে আলোচ্য

উক্তির সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা না-তুলে উদ্ধৃত উক্তিটিরই তাৎপর্য বিচারের চেষ্টা করবো। দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির যে একটা সম্পর্ক আছে—তারই নিদর্শন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন বিদ্যা-বহুল বহু বৃহদাকার গ্রন্থেও তার তুলনা খোঁজা নিষ্ফল। কিন্তু বিষয়টি বোঝবার জন্যে ধাপে ধাপে এগুতে হবে।

মাটির পৃথিবীর প্রতি সহজাত টান। কথাটা নানা দার্শনিকের মুখে শোভা না-পেলেও বস্তুবাদীর মুখে নিশ্চয়ই শোভা পায়। তার মানে, রবীন্দ্রনাথকে বস্তুবাদী বলে ঘোষণা করার দরকার নেই। তবুও কথাটা বস্তুবাদসম্মত, বস্তুবাদ শব্দটার প্রতি বিশেষ করে রবীন্দ্রভক্তদের মনোভাব যাই হোক না কেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দার্শনিকদের অনেকের কাছেও কথাটা রুচিকর নয়। কিন্তু অন্তত চার্বাকের মুখে অনায়াসেই মানিয়ে যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য-নির্ভর এই পৃথিবীর চেতনা অক্ষুণ্ণ থাকলে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথাটাও ভোলা যায় না। একথাও চার্বাকের মুখেই শোভা পায়; চার্বাকও বলেন মাটির পৃথিবী এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তুচ্ছ করে লোকোত্তরের কল্পনা দিয়ে ধর্মান্ধ মুগ্ধ মানুষকে বঞ্চনা করার আয়োজন। তাই প্রচলিত রবীন্দ্রভক্তদের সংস্কারে যতোই বাধুক-না-কেন, তাঁর আলোচ্য উক্তির প্রথমাংশ যে চার্বাক-সম্মত বা অন্তত তারই খুব কাছাকাছি চিন্তার পরিচয়—এমনতরো কথা উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

কিন্তু চিন্তা চেতনা থেকে এই মাটির পৃথিবী আর সে-পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কথা মুছে ফেলার কায়দাও আছে। মাটির স্পর্শ ছেড়ে যতো মহাশূন্যে ওঠা যায়, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়র সাক্ষ্য-নির্ভর মাটির পৃথিবীও চেতনা থেকে ততোই বিলীন হয়ে যায়। উড়ো জাহাজে ওড়বার অভিজ্ঞতায় তো তা প্রকট। কিন্তু অমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়াও আর একরকম কায়দা আছে; সাধারণের চোখে না পড়লেও ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। মতাদর্শগত ব্যবস্থা, বা আরো ছোটো করে বললে বলা যায় দার্শনিক কায়দা। সে-কায়দায় মাটির পৃথিবী এবং তার রক্তমাংসে গড়া মানুষগুলোর কথাও চেতনা থেকে মুছে ফেলা যায়। বিশুদ্ধ চেতনা ছাড়া তখন আর কিছু বাকি থাকে না। ওই বিশুদ্ধ চেতনাই তখন পরম সত্যের একমাত্র দাবিদার হয়ে দাঁড়ায়। দার্শনিকদের পরিভাষায়, একেই বলে চরম ভাববাদ।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা অবশ্য দার্শনিকদের পরিচিত পরিভাষায় বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথাটা একই। প্রমাণ, দার্শনিক সাহিত্য থেকেই তাঁর উদ্ধৃতি : "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। উদ্ধৃতিটার উদ্দেশ্য অবশ্যই তারিফ নয়। ঘৃণা বলুন, শ্লেষ বলুন, বা আরো অন্য কোনো বর্ণনা দেবার উৎসাহ থাকে তো তাই-ই দিন। কিন্তু দার্শনিক মতটিকে দার্শনিক পরিভাষায় চরম ভাববাদ ছাড়া আর কোনো আখ্যা দেওয়া যাবে না। এবং এই মত—বা এজাতীয় মতের রাজনৈতিক উপযোগিতার দিকেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। মতটার পক্ষে এমনই প্রোপাগাণ্ডা যে সাধারণের মনে তা ভয়-ভক্তির উদ্রেক করে। তবুও তারই পিছনে যে বীভৎস রাজনৈতিক উৎসাহ তাই-ই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তাহলে দর্শনে প্রচলিত পরিভাষায় মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ। বাঁচবার পথ আর মরবার পথ। মার্কসবাদে যাঁদের আস্থা তাঁরও মূলত একই কথা বলেন। তবে অন্য পরিভাষায়, অন্য ভাবে। কিন্তু মোদ্দা কথাটাকে নিছক রাজনীতিবাজদের কারসাজি বলে গাল পাড়তে চাইলে রবীন্দ্রনাথ অন্তত যখন উদ্ধৃত মন্তব্যটি করছেন তখন তাঁকেও একই দলে ফেলতে হবে। যাঁর সে-সাহস আছে, তিনি ফেলুন। কিন্তু আমার সাহসে কুলোবে না। আশা করি অনেক পাঠকের সাহসেও নয়।

৪॥ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম : চরম ভাববাদ

উদ্ধৃতিটি নিয়ে অনেক কথাই ভাববার আছে। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। হত্যা করলেও তাকে সত্যি হত্যা করা হয় না। কাকে? পরমাত্মাকে। কেননা, পরমাত্মা অজর অমর শাশ্বত সত্য। তার জন্ম নেই। মৃত্যু নেই। তাই-ই পরব্রহ্ম। পারমার্থিক সত্য।

কোথা থেকে উদ্ধৃতি? চলতি ধারণায় 'গীতা' থেকে। কথাটা সত্যি। কিন্তু পুরো সত্যি নয়। 'গীতা'য় একথা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা কোটেশন-মাত্র। কোথা থেকে কোটেশন? 'কঠ উপনিষদ্' থেকে। আসলে 'গীতা'র ২।১৯-২০ শ্লোকদুটি 'কঠ উপনিষদ্'-এর ১।২।১৮-১৯ শ্লোকেরই পুনরুক্তি। আমাদের মতো

'উপনিষদ্'-এর অতি-সাধারণ ছাত্ররও তা চোখে পড়বার কথা। আত্মা বা পরমাত্মা প্রসঙ্গে 'কঠ উপনিষদ্'-এ বলা হয়েছে :

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮
হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তুং হতঃ চেৎ মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ ন অয়ম্ হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

—আত্মা বা পরমাত্মার জন্ম নেই ; তা শাশ্বত ও পুরাণ। তাই শরীর হত্যা করলেও তাকে হত্যা করা যায় না। খুনে যদি মনে করে সে খুন করছে, নিহত যদি মনে করে তাকে খুন করা হচ্ছে—উভয়ের পক্ষেই মনে রাখা দরকার, এই আত্মাকে খুন করাও যায় না, তার হত্যাও সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদ্-এর সাধারণ পাঠকদের কোঠায় ফেলা অবশ্যই ধৃষ্টতা হবে। কৈশোর থেকেই তিনি উপনিষদ্-এর আবহাওয়ায় মানুষ। উদ্ধৃতিটুকু তাই আসলে যে উপনিষদ্ থেকে কোটেশন-মাত্র, একথা তাঁর জানা ছিলো না বলে কল্পনা করার কোনো সুযোগ নিশ্চয়ই নেই। তাছাড়া, দার্শনিক আলোচনায় অন্তঃসংগতির কথাটাও তো রয়েছে ; "ন হন্যতে…"ইত্যাদির উপদেশকে আলাদা করে বোঝবার সুযোগ নেই ; একটা গোটা দার্শনিক মতের অঙ্গ হিসেবেই কথাটা বোঝা দরকার। সেই গোটা দর্শন বলতে ভারতীয় ইতিহাসে চরম ভাববাদ—নামান্তরে শূন্যবাদ, মায়াবাদ, পরব্রহ্মবাদ। এই দার্শনিক মতটির পক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের দেশে দার্শনিক বিতর্কের প্রবল ঝড় বয়েছিলো। তাই মতটির পর্যাপ্ত মূল্যায়ন ছোটোখাটো বইতে বৃথা চেষ্টা। এবং আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তা বহুলাংশেই অবান্তর। এখানে আমাদের আলোচনাটা দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে। কেননা, চার্বাকের বিপক্ষে সুদীর্ঘ যুগ ধরে সম্ভব-অসম্ভব রকমারি প্রোপাগাণ্ডা শুধু নির্লিপ্ত সত্যান্বেষণেরই পরিচায়ক নয়। তার একটা মস্ত বড়ো কারণ রাজনীতি। অর্থাৎ, রাজনীতির নায়কদের পক্ষে দার্শনিক সত্যাসত্য নিয়ে কতোটা মাথা-ব্যথা ছিলো তার আলোচনাও এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা এটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে চার্বাকদর্শন প্রশ্রয় পেলে রাজনীতির দিক থেকে তাঁদের সর্বনাশ। তাঁদের সমাজ-আদর্শের ভিতটাই মিশমার হয়ে যাবার ভয়। পক্ষান্তরে, আদর্শ সমাজ হিসেবে তাঁরা যে-চিত্র রচনা করেছেন তার নিরাপত্তার

জন্যে পাইক-পেয়াদা, বাহুবল-অস্ত্রবল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপকরণগুলি ছাড়াও মতাদর্শগত হাতিয়ার—বা সোজা কথায় দার্শনিক চিন্তাচেতনার—বিশেষ ভূমিকা আছে। এই কারণেই তাঁরা দর্শন প্রসঙ্গে নির্বিকার থাকেননি। তাই তাঁদের প্রবক্তা দেশের আইনকর্তারা দর্শন-বিশেষকে শ্রেয় উপাদেয় বলে ঘোষণা করেছেন, আবার দর্শন-বিশেষকে বিষবৎ পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রেয় বা উপাদেয় বলতে অবশ্যই অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ। বিষবৎ বলতে তেমনি বস্তুবাদ—বিশেষ করে চার্বাকমত। আইনের হুমকি। অতএব অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থাও। মনে রাখতে হবে, এ-জাতীয় আইনের সঙ্গে সত্যান্বেষণের সম্পর্ক নেই; সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক কার্যকারিতার বা উপযোগিতার। দেশের মানুষকে তাঁবে রাখবার পক্ষে কোন্ দার্শনিক মত সুবিধাজনক, কোন্‌টা বিপজ্জনক—তারই হিসেব।

অন্যান্য দেশের আইনকর্তারা দর্শন নিয়ে কতোটা মাথা ঘামিয়েছেন জানা নেই। তবে এটুকু কথা অনেকেরই জানা আছে যে মস্তবড়ো দার্শনিকও যখন আইনকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন তাঁর কাছে সত্য-মিথ্যার হিসেবটা গৌণ হয়ে যায়। প্লেটোর (Plato) মতো দার্শনিকও তাই সাধারণ শ্রমজীবী-দের ঠিকমতো শাসনে রাখার কৌশল হিসেবে তাঁর 'রিপাব্‌লিক' (*Republic*) গ্রন্থে "সুমঙ্গল মিথ্যা"র (*beneficial falsehood*) বা "মহান অসত্য"র (*noble lie*) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, কথাটা মিথ্যে বলে জেনেশুনেও রাজনীতির খাতিরে তা প্রচারের সুপারিশ করেছেন। এই কারণেই আইন প্রসঙ্গে রচিত তাঁর 'দি লস্' (*The Laws*) নামে শেষ ও চরম গ্রন্থে প্রাচীন মিশরের বস্তা-পচা কুসংস্কারের দিকে ফিরে তাকাবার উপদেশ দিয়েছেন: উদ্দেশ্য এই যে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক না-থাকলেও প্রোপাগাণ্ডা যথেষ্ট জোরদার হলেই সাধারণ মানুষকে অনেক কথাই গেলানো যায়। প্লেটোর সমসাময়িক রাজনীতি-বিদ্ আইসোক্রেটিস-ও (Isocrates) একই কারণে প্রাচীন মিশরের কুসংস্কারে গুণমুগ্ধ: শ্রমিক সাধারণের ঘাড়ে তার বোঝা চাপাতে পারলে ওদের মন কুঁজো হয়ে থাকবে; সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সহজে মাথা তুলতে পারবে না। রোমান রাজনীতিবিদ্ পলিবিয়াসও (Polybius) ক্রীতদাস প্রথার একটা বড়ো খুঁটি হিসেবে অন্ধ সংস্কারের গুণমুগ্ধ।

আমাদের দেশের আইনকর্তারা অবশ্য অমন সরাসরি মিথ্যে কথা বা অন্ধ

সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করেননি। কিন্তু দেশ-শাসনের ব্যাপারে দর্শনের অবাধ স্বাধীনতা তাঁদের কাছেও বিষবৎ। তবে প্রাচীন গ্রীস বা রোমের আইনকারদের সঙ্গে মূল তফাৎটা এই যে, এদেশে সংস্কারগত ধারণাকে ঠেকো দেবার প্রয়োজনে আর একটা সংস্কারগত ধারণার প্রচার। অর্থাৎ, দেশ শাসনের প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটা দার্শনিক মতই মানতে হবে এবং এই মতটাই চরম সত্যের পরিচায়ক, কেননা এটাই শাস্ত্রসংগত মত। পাছে নির্মল যুক্তি-তর্কের বিচারে মতটার বিরুদ্ধে বেয়াড়া প্রশ্ন ওঠে, এই আশংকায় আমাদের আইনকর্তারা আরো ঘোষণা করেছেন যে স্বাধীন যুক্তিতর্কের বিচারটাই অচল, অতএব নিষিদ্ধ।

আইনকারদের বিধান। তাই লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থাও।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের আইনকারদের হস্তক্ষেপের কথাটা বাদ দিলে সাধারণভাবে ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির—এবং বিশেষ করে চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রায় অন্তহীন প্রোপাগাণ্ডার—সম্যক্ বোধ সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আলোচনায় তার অভাব বলেই আমরা এ-বিষয়ে দু-চার কথা বলবো।

প্রথমত : সমাজ-আদর্শের কথা। আইনকর্তাদের বিচারে সমাজের গড়নটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত : দার্শনিক আদর্শের কথা। আলোচ্য সমাজ-আদর্শের সংরক্ষণে কোন্ মত শ্রেয়, কোন্ মত হেয়।

তৃতীয়ত : আরো একটা কথা অবশ্যই বুঝতে হবে। বক্তব্যগুলো নিছক পুঁথির পাতায় আবদ্ধ থাকলে লাভ কী? শাসন ব্যবস্থার খাতিরেই এতো কথা। তাই সাধারণ মানুষের মাথায় যে-করে-হোক ঢোকাতে হবে। কিন্তু এনিয়ে মস্তবড়ো সমস্যা আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এতোদিন পরেও—এবং রকমারি পরিকল্পনা নিয়ে খবরের কাগজে অনেককিছু প্রকাশিত হলেও—বাস্তব ঘটনা এই যে দেশে নিরক্ষর মানুষের অনুপাতটা আজো ভয়াবহ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অবস্থাটা অনুমানের চেষ্টাও নিরর্থক। তবুও, ভাবতে যতোই অবাক লাগুক না কেন, আইনকর্তাদের অভিপ্রেত দার্শনিক মতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অল্পবিস্তর পরিচয় বর্তমান। মায়া, ব্রহ্ম, অদৃষ্ট—এজাতীয় মতের ব্যাখ্যায় বড়োসড়ো বই আছে। কিন্তু সাধারণ কৃষকের মুখেও কথাগুলো শুনলে অবাক লাগে না! অতএব মানতেই হবে যে তাদের মাথায় এসব কথা

ঢোকাবার একটা কোনো ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই ছিলো। তার কথা বাদ দিলে আমাদের আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে।

প্রধানত এই কথাগুলি আলোচনা করে আমাদের উপসংহারে পৌঁছুবার চেষ্টা করবো।

৫॥ রাজনীতি : আইনকর্তাদের সমাজ-আদর্শ

আইনকর্তাদের সমাজ-আদর্শটা একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সমাজে মোটের উপর দুই শ্রেণীর মানুষ। আধুনিক পরিভাষায়, পরশ্রমজীবী এবং শ্রমজীবী, শোষক ও শোষিত। ধর্মশাস্ত্রকারদের পরিভাষায়, দ্বিজ ও শূদ্র। দ্বিজ কথাটার প্রাক্-ইতিহাস নিয়ে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মাথা ঘামান। কিন্তু আইনকারদের বক্তব্য, যাদের উপনয়নাদি ব্যবস্থা তাঁরাই দ্বিজ, বাকি সব শূদ্র। উপনয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা কাদের? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীর। বাকি সব শূদ্র। মনু বলছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীর লোক দ্বিজ; চতুর্থ শ্রেণী বলতে শূদ্র। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণী বলতে কিছু নেই।" (১০৪)

আইনকর্তারা আরো বিধান দিয়েছেন, নেহাৎ বিপদের অবস্থা ছাড়া প্রত্যক্ষ শ্রমের দায়িত্ব দ্বিজদের নয়; শুধুমাত্র শূদ্রর। তার মানেই এই যে সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ কায়িক শ্রমের দায়মুক্ত; সে দায় শুধু শূদ্রদের। অবশ্যই, সমাজে মোট লোকের তুলনায় ব্রাহ্মণাদি দ্বিজর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য। সংক্ষেপে: একদিকে সংখ্যালঘু পরশ্রমজীবী, অপর দিকে বিপুল শ্রমজীবী মানুষ—বিপুল, কেননা পুরো সমাজের খাওয়া-পরা থেকে সব রকম সুখসমৃদ্ধি বিলাস-ব্যসনের সবটা দায় তাদের শ্রমের উপর। এই শ্রমজীবী মানুষদের কর্তব্য এবং জীবনধারণের মানও আইনকারেরা বেঁধে দিয়েছেন। মনু বলছেন, শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য দ্বিজদের—বিশেষত অবশ্যই ব্রাহ্মণদের—সেবা; এছাড়া তারা আর যাই করুক না কেন সবই নিষ্ফল হবে (১০।১২৩)। কিন্তু তার জন্যেও তো বাঁচতে হবে। নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু নিছক বাঁচবার জন্যে যেটুকু দরকার তার বেশি একটুও নয়: উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন এবং শোবার জন্যে বড়ো জোর ছেঁড়া কাঁথা (১০।১২৫)। অবশ্যই তাদের পক্ষে ধন-অর্জন অসম্ভব নয়। কিন্তু মনু বলছেন, "ধন-অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধনসঞ্চয় করতে

দেওয়া চলবে না; কেননা শূদ্র ধনসঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণের বড়ো কষ্ট হয়।" (১০।১২৯)

তাহলে পারিভাষিক শব্দ পৃথক হলেও এক চরম শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের কথাই। একদিকে নিছক শ্রমজীবী, কিন্তু তাদেরই শ্রম-উৎপন্ন সামগ্রী থেকে নিছক বাঁচার খাতিরে যেটুকু দরকার তাদের নিজেদের জন্যে শুধু সেইটুকুই; বাকিটা—যাকে আমরা বলি উদ্বৃত্ত বা সারগ্রাস—তার সবটাই কায়িক-শ্রমের দায়মুক্ত সমস্ত সুখসম্ভোগের কমবেশি অধিকারীদের শ্রেণী। সভ্যতার শুরু থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত সারাটা ইতিহাস বলতে সব দেশে যে-রকম, সেই রকমই।

৬ ॥ দর্শন : ভাববাদের ভূমিকা

অবশ্য যুগের পর যুগ ধরে—সারা ইতিহাস জুড়ে—শ্রমিক-সাধারণ মুখ বুঁজে এ-হেন ব্যবস্থা যে মেনে নিয়েছে তা কল্পনা করার কারণ নেই। বিদেশের কথা আপাতত না-হয় না-ই তোলা গেলো। কিন্তু আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারেরাই শূদ্র-অভ্যুত্থানের, এমনকি শূদ্রর পক্ষে রাষ্ট্রশক্তি দখলের, সম্ভাবনা—অতএব আতংকও—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। (মনু ৪।৬১; ৮।২১-২২; ইত্যাদি)। য়ুরোপে শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত শ্রমিক-অভ্যুত্থান কেন স্থায়ী সার্থকতা লাভ করেনি, তার বাস্তব কারণ মার্কসীয় সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র। শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিক-অভ্যুত্থানের—বা ভারতীয় পরিভাষায় শূদ্র-অভ্যুত্থানের—সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কতো রকম আয়োজন। বাহুবল ও অস্ত্রবল—বা চলতি কথায় যাকে বলে পুলিসী ব্যবস্থা—তার কথা তো মামুলী। কিন্তু তাছাড়াও আরো একরকম শক্তির প্রয়োজনও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, এবং এই শক্তি নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা। মতাদর্শগত শক্তি। দার্শনিক শক্তি। অবশ্যই এমন মতাদর্শ বা দর্শন—শ্রমিক-সাধারণকে তাঁবে রাখার পক্ষে যার ভূমিকা আছে।

দার্শনিক পরিভাষায়, ভাববাদ। এবং তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধে সম্পর্কিত বিশ্বাসবাদ। ধর্মবিশ্বাস। শাস্ত্রবিশ্বাস। 'মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-

'ক্রিটিসিজম' (*Materialism and Empirio-Criticism*) গ্রন্থে ভাববাদের সঙ্গে বিশ্বাসবাদের নাড়ির সম্পর্ক বারবার লেনিন উল্লেখ করেছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারদের মন্তব্যেও ভাববাদের সঙ্গে বিশ্বাসবাদের সম্পর্ক সরাসরি স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটি থেকে আলোচনা শুরু করা সুবিধের হবে।

ভাষা-ব্যবহারে তাঁর পটুত্বের পুনরুল্লেখ অবশ্যই বাচালতার মতো শোনাবে। কিন্তু কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, প্রখ্যাত ভাববাদীদের পরিভাষার মালা গেঁথে একই কথা বলবার দরকার বোধ করলে মূল কথাটা তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন। যে-দার্শনিক তত্ত্বের উড়োজাহাজ অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে ধ্যানধারণার এমনই উর্ধ্বলোকে নিয়ে গেলো যেখানে বাস্তব পৃথিবীর সত্তা অস্পষ্ট, তার অস্তিত্বের দাবি বিলয়ের মহাশূন্যে বিলীন—ধ্যানধারণার সেই উর্ধ্বলোকই দার্শনিকদের ভাষায় ভাববাদ। সেখান থেকে মারেই বা কে, মরেই বা কে! মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দৃষ্টান্তর তালিকা বাড়ানোর সুযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা ফসল ফলায় তারাই বা কে, আর যাদের গোলায় সে-ফসল ওঠে তারাই বা কে! খুদকুঁড়ো খেয়ে যারা কোনো মতে প্রাণধারণ করে তারাই বা কে, আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে সাজানো যাদের খাবার থালা তারাই বা কে! ছেঁড়া কাঁথায় যাদের শোবার বিধান তারাই বা কে, আর পালঙ্কের দুগ্ধফেন শয্যায় যাঁরা নিশিযাপন করছেন তাঁরাই বা কে! সবই মায়া, মিথ্যা; মরীচিকায় দেখা জলের মতো, স্বপ্নে দেখা প্রাসাদের মতো, দড়িতে দেখা সাপের মতো। অজ্ঞানের ঘোর। এ-সব নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলা, পাওনা-গণ্ডার দাবি নিয়ে সোরগোল পাকানো—এসবই নেহাত বেকুবের লক্ষণ। অন্তত পরম সত্য—বা যাকে ভাববাদীরা বলেন পারমার্থিক সত্য—তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নিশ্চয়ই তাই। অথচ, পারমার্থিক সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি ছাড়া মোক্ষ অসম্ভব এবং তার মানেই ব্রহ্মজ্ঞান—বিশুদ্ধ আত্মাই চরম সত্য এই তত্ত্বটি ঠিকমতো বুঝতে পারা।

অতএব ধর্মশাস্ত্রকারেরা—অর্থাৎ আমাদের দেশের আইনকারেরা—বারবার বলছেন, তুচ্ছ মায়ার জগৎ নিয়ে মাতামাতি না করে উপনিষদে বর্ণিত পরব্রহ্মের কথাটা শ্রবণ করো, ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করো, ধ্যান করো। শুধু 'মনুস্মৃতি' থেকেই গোটা কতক নমুনা পর্যাপ্ত হবে: ৪।২৯-৩০; ৪।৪৯; ৪।৮২-

৮৪ ; ১২।৮৩ ; ১২।৮৫ ; ১২।৯১-৯৩ ; ১২।১১৮-১২৫। আরো অনেক নজির দেখানো কঠিন নয়। কিন্তু দরকার নেই। এটুকু দেখতে দেখতেই হাঁফ ধরে যাবে। কেবল মনে রাখতে হবে 'মনুস্মৃতি' যেসেতেসে বই নয় ; সাবেককালের আইনশাস্ত্রর আকরগ্রন্থ। অগ্রাহ্য করলে শাস্তির বিধানও আছে।

চার্বাক অবশ্য বলবেন, স্রেফ ধাপ্পাবাজি। রাজনীতির তাগিদে—বিশেষত শোষক শ্রেণীর চাহিদা মেটাবার জন্যে—লোকঠকানো কথা ছাড়া কিছুই নয়। এ-হেন উদ্ধত অবিশ্বাসের ফলে চার্বাকের কপালে ঠিক কতো রকম শাস্তি জুটেছিলো, তার কথা আমাদের দেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। আন্দাজ করা হয়তো অসম্ভব নয়। তবে যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে তার থেকে অন্তত অনুমানের সুযোগ থাকে যে দেশে শাসন-ব্যবস্থা যাতে নিরাপদ থাকে সেই সেই উদ্দেশ্যে চার্বাকের বা লোকায়তিকের কথার বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারিটা আইন-গ্রন্থ ছাপিয়ে মহাকাব্যের মতো জনপ্রিয় সাহিত্যেও পৌঁছেছিল। 'রামায়ণে'র অযোধ্যা-কাণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে, রামচন্দ্র যখন চিত্রকূটে অবস্থান করছেন তখন শোকসন্তপ্ত ভরত তাঁর কাছে এলেন। রামচন্দ্র তাঁকে কোলে বসিয়ে আদর-টাদর করে বিশেষত রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে নানা উপদেশ দেন। এই উপদেশ-প্রসঙ্গেই বলেন, 'হে বৎস, আশা করি তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা করছো না। ওরা অনর্থ বাধাতে ওস্তাদ, এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে আস্ফালন করলেও আসলে বালকের মতো মূর্খ। প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যুক্তিতর্কমূলক দুর্বুদ্ধির দোহাই দিয়ে অর্থহীন কথা প্রচার করে' :

কচ্চিন্ন লৌকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিম্ আন্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থকং প্রবদন্তি তে॥

(অযোধ্যা ১০০।৩৮-৯)

উপদেশটা রাজাশাসন প্রসঙ্গে বলেই রাজনীতির সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কটা সাদামাটা পাঠকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রচার মাধ্যম বা ম্যাস মিডিয়া (*mass media*) হিসেবে 'রামায়ণে'র গুরুত্বটাও মনে রাখা দরকার :

নিরক্ষর দেশবাসীও কথক ঠাকুরের মুখে 'রামায়ণ'-এর উপদেশটা শুনে উড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু প্রচারমাধ্যমের কথা একটু পরে আরো বিশদভাবে আলোচনার চেষ্টা করবো। আপাতত আর-একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। লোকায়তিকের দুর্বুদ্ধিটা আসলে কী? মহান ধর্মশাস্ত্র (বা আমাদের সাবেকী আইন-গ্রন্থ) থাকা সত্ত্বেও ওরা যুক্তিবিদ্যার বা তর্কবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কথাগুলো আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষ প্রাসঙ্গিক। যে-ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারে আইন-গ্রন্থগুলি এমন মুখর—তুচ্ছ পার্থিব বিষয় অগ্রাহ্য করে যে-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে একেবারে সরাসরি মোক্ষলাভের প্রলোভন—তার আসল খুঁটি বলতে কী বুঝতে হবে? আইনকারদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব আছে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা—শাস্ত্র বলতে অবশ্যই শুধু বেদ-উপনিষদ নামে "শ্রুতি" নয়, ধর্মশাস্ত্র বলে "স্মৃতি"-ও। সোজা কথায়, শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অন্তত আমাদের দেশের চরম ভাববাদীদের কথাটাও এই-ই। কিন্তু তারই সঙ্গে তাঁদের আরো একটু কথা আছে। এই শাস্ত্রবিশ্বাস আর যাই হোক, যুক্তিতর্কের ধোপে টেঁকে না। কিংবা, যা একই কথা, শাস্ত্রবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার যাকে বলে অহিনকুল সম্পর্ক। তাই স্বয়ং রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, মহান ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও লোকায়তিকদের এমনই দুর্মতি যে তারা যুক্তিতর্কের অবলম্বন খোঁজে।

৭॥ শাস্ত্রবিশ্বাস বনাম যুক্তিবিদ্যা

মনু বিধান দিয়েছেন, "বেদকে শ্রুতি এবং ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে মানবে। এই দুই হলো সব ধর্মের মূল। এ-নিয়ে কোনো তর্কাতর্কি চলবে না। হেতুশাস্ত্র (অর্থাৎ তর্কবিদ্যা, বা সোজা কথায় যাকে বলে লজিক) অবলম্বন করে কোনো দ্বিজ যদি শ্রুতি স্মৃতির অবমাননা করে, তাহলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে একেবারে দূর করে দেবেন। বেদনিন্দুকেরা নাস্তিক।" (২।১০-১৬)

সহজেই বোঝা যায়, আইনকর্তাটি যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চান তার প্রধান শর্ত হলো অবিচল শাস্ত্রবিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস বিঘ্নিত হবার একটা আশঙ্কাও আছে। কিসের আশঙ্কা? হেতুশাস্ত্র বা তর্ক-বিদ্যা। হেতুশাস্ত্র

আশ্রয় করতে গেলে এমনকি খোদ দ্বিজেরও রক্ষা নেই। সমাজ থেকে তাকে বের করে দিতে হবে।

আরো বিধান আছে। মনু বলেছেন, "পাষণ্ডদের, নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বনকারীদের, ভণ্ডদের, শঠদের, তার্কিকদের, দাম্ভিকদের—এদের কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করবে না।" (৪।৩০)। কিন্তু তার্কিকদের বিরুদ্ধে এমন কড়া আইন কেন? ভাষ্যকার মেধাতিথি এবং টীকাকার কুল্লূকভট্টর লেখা থেকে মনে হয়, তর্কবিদ্যার একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই নাস্তিক্যের দিকে। ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। মেধাতিথি বলছেন, "হৈতুকাঃ নাস্তিকাঃ, নাস্তি পরলোকো, নাস্তি দত্তং, নাস্তি হুতম্ ইত্যেবং স্থিতপ্রজ্ঞাঃ" —হৈতুক মানেই নাস্তিক, তাদের স্থির বিশ্বাস পরলোক, দান, হোম প্রভৃতি অর্থহীন। কুল্লূকভট্ট বলেছেন, "হৈতুকা বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ", যারা বেদ-বিরোধী তর্ক করে তারাই হেতুশাস্ত্রপরায়ণ বা তার্কিক। অবশ্য, যাঁরা বেদ মেনে তর্ক করেন বা শাস্ত্রর প্রামাণ্য আরো দৃঢ় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা করতে চান—তাঁদের বিরুদ্ধে আইনকর্তাটির তেমন আপত্তি নেই। কিন্তু আপাতত কথা হলো, শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্কের কথা, শুধু তর্কের কথা, মোহমুক্ত যুক্তিবিদ্যার কথা। এ তর্ক বড়ো সাংঘাতিক। তা আইনকর্তার আদর্শ সমাজটার ভিত টলিয়ে দিতে চায়। কেননা, একদল শুধু খেটে মরবে আর একদল তাদের খাটুনির ফল ভোগ করবে—এ-হেন সমাজ মেনে নিতে গেলে শাস্ত্রে অটল আস্থা দরকার। মনু বলেছেন, শাস্ত্রে আছে যে নিছক দাসত্ববৃত্তি করার জন্যই স্বয়ং ভগবান শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। (১।৯১; ৮।৪১৩-৪১৪)

৮ ॥ প্রচারমাধ্যম

তাহলে দ্বিজ-শূদ্রে বিভক্ত এই সমাজাদর্শের ভিত বলতে অটল শাস্ত্রবিশ্বাস। মোহমুক্ত তর্কবিদ্যার প্রবণতাই হলো সে বিশ্বাসে ফাটল ধরানো, কিন্তু, আইনকর্তাদের ভাষায় যা একই কথা, নাস্তিকতা। যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে তাই অমন হুঁশিয়ারি। এমনকি আইন জারি।

কিন্তু সমস্যা আছে। আইনকারদেরই সমস্যা। কথাগুলো কার—বা কাদের—মাথায় ঢোকানোর তাগিদ সবচেয়ে বেশি? নিশ্চয়ই এমন শ্রেণীর

লোকের মাথায় যারা নিঃসম্বল হয়েও মুখ বুঁজে খেটে মরতে রাজি হবে। কিন্তু কী করে তা ঢোকানো যায়? শিক্ষাদীক্ষার সামান্যতম সুযোগ থেকেও তো তারা বঞ্চিত। শুধু তাই নয়। ধর্মশাস্ত্রকারেরাই আর এক হাঙ্গামা বাধিয়ে রেখেছেন। কথাগুলোয় যাতে কোনো রকম সংশয়ের অবকাশ না থাকে তাই তাঁরা ঘোষণা করে রেখেছেন, তাঁদের আইনগ্রন্থরও শাস্ত্রের মর্যাদা আছে—শ্রুতি না-হলেও অন্তত স্মৃতি। কিন্তু তাঁদেরই আর এক ঘোষণা অনুসারে স্ত্রী-শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নেই। তাই তাঁদের রচনা পড়বার মতো সুযোগ যদিইবা থাকতো তাহলেও স্ত্রী-শূদ্র তো তা পড়বার অধিকার-বঞ্চিত! এ-হেন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভাষায় যারা শূদ্র তারা কী করে বুঝবে যে মোহমুক্ত তর্কটা মহাপাপ, অধঃপাতে যাবার পথ?

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই কঠিন সমস্যার এক আশ্চর্য সরল সমাধান চোখে পড়ে। সমাধানটা এসেছে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এবং পুরাণ থেকে। শাস্ত্র পড়তে শূদ্রের বাধা আছে, কিন্তু মহাকাব্য বা পুরাণ শুনতে তো বাধা নেই। তাহলে ধর্মশাস্ত্রকারের বিধানগুলো কোনোমতে তার মধ্যে পুরে দিতে পারলেই হলো। এবং তারই ব্যবস্থা হয়েছিলো। মহাকাব্যের ও পুরাণের আদিরূপ কী ছিলো, কতো লোকের হাত ঘুরে কতো অংশ সংযোজিত হয়ে এগুলি পরবর্তীকাল পর্যন্ত পৌঁছেছে—তা নিয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং করছেন। আমাদের আলোচনায় শুধু একটা নজিরই পর্যাপ্ত হবে। শুধু মহাভারতের মধ্যেই 'মনুস্মৃতি' প্রভৃতি প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রর কতো শ্লোকের প্রায় হুবহু পুনরুক্তি চোখে পড়ে ব্যুয়েলার (Buhler) তার একটা ফর্দ তৈরি করেছেন। শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না-করেও এই তালিকায় শুধু সাঁটে গ্রন্থনির্দেশ এবং তালিকাটা ছাপাতে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার উপর দরকার হয়েছে। এ-ছাড়াও পি. ভি. কানে রচিত সুবিশাল 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' তো হাতের কাছেই রয়েছে। তার পাতা ওলটালেই দেখবেন, অধুনালভ্য মহাকাব্য ও পুরাণে ধর্মশাস্ত্রর বিধানের কী রকম ছড়াছড়ি!

কথাগুলো মনে রেখে দেশের বাস্তব পরিস্থিতিটার কথা ভেবে দেখুন। বঞ্চিত ও নিরক্ষর গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র না-হলেও অন্তত একটা প্রধান ব্যবস্থা কথকতা। মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতির ব্যাখ্যামূলক আবৃত্তি। কথকঠাকুরদের কৌশলের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই জানেন, আশ্চর্য

সহজ-সরল ভাষায় নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে কতো মনোরমভাবে নানা দার্শনিক সমস্যারও ব্যাখ্যা করার তাঁদের কী অসামান্য দক্ষতা ! মহাকাব্য ও পুরাণের আখ্যানভাগে আকৃষ্ট হয়ে নেহাত চাষাভুষোদেরও নির্বিচারে তাই এ-জাতীয় দার্শনিক মতামত গেলাবার ব্যবস্থা। সাবেক কালের প্রচার মাধ্যম বা *mass media* বলতে প্রধানতই এই কথকতা।

মাত্র দুটো নমুনা দেবো। এক : চার্বাকমতের বিরুদ্ধে আতঙ্কসৃষ্টির কায়দা। দুই : মোহমুক্ত তর্কের বিরুদ্ধে আতঙ্কসৃষ্টির কায়দা।

প্রথমটির নমুনা 'বিষ্ণু পুরাণ' থেকে আগেই আলোচনা করেছি। এখানে শুধু দ্বিতীয়টির নমুনা দেখা যাক।

৯॥ যুক্তিতর্কের আতঙ্ক

'মহাভারত'-এর শান্তিপর্ব থেকে একটা উপাখ্যান দেখা যাক। মনে রাখবেন, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কথকঠাকুর নিপুণভাবে গল্পটা ব্যাখ্যা করছেন।

এক যে ছিলো শেয়াল। আসলে কিন্তু শেয়াল নয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র শেয়ালের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। কিন্তু কেন ? কেননা পৃথিবীতে এক মহা অঘটন ঘটে-ঘটে বলে ! এক খোদ ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করে বসেন বুঝি ! এ-হেন সর্বনেশে সম্ভাবনা ঠেকাবার জন্যেই ইন্দ্রর ওই ছদ্মবেশ।

কিন্তু ব্রাহ্মণের মাথাতেই বা আত্মহত্যার কথা ঢুকলো কেন ? আর তা রোধ করবার জন্য শেয়ালের ছদ্মবেশই বা দরকার পড়লো কেন ?

সে অনেক কথা। এক ধনী ব্যবসাদার রথে চড়ে যাবার সময় ব্রাহ্মণটিকে ধাক্কা মেরেছিলো। কিন্তু লোকটার টাকার জোর এমনই প্রবল যে ব্রাহ্মণ দেখলেন, এ-হেন কঠিন অপরাধেরও কোনো প্রতিকার নেই। অতএব বেঁচে থেকে আর লাভ কী ? তাই আত্মহত্যার আয়োজন।

দেবরাজ ইন্দ্র বুঝলেন, এ তো নেহাতই সর্বনেশে ব্যাপার। একেবারে খোদ ব্রাহ্মণ সত্যিই আত্মহত্যা করে না বসেন। যে করে হোক, তা বন্ধ করতে হবে। তাই শেয়াল সেজে ব্রাহ্মণটির সামনে উপস্থিত।

কিন্তু শেয়াল কেন ? কেননা ইন্দ্র ভাবলেন এ-হেন একটা নীচু ধরণের জানোয়ার সাজতে পারলে পশুজন্মের তুলনায় মনুষ্যজন্মের সার্থকতা বেশ

ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। ইন্দ্র করলেনও তাই। ব্রাহ্মণের সামনে শিয়াল সেজে আবির্ভূত হয়ে প্রথমটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তার সারমর্ম : মানুষের তুলনায় নীচ জন্তুজানোয়ারের কতো কষ্ট, কতো দুঃখ। যেমন, মানুষের হাত আছে, পশুর নেই। তাই পিঠে একটা পোকা কামড়াতে শুরু করলেও পশু বেচারার পক্ষে তার যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর উপায় কী? হাত থাকলে পোকাটাকে অনায়াসেই ফেলে দেওয়া যেতো। এই ভাবে অনেক রকম দুর্ভোগের নজির পেড়ে মানবহস্তের গুণগান। বস্তুত, শেয়ালটি বোঝালে যে মানুষের হাত আছে বলেই পুরো জীবজগতে মানুষের এমন প্রতাপ; বাকি জন্তুজানোয়ার তো শুধু মুখ বুজে মানুষের দাসত্ব করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? মানবহস্তের এতো গুণগান কেন? আসলে ওই শেয়ালরূপী ইন্দ্রের পক্ষে এসবই ভণিতা মাত্র। তাঁর আসল বক্তব্যটা ধাপে ধাপে বোঝাবার একটা আয়োজন। প্রথম ধাপে, বাকি জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তুলনামূলক সুখ-সুবিধার কথা। দ্বিতীয় ধাপে, মোদ্দা কথাটা হলো, মনুষ্যজন্মই বলো বা পশুজন্মই বলো—কোনোটাই অকারণ নয়। অনেক জন্মের সঞ্চিত পুণ্যের ফলে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যজন্ম; জন্মজন্মান্তরের পাপের ফলেই শেষ পর্যন্ত পশুজন্ম। তাই এ-হেন মহামূল্য মনুষ্যজন্ম—তাও আবার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজন্ম সাধ করে কেউ ধ্বংস করবে নাকি? ব্রাহ্মণটির পক্ষে আত্মহত্যা করবার পরিকল্পনাটা প্রচণ্ড অভিমানের পরিচায়ক হলেও সুবুদ্ধির পরিচায়ক মোটেই নয়।

গল্পটা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারতো, কেননা মনুষ্যজন্মের—বিশেষত ব্রাহ্মণজন্মের—মহত্ত্ব অতো সুদীর্ঘ ভাবে শুনে ব্রাহ্মণটির পক্ষে আত্মহত্যা করবার আর কোনো উৎসাহ থাকবার কথা নয়। কিন্তু 'মহাভারত'-এর আলোচ্য উপাখ্যানটি যিনিই রচনা করে থাকুন না কেন, উপাখ্যানটা এখানে শেষ হলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটাই মাটি হবার সম্ভাবনা। তাই এপর্যন্তও ভণিতা এবং অমন সুদীর্ঘ ভণিতার পরেই আসল কথাটা পাড়বার আয়োজন।

আমাদের শেয়ালটি বলছে, শেয়াল হিসেবে—নীচ জানোয়ার হিসেবে—তার আজ এতো যে যন্ত্রণা তারও একটা কারণ আছে। এবং এই কারণটাই হলো পুরো উপাখ্যানের আসল মর্মকথা। কী কথা?

শেয়ালটি আসলে চিরকালই শেয়াল ছিলো না। গতবার তো পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ হিসাবেই তার জন্ম ! কিন্তু নেহাত মূঢ়র মতো সে-জন্মে ব্রাহ্মণটি এক মহাপাতক করেছিলেন এবং তারই ফলে আজ তাঁর এই অবস্থা—নীচ জানোয়ার হয়ে জন্ম !

কিন্তু কী সেই মহাপাতক? শ্রোতারা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে সিধে হয়ে বসেছেন, কান খাড়া করে শুনছেন? এবং অতো ভণিতার পরে শেয়ালও ওই মহাপাতকের বর্ণনা শুরু করছে :

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অনুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্য ইয়ং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥

(শান্তিপর্ব ১৮০।৪৭-৪৯)

—আমি ছিলাম বেদনিন্দুক যুক্তিবাদী পণ্ডিত। নিরর্থক আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যায় তখন আমি অনুরক্ত। বিচারসভায় যুক্তিবাদের প্রবক্তা ছিলাম, যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে ছিলো আমার আক্রোশ। পাণ্ডিত্যাভিমান সত্ত্বেও আমি ছিলাম মূর্খ; সব বিষয়েই সংশয়গ্রস্ত, নাস্তিক। অতএব হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আজ আমার এই রকম শেয়াল হয়ে জন্ম !

কথকঠাকুরের মুখে কথাগুলোর ফলাও ব্যাখ্যা শুনেও আজ আপনার যদি তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হবার মতো বুকের পাটা থাকে তাহলে হোন; কিন্তু মনে রাখবেন সেই পাপে পরজন্মে আপনাকে শেয়াল হয়ে জন্মাতে হবে, পিঠে পোকামাকড় কামড়ালেও তা হাত দিয়ে তুলে ফেলতে পারবেন না !

প্রোপাগাণ্ডা। সন্দেহ নেই। কেননা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা অবান্তর হবে না যে আমাদের দেশের প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকেরা যুক্তিবিদ্যার অসারতা প্রমাণ করার জন্যে রাশি রাশি বই লিখেছেন। নাগার্জুনের 'প্রমাণবিধ্বংসন' থেকে শ্রীহর্ষর 'খণ্ডন-খণ্ডন-খাদ্য' পর্যন্ত তার অনেক নজির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ওই সব বই পড়া এবং পড়ে বোঝা চারটিখানি কথা নয়। বিস্তর বিদ্যেবুদ্ধির দরকার। কিন্তু 'মহাভারত'-এ যিনি আলোচ্য উপাখ্যানটি

রচনা করেছেন তাঁর কৌশলটা একেবারে আলাদা। তারিফ করতে শুরু করলে শেষ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। চাষাভূষোদের সামান্যতম অক্ষর-পরিচয়ের সুযোগ দিতে হলো না। তবুও তর্কবিদ্যা এবং তারই অনুসিদ্ধান্ত নাস্তিক্যবুদ্ধির বিভীষিকাটা কতো অনায়াসে—কী রকম জমজমাট একটা গল্প ফেঁদে—কথক ঠাকুর মারফৎ তাদেরই চেতনায় গেঁথে দেবার আয়োজন করা গেলো! আজকের দিনে এরকম কুশলী প্রোপাগাণ্ডিস্ট-এর খবর পেলে শাসক সম্প্রদায় পুরস্কারের ঝুড়ি উপুড় করে দেবেন।

১০॥ যুক্তিবিদ্যা ও যুক্তিপণ

আর শুধু একটা কথা সংক্ষেপে বলে আলোচনা শেষ করবো। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটা প্রধান গৌরব বলতে কিন্তু তর্কবিদ্যাই। তারই প্রচলিত নাম ন্যায়দর্শন। দেশের আইনকর্তারা যদি তর্কবিদ্যার বিরুদ্ধে অতো বিষোদ্গার করে থাকেন, তাহলে ন্যায়দর্শনের বিকাশ হলো কী করে?

উত্তরটা বোঝার আগে আইনকর্তাদের আসল মনোভাবটা আরো একটু খতিয়ে বুঝতে হবে। তর্কবিদ্যা নিয়ে তাঁদের এতো যে আতঙ্ক তার কারণ এই বিদ্যা শাস্ত্রবিশ্বাসের প্রতিকূল এবং দেশের সাধারণ মানুষকে তাঁবে রাখবার পক্ষে শাস্ত্রবিশ্বাস বিশেষ উপযোগী। কিন্তু তর্কবিদ্যাই যদি শাস্ত্রবিশ্বাসের উমেদারি করতে রাজি হয়? তাহলে অবশ্য আইনকর্তাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। ছিলোও না। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। নাস্তিক্য ঘুচবে, অথচ তর্কবিদ্যাকে অমন স্থূলভাবে আক্রমণ করতে হবে না। তাই স্বয়ং মনু "বেদের অবিরোধী" তর্কবিদ্যার প্রশংসাই করেছেন (১০।১০৫-৬)। তাঁর অপর একটি এ-জাতীয় উক্তি (৭।৪৩) প্রসঙ্গে মেধাতিথি কথাটার কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ আইনকর্তাদের কথাটা এই যে বেদের বা শাস্ত্রর প্রামাণ্য শিরোধার্য করে তর্ক করতে চাও করো; তাতে তো ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে সুবিধেই।

অনুমান হয়, ধর্মশাস্ত্রকারদের এ-জাতীয় একটা মনোভাবের ফাটল দিয়েই

ন্যায়শাস্ত্র অন্তত আদি পর্যায়ে তর্কবিদ্যা হওয়া সত্ত্বেও সমাজে স্বীকৃতি খুঁজেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাদের আসল মনোভাবটা তাঁদেরই রচনার এদিও-ওদিক থেকে যেন উঁকিঝুঁকি মেরেছে। সেটা খুব একটা শাস্ত্রীয় মনোভাব কিনা, তা বিচার করার দরকার আছে।

'ন্যায়-সূত্র'-তে জোর গলায় বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মোট বারোটি সূত্র : ২।১।৫৭-৬৮। এর মধ্যে প্রথম ছ'টি পূর্বপক্ষ-অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্যর বিরুদ্ধে যুক্তি। পরের ছটি সে-যুক্তি খণ্ডন করে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে প্রধান যুক্তিটার বিচারই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত। বিপক্ষ দল বলবেন, বেদ অনৃতদোষে দুষ্ট। সোজা কথায়, বেদের বক্তব্যে ভুল আছে। কী ভুল? পূর্বপক্ষবাদীর মতে, বেদে বলা হয়েছে পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে। অর্থাৎ ওই যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেও ছেলে হয় না। তাহলে তো বেদের কথাটা ভুল বা মিথ্যে। অনেকেই পুত্রকাম যজ্ঞ করেও পুত্র লাভ করেনি।

'ন্যায়-সূত্রে' গৌতম এবং ভাষ্যে বাৎস্যায়ন রীতিমতো জোর গলায় এ-হেন আপত্তির উত্তর দিতে চেয়েছেন, বা উত্তর দেবার একটা যেন খুব তোড়জোড় করেছেন। কিন্তু ওই তোড়জোড়ের পরিভাষা ছেড়ে সাদামাটা কথায় উত্তরটা ঠিক কী? পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে ছেলে যে হবেই—এমনতরো দাবি অবশ্যই ওঁরা করছেন না। তার মানে, ওই যজ্ঞ করা সত্ত্বেও ছেলে হয়তো হয় না। কিন্তু তারও পর্যাপ্ত কারণ আছে। কী রকম কারণ? নানারকম হতে পারে। বিপরীত বিহার জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের আঙ্গিক মিলনের দোষ। কিংবা হয়তো আয়ুর্বেদে আলোচিত কোনো স্ত্রী রোগ। কিংবা হয়তো পুরুষের নির্বীজতা। তাই দোষটা যজ্ঞের বা যজ্ঞ-বিধায়ক বেদের নয়। যজ্ঞ বিধিটি অনৃতদোষ বা মিথ্যাত্বের অভিযোগ থেকে মুক্ত!

অবাক না-লেগে উপায় কী? পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সমর্থন, না সেই রকম কোনো সমর্থনের একটা যা-হোক-তা-হোক মুখোস পরিয়ে প্রকৃত যুক্তিবিদ্যার এবং চিকিৎসাশাস্ত্রর সমর্থন? সুস্থ বা প্রজননক্ষম নরনারীর স্বাভাবিক মিলন থেকে যে ছেলেপুলে হয়—এ বিষয়ে তো সূত্রকার এবং ভাষ্যকারের শত সহস্র নজির জানা থাকবার কথা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেও তা হয়, না-করলেও হয়। তাহলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সংক্রান্ত বেদবিধির সমর্থনটা কোথায়? পড়তে পড়তে

বরং উল্টো সন্দেহই জাগে। বেদের সমর্থনে বহু বাগাড়ম্বর করে যেন যুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানেরই সমর্থন। যদি তাইই হয় তাহলে তো বেদবিশ্বাসের সমর্থন করতে গিয়ে এও একরকম প্রচ্ছন্ন পরিহাসই! এ-হেন প্রচ্ছন্ন পরিহাস হিসেবেই কি বাৎস্যায়ন ছোট্ট করে বলে রেখেছেন: "ন চ ইদং লৌকিকাৎ ভিদ্যতে···" —অর্থাৎ, ব্যাপারটা নিয়ে লৌকিক বাক্যর সঙ্গে বেদবাক্যর আসলে কোনো তফাৎ নেই। যদি তাইই হয়, তাহলে বেদের প্রামাণ্য নিয়ে অতো বাগাড়ম্বর কেন? আইনকর্তাদের চোখে একরকম ধুলো দিয়ে প্রকৃত তর্কবিদ্যারই সংরক্ষণ? ধর্মশাস্ত্রকারদের কাছে একরকম মুক্তিপণ দিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যার নিরাপত্তা সৃষ্টি?

বেদপন্থীদের—বিশেষত যাজ্ঞিকদের—পরিভাষা ব্যবহার করে অনেক বাগ্‌বিস্তার করা সত্ত্বেও পুত্রেষ্টি প্রসঙ্গে 'ন্যায়-সূত্র' ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের যে আলোচনা তা থেকে অবশ্যই সন্দেহ হয় ন্যায়দর্শনের আদিরূপটিতে বেদভক্তিটা আসলে ওই রকমই কিছু। ন্যায়দর্শনের আদি প্রবক্তাদের কাছে প্রামাণ্যর প্রকৃত নিদর্শন বলতে লৌকিক বিজ্ঞানই—বিশেষত আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা-বিজ্ঞান। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেও পুত্রলাভের যে-অভাব তার আসল কারণ পুরুষরোগ বা স্ত্রীরোগ বা স্ত্রী-পুরুষের মিলনের দোষ। কিন্তু এসব কথা তো আয়ুর্বেদেরই আলোচ্য বিষয়। তাহলে, মুখে যাই বলা যাক না কেন, প্রামাণ্য বলতে আসলে আয়ুর্বেদ, বেদ নয়।

বেদ-প্রামাণ্যের চরম যুক্তি হিসেবে 'ন্যায়-সূত্র'কার যা বলেছেন তা থেকেও এ রকমই একটা সন্দেহ আরো জোরদার হয়। তাঁর বক্তব্য: "মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের মতোই আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।" (২।১।৬৮)। ভাষ্যকার মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে "মন্ত্র" শব্দটির মানে বেদমন্ত্র নয়: "বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবারণার্থ, অর্থাৎ বিষাদি নিবৃত্তি যাহাদিগের প্রয়োজন, এমন মন্ত্র।" (তর্জমা: ফণিভূষণ)। সোজা কথায়, সাপের বিষ নামানো প্রভৃতি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র। গ্রামাঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে আজো অল্পবিস্তর তা চালু আছে। ওঝাদের মন্ত্র; বেদমন্ত্র নয়। অবশ্য এক অর্থে ওঝারাও চিকিৎসাবিদ্—গ্রাম্য চিকিৎসাবিদ্, আয়ুর্বেদেরই হয়তো আদিম সংস্করণ। কিন্তু তা যাই হোক-না-কেন, সূত্রকারের আসল বক্তব্য কী দাঁড়ায়? লোকপ্রচলিত ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদকে

অবশ্যই প্রমাণ বলে মানতে হবে। এবং যে-শর্তগুলি মানার ফলে এ-জাতীয় মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য সেই শর্তগুলি মানে বলেই বেদেরও প্রামাণ্য। তাহলে চলতি কথায় থাকে বলে মডেল (*model*) বা আদর্শ তা ওই আয়ুর্বেদই। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য অবিসংবাদিত। তারই মূল শর্তগুলি বেদেও স্বীকৃত এবং এই কারণেই বেদও প্রমাণ।

এই কি প্রকৃত বেদ-বিশ্বাস? নাকি, বেদ-বিশ্বাসের প্রতি কোনো একরকম নেহাতই মৌখিক আনুগত্য দেখিয়ে কোনো মতে তর্কবিদ্যাকে আইনকর্তাদের বিধি-নিষেধ থেকে বাঁচাবার আয়োজন? বেদকে সত্যিই প্রমাণ বলে মানতে গেলে তাকে অপৌরুষেয় এবং স্বতঃ-অভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে। 'ন্যায়-সূত্র'কার ও বাৎস্যায়ন তার ধার কাছ দিয়েও যাননি। বাৎস্যায়ন তো সরাসরি বলেছেন, "ন ভিদ্যতে চ লৌকিকাৎ বাক্যাৎ বৈদিকং বাক্যং প্রেক্ষাপূর্বকারি-পুরুষ-প্রণীতত্বেন" (ন্যায়ভাষ্য ৪।১।৫৯)। ফণিভূষণ তর্জমা করেছেন: "পরন্তু প্রেক্ষাপূর্বকারী অর্থাৎ যথার্থ বুদ্ধিপূর্বক বাক্যরচনাকারী পুরুষের প্রণীতত্ব-বশতঃ লৌকিক বাক্য হইতে বৈদিক বাক্য ভিন্ন অর্থাৎ বিজাতীয় নয়।" সরল ভাষায়, লৌকিক বাক্যও যে-কারণে প্রমাণ, বৈদিক বাক্যও সেই কারণেই প্রমাণ।

তাহলে, সংক্ষেপে, বেদের প্রামাণ্য নিয়ে ন্যায়দর্শনের আদিরূপটিতে অতো আস্ফালন মোটের উপর একরকম মুক্তিপণ বা *ransom* দিয়ে তর্কবিদ্যাকে কোনো মতে বাঁচানো।

কিন্তু এইভাবে তর্কবিদ্যাকে বাঁচাবার দুটো দিক আছে। সে-বিষয়েও অন্তত দু'একটা কথা বলা দরকার।

প্রথমত, অনুমান হয় এভাবে কোন মতে যুক্তিবিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা না-করলে নৈয়ায়িকদের তর্কবিদ্যাও আইনকর্তাদের রোষানল থেকে রেহাই পেতো না। আর তা না-পেলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য নিশ্চয়ই তুলনায় অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতো, কেননা ভারতীয় দর্শনের বিকাশে নৈয়ায়িকদের তর্কবিদ্যার অবদান অবিসংবাদিত। দ্বিতীয়ত, কিন্তু, এ-ভাবে ন্যায়দর্শনকে বাঁচাবার একটা বিপদও ছিলো। দর্শনটির আদি-প্রবক্তারা যে-উদ্দেশ্যেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করুন না কেন, কালক্রমে—কয়েক শতকের মধ্যে—ন্যায়-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ওই বেদ-বিশ্বাস এক স্বকীয় শক্তি নিয়ে মাথা চাড়া দেয়। পরবর্তী নৈয়ায়িকদের মধ্যে তার একটা চরম প্রমাণ উল্লেখ করা

যেতে পারে। উদয়নাচার্যর মতো প্রখর তার্কিকও পরমাণুবাদের সমর্থনে বেদের সাক্ষ্য খোঁজেন, এবং দাবি করেন পরমাণুগুলি গতিশীল এবং বেদের গতিসূচক "পতত্র" শব্দ থেকেই প্রমাণ হয় যে বেদে পরামাণুবাদের সমর্থন আছে! "পতত্র" শব্দের সাদা মানে কিন্তু পাখির ডানা—পতন থেকে যা ত্রাণ করে। এবং সারা বেদ ঢুঁড়েও পরমাণুবাদের আর কোনো নিদর্শন নেই, যদিও 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এ উদ্দালক আরুণির উপদেশে পরমাণুবাদের কোনো একরকম আভাস পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু উদ্দালক নিজে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেই এই আভাস খুঁজেছিলেন, কোনো বৈদিক ঋষির আপ্ত-বাক্যর নজির থেকে নয়। অবশ্যই উদয়নের উক্তি সকলে মানেন নি এবং উদ্দালকের উপদেশটির প্রকৃত তাৎপর্য নিয়েও অনেক তর্ক উঠবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেদের প্রামাণ্যর কথা নৈয়ায়িকদের মধ্যে চালু থাকতে থাকতে একরকম আত্ম-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো—এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। ধর্মশাস্ত্রকারেরা কেন তর্ক-বিদ্যার বিরুদ্ধে অমন প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন? তাঁদের আসল মাথা-ব্যথা তো রাজনীতি নিয়ে—তাঁদের আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা যাতে কোনোমতে শঙ্কিত না-হয় তাই নিয়ে। চলতি কথায়, যাকে বলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—তারই সংরক্ষণ। তার মতাদর্শগত ভিত্তি বলতে পুনর্জন্ম, কর্মফল, ইত্যাদি। এসব কথা যুক্তির ধোপে টেঁকে না বলেই যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ। অর্থাৎ, বিধি-নিষেধগুলোর মূল তাৎপর্য রাজনৈতিক। দার্শনিক নয়। কিন্তু শুধু দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিবিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টায় আদি-ন্যায়দর্শনে গুরুত্ব যতোই হোক না কেন, এই রাজনীতির দিকটি সম্বন্ধে তা মোটের উপর উদাসীন। বরং 'ন্যায়-সূত্র' থেকেই মনে হয় পুনর্জন্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলির বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের বিশেষ কোনো আপত্তি ছিলো না। বরং একটা সহিষ্ণু-তাই ছিলো। 'ন্যায়-সূত্রে' "প্রেত্যভাব" বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রকরণ আছে (৪।১।১০-১৩); "অদৃষ্ট" প্রসঙ্গে প্রকরণ আছে (৩।২।৬০-৩।২।৭২)—এবং এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করার কোনো যুক্তি কেউ দেখিয়েছেন বলে জানা নেই। বরং সূত্রকার ও ভাষ্যকার এগুলিকে নাস্তিক্য-নিরসনের আলোচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ-জাতীয় আলোচনা আইনকর্তাদের কাছে অবশ্যই আদরণীয়। তাই আইনকর্তাদের চোখে ধুলো

দিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যার সংরক্ষণ এক অর্থে বৈপ্লবিক চেতনার পরিচায়ক হলেও ন্যায়দর্শনকে অন্তত আধুনিক অর্থে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই।

আজকের দিনে অন্তত শ্রমিকসাধারণের মধ্যে দর্শনের মূল উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্নটা প্রাধান্য পাচ্ছে। শুধু তত্ত্বান্বেষণ, না সমাজ-পরিবর্তন? পৃথিবীর অন্তত বিরাট একটা অংশে দ্বিতীয় উত্তরটাই স্বীকৃত। সেদিক থেকে চার্বাকরা ধর্মশাস্ত্রকারদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন আর নাই করুন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই উন্নত পর্যায়ে তুলে আনার দিন যেন ঘনিয়ে আসছে। কেননা, সমগ্র ভারতীয় দর্শনে একমাত্র তাঁরাই সেকালে শোষণ-ভিত্তিক সমাজের মূল মতাদর্শর উপর প্রবল আঘাত হানতে চেয়েছিলেন।

অবশ্যই আইনকর্তাদের বিধান ছিলো, ভদ্র সমাজ থেকে এদের একেবারে দূর করে দিতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে এ-বিধান কতো কাজে লাগানো হয়েছিলো, সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকরা গবেষণা করুন। আমাদের কথা শুধু একটাই। ভদ্রসমাজের বাইরে আজো আমরা আউল-বাউল-সহজিয়া প্রভৃতি নানা নামে যে-সব "দেহতত্ত্বে"র গান শুনি, তার মধ্যে প্রাচীন চার্বাক-লোকায়তিকদের মূল কথা কোনোভাবে টিঁকে আছে কিনা—তা নিয়েও গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন বেড়ে চলেছে। এরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানে না, দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু মানে না, কৃষকদের কানে যে-গানে পৌছে দিতে চায় তার একটা বড়ো কথা হলো: "নিজের চোখে দেখতে চাই।"